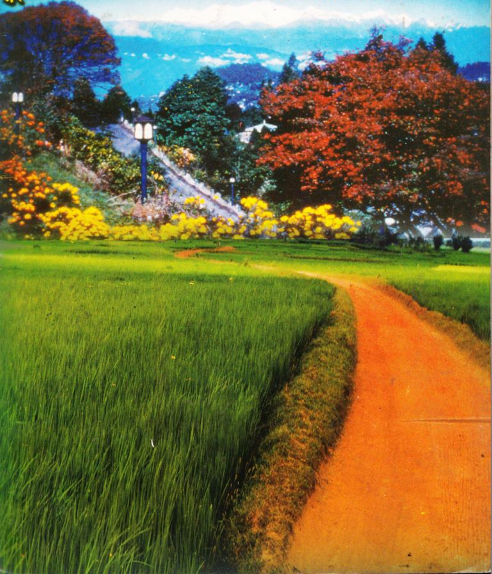
পর্যটন সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ

২৮ সেপ্টেম্বর -১৯ অক্টোবর ২০০১





পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি, স্ক্যান ও এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : dhulokhela@gmail.com





পর্যটন সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

পর্যটন সংখ্যা

বর্ষ ৩৫ ।। সংখ্যা ১৩-১৬
২৮ সেপ্টেম্বর, ৫, ১২ ১৯ অক্টোবর, ২০০১
১১, ১৮, ২৫ আশ্বিন, ২ কার্তিক, ১৪০৮



প্রধান সম্পাদক : **তারাপদ ঘোষ**
সম্পাদক : **সুপ্রিয়া রায়**
সহকারী সম্পাদক : **অনুশীলা দাশগুপ্ত, মন্দিরা ঘোষাল**
স্মরজিৎ প্রামাণিক, সংগ্রাম গুহ, সেরিনা জাহান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স : **কাজল বিশ্বাস, শুভ্র চক্রবর্তী, অঞ্জন খান**

প্রথম পটচিত্র : মায়াপুরের ইস্কনের মন্দির
দ্বিতীয় পটচিত্র : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

অঙ্গসজ্জা : প্রতাপ সিংহ, শ্যাম রুদ্র
জয়দেব পাল, নিতাই গোড়ে



প্রকাশক : তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক : বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০ ০১২

মূল্য : কুড়ি টাকা



যোগাযোগের ঠিকানা : বিতরণ শাখা
অমরেন্দ্রনাথ সাহা
তথ্য আধিকারিক
৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২৪৩-৬২৯৫

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

পর্যটন—বিকল্প অর্থনীতির সন্ধানে

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিমুখর প্রক্রিয়াটিকে আরও বেশি করে ত্বরান্বিত করতে পর্যটন আজ অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। পর্যটনের সঙ্গে বাঙালি জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। কিন্তু পর্যটন বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে এমন উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে, তা কিছুদিন আগেও তেমনভাবে ভাবা যায়নি। অতুলনীয় প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালী এই পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন আজ অন্যতম 'শিল্প'। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিদিনের রুটি-রুজির হিসেব-নিকেশ। বারো মাসের তেরো পার্বণের এই রাজ্যে নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়, নানা জনজাতির বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান-মেলাকে কেন্দ্র করে সেই কবে থেকে গড়ে উঠেছে এক অতি মনোরম পর্যটন-বিন্যাস। মনের টানে মানুষ মেতে ওঠে এই পর্যটনে। তাদের ভাবনায় পরিকাঠামোগত সুবিধা অসুবিধার বিষয়টি থেকে যায় একেবারে উপেক্ষিত। গ্রামবাংলার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই যেন এটি একটি অঙ্গ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন—ব্যক্তি ভেদে পর্যটনের ধারণা এবং চরিত্র ভিন্ন মাত্রা পায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনের উদ্দেশ্যও ভিন্নতা পেয়েছে। যখন পর্যটন বলতে বোঝাত তীর্থ করতে যাওয়া, তখন তা ছিল আয়াসসাধ্য। দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড। সাধারণ মানুষ যখন গোটা ঘর-গেরস্থালি নিয়ে পথে নেমে পড়ে অকুতোভয়ে তখন তার চাই সার্বিক নিরাপত্তা। হাতের কাছেই মজুত থাকা চাই সব সুবিধা। স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামই প্রধান কথা। আর্থিক কার্পণ্য তেমন প্রশ্রয় পায় না—এমন পর্যটকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি মধ্য আয়ের মানুষের ভ্রমণ পিপাসাও বেড়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়। পর্যটনশিল্পে সমগ্র চাহিদার মূল্যায়ন এবং সেই অনুযায়ী পৃথক পৃথক পরিকল্পনাও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অজস্র ভ্রমণবিন্দুকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে পর্যটন উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে উঠে আসবে এই রাজ্যে—এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে না।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পর্যটন দপ্তর অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় পর্যটন সংক্রান্ত এক বিরাট কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি এবং তা সফল রূপায়ণের ব্যাপারে কাজও শুরু করে দিয়েছে।

এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে অনুভব করছে মানুষ। পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং নানান ভাবনাচিন্তা রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেবার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার এই পর্যটন সংখ্যার প্রকাশ। স্বল্প পরিসরে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা সম্ভব হল না এই বিশেষ সংখ্যায়। 'পশ্চিমবঙ্গ'-র সাপ্তাহিক সংখ্যাগুলোতে ধীরে ধীরে তা প্রকাশের আশা রাখি। রাজ্য সরকারের পর্যটন-ভাবনার চিত্রটি অনুসরণ করে ৬টি ভাগে পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করে লেখাগুলোকে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে। নানা ব্যক্তি, পত্রিকা এবং সরকারি ও বেসরকারি নানা সূত্র থেকে নানাভাবে তথ্য ও ছবি সংগৃহীত হয়েছে। তথ্য সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত বলে ধরে নেওয়ার অনুরোধ রাখছি। পরিবর্তে সংশোধিত তথ্য পেলে উপকৃত হবো। প্রতিটি লেখায় লেখকের মতামত নিজস্ব। এ ব্যাপারে পত্রিকার কোনও দায় নেই।

পর্যটন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি—একটি আলোচনা

গত ২৩ আগস্ট ২০০১ কলকাতায় 'পর্যটন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি'—শীর্ষক পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক চমনলাল গুপ্ত।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অ্যাসোচেমের সভাপতি রঘু মোদী, বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতি এস বি গাঙ্গুলি, সভাপতি মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স এস কে ঢনঢনিয়া, অতিরিক্ত মহা-অধিকর্তা পর্যটন, এম কে খান্না, চেয়ারম্যান, অ্যাসোচেম এক্সপার্ট কমিটি অন ট্যুরিজম অ্যান্ড সিভিল অ্যাভিয়েশন, সুভাষ গোয়েল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষণটির পূর্ণবয়ান প্রকাশিত হল।



পর্যটন বিষয়ক পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী চমনলাল গুপ্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। *ছবি : অরিজিৎ ভট্টাচার্য*

অ্যাসোচেম ও বি সি সি আই আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির পর্যটন সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

মোট আয়, পুঁজি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও কর- প্রদান—এই সব কিছুর নিরিখে পর্যটনই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্প। পর্যটন শিল্পের সুস্পষ্ট ইতিবাচক দিকগুলির মধ্যে চাকুরির সুযোগ তৈরি করা ও মানুষের উপার্জন ও জীবনধারণের মান-উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অন্যতম। আজকের বিশ্বে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প প্রায় ২০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং আমি যতদূর জানি প্রতি বছর আরও ৫৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ এ শিল্পে হতে পারে। শুধু ভারতবর্ষেই ২ কোটি ১৪ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ২০১০ সালের মধ্যে সংখ্যাটা ২.৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

আপনারা জানেন যে, পৃথিবীতে খুব কম দেশই ভারতের মতো প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে এত বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বৈচিত্র্যের যে ডালি সাজিয়ে রেখেছে, তা মানুষকে মুগ্ধ করে। আমাদের সুপ্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশৈলী পর্যটকদের হাতছানি দেয়। যে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সম্পদে ভারতবর্ষ সুসজ্জিত, একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে তা যথোপযুক্ত।

কিন্তু মজার কথা হল, বিশ্ব-পর্যটনের প্রেক্ষিতে আমাদের অংশগ্রহণ নিতান্তই নগণ্য। ভাল প্যাকেজের ব্যবস্থা না থাকা, পরিকাঠামোর অভাব এবং পর্যটন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের অপারগতা আমাদের দেশের পর্যটন সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। আমরা মনে করি, অসামরিক বিমান পরিবহন পর্যটন শিল্প বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেইজন্য ভারতবর্ষের বিশাল পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশ্বের মানুষের কাছে উন্মুক্ত করবার চাবিকাঠি এই দপ্তরের হাতেই রয়েছে। কিন্তু বিমান পরিবহন বলতে যে শুধু কতগুলি উড়োজাহাজের উড়ান নয়, সে ব্যাপারে ভারত সরকার সম্পূর্ণ অবহিত। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে ভারতবর্ষের সামনে বহু নতুন নতুন সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থাও যাত্রী পরিবহন তথা মাল পরিবহন এই উভয়ক্ষেত্রেই ভারতকে দ্রুত বিকাশশীল বাজারগুলির অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবহণ যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ হারে এবং মাল পরিবহন যথাক্রমে ৪.৫ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যেহেতু পর্যটন ও বাণিজ্য ক্ষেত্র অসামরিক বিমান পরিবহনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, সেহেতু বিমানবন্দরের পরিকাঠামো এবং বিমান পরিবহন পরিষেবার চাহিদা ও উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই কারণে উন্নততর যোগাযোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে অসামরিক বিমান পরিবহন পরিকাঠামো বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। অবশ্য একথাও আমরা মানি যে বিমান পরিবহনের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য আমাদের সীমিত সম্পদের উপর চাপও যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে আমাদের দায়িত্বও। এ কথা মাথায় রেখে অসামরিক বিমান পরিবহন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে মূলধন বিনিয়োগ বাড়ানো, গুণমান ও দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর দিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে। এতএব এখন আমাদের মূল লক্ষ্যটা দাঁড়াল, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া ও তার পাশাপাশি এই ব্যবস্থার সুসংহত বিকাশ ত্বরান্বিত করা ও উন্নততর পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই ও কলকাতা বিমানবন্দরগুলিকে দীর্ঘকাল লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার অনুমোদন করেছে। এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। ভারতবর্ষে আরও বেশি আন্তর্জাতিক উড়ান ও যাত্রিসাধারণকে আকৃষ্ট করতে সাতটি অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর যেমন বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, কোচিন, গোয়া, অমৃতসর এবং গুয়াহাটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারত সরকার।

এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স পরিচালনার ক্ষেত্রেও বেসরকারি ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বেসরকারিকরণের পাশাপাশি প্রয়োজনের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক বিমান পরিবহন সংক্রান্ত নীতিগুলির উদারীকরণের ব্যবস্থাও আমরা করছি। বিগত বছরে ১৫টি দেশের সঙ্গে এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক তরফে যে-কোন একমুখী যাত্রায় সপ্তাহ প্রতি ১৩,১২৯টি আসনের ব্যবস্থা করা গেছে। আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রীদের সুবিধার জন্য বছরে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ বিমান-আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে, দেশে ব্যাপক হারে পর্যটকদের আসার ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন অন্তরায় এখন আর নেই বললেই চলে।

দেশে অধিকতর পর্যটন শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে পর্যটকদের নিয়ে বিশেষ চার্টার বিমান উড়ান পরিচালনার জন্য বিধিনিয়মগুলি অনেকাংশে শিথিল করা হয়েছে বর্তমানে দেশের ১২টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং একই সঙ্গে আগ্রা, জয়পুর, বারাণসী ও পোর্ট ব্লেয়ারেও পর্যটকদের বিশেষ চার্টার বিমান অবতরণ করতে পারবে। এছাড়া শুল্ক ও অভিবাসন ব্যবস্থা সমন্বিত যে-কোন ভারতীয় বিমানবন্দরেও ঐ ধরনের বিমান অবতরণের সুবিধা আছে।

শুধু উন্নততর যাত্রী পরিষেবাই নয়, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনও আমাদের বিকাশনীতির অন্যতম লক্ষ্য। এই সংক্রান্ত পরিবর্তনসাধন করতে গিয়ে আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ ভিত্তিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি ব্যবস্থার বদলে উপগ্রহের মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থা কার্যকরী করা।

বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সরকার বদ্ধপরিকর। ২০টি বিমান বন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করতে আমরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছি। উচ্চস্তরের পেশাগত দক্ষতাসমন্বিত স্পর্শবিহীন, ঝুটঝামেলাবিহীন নিশ্ছিদ্র বিমানবন্দর নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য একটি বাহিনী। গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বিমানবন্দরে ঢোকার ব্যাপারে কড়া নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা পরীক্ষা, নজরদারি, বিমানবন্দর চৌহদ্দি ও বিমানে মাল ওঠানো-নামানোর জায়গার ওপর প্রহরা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণই শুধু এই 'বিমান নিরাপত্তাবাহিনী'কে দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, বিমানযাত্রীদের সঙ্গে শিষ্ট আচরণের প্রশিক্ষণও তাদের একই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

একই রকমভাবে বিমানবন্দরগুলিতে ব্যাগ ও মালপত্র তল্লাশির জন্য রঙিন এক্স-রে যন্ত্র, আধুনিকতম মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে। টার্মিনালের ভিতর যাত্রী চলাচলের নিয়মিত তদারকি ছাড়াও বিমানবন্দর চৌহদ্দির নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ক্লোজ সার্কিট টিভি বসানোর কথাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। যেহেতু বিমানবন্দরগুলি আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার

প্রথম ও শেষ ধাপ এবং এখানেই তাদের মনে দেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়। সেজন্য ভারতবর্ষে পর্যটন শিল্প উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরের সর্বাঙ্গীণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকে আমাদের মন্ত্রণালয় সর্বাধিক নজর দিচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ও সুযোগ-সুবিধার যেসব দিকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি তার মধ্যে আছে কমন ইউজার টারমিন্যাল ইকুইপমেন্ট (কিউট)-এর ব্যবহার অর্থাৎ যার মাধ্যমে যাত্রিসাধারণ ছাপা টিকিট, ব্যাগ ও মালপত্রে লাগানোর ট্যাগ এবং বোর্ডিং কার্ড যে-কোন কাউন্টার থেকে পেতে পারেন। এর ফলে চেক-ইন লাইনে তাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হবে না। অভিবাসন এবং শুল্ক বিভাগের সঙ্গে এইসব পদ্ধতির সমন্বয় ঘটালে যাত্রিসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এই পদ্ধতিতে পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে আন্তঃক্রিয় হোটেল সংরক্ষণের বিষয়টির প্রতিও আমাদের মন্ত্রণালয় দৃষ্টি দেবে।

ভারতের দুটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যাত্রিবাহী সংস্থা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও এয়ার ইন্ডিয়া খাজুরাহো, ঔরঙ্গাবাদ, বারাণসী ও রাজস্থানের বিভিন্ন পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। ভারতের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র বর্তমানে বিমানপথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স—এই দুটি সংস্থা। বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানার্থে ডিসকভার ইন্ডিয়া ফেয়ার, দ্য ইন্ডিয়া ওয়ান্ডার ফেয়ারস প্রভৃতি কর্মসূচি বিভিন্ন পর্যটন উন্নয়নমূলক ভ্রমণ ইত্যাদি চালু করে ভারতের পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় বিমানবন্দরের পরিকাঠামো এবং বিমান পরিষেবা পরিচালনা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ বাণিজ্যিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়। তার কারণ, ঐ অঞ্চলে বিমান ব্যবহার ও ভাড়ার হার খুবই কম। তবু ঐ অঞ্চলের জটিল ভূপ্রকৃতি ও দুর্গমতার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার মনে করে যে, উন্নততর ও সহজতর যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে ঐ অঞ্চলের ব্যবসা, বাণিজ্য, অবসর বিনোদন ও পর্যটন পরিযান ব্যবস্থার স্বার্থে অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় বেশ কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও অ্যালায়েন্স এয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নয়টি বিমানক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এই বিমানক্ষেত্রগুলি হল গুয়াহাটি, তেজপুর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, শিলচর, আগরতলা, ইম্ফল, আইজল এবং ডিমাপুর। অন্য দুটি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ নেই। ওই দুটি রাজ্যে তেজপুর, জোড়হাট, ডিব্রুগড় ও গুয়াহাটি হয়ে বিমানযোগে যাতায়াত করা যায়। এই নয়টি কেন্দ্র সরাসরি বিমানযোগে দিল্লির সঙ্গে যুক্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ কলকাতা ও দিল্লির মাধ্যমে করা যায়। এছাড়া ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও অ্যালায়েন্স এয়ার গুয়াহাটি-আগরতলা, গুয়াহাটি-ডিমাপুর, ইম্ফল-শিলচর, ইম্ফল-আইজল, তেজপুর-ডিমাপুর ও জোড়হাট-ডিমাপুর—বিমান যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনরায় উৎসাহিত করতে এবং ঐসব এলাকাকে বিমান পরিষেবার আওতায় আনার জন্য অ্যালয়ায়েন্স এয়ারলাইন্স-এর ড্রাই লিজ ভিত্তিতে নেওয়া ছয়টি এটি আর বিমানের দুটিকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা ঐসব টার্বো প্রপেলড় বিমানগুলি চলাচলের মূল কেন্দ্র ও ভিত্তিভূমি হিসেবে গুয়াহাটি ও কলকাতা বিমানবন্দরকে গড়ে তোলার সুপারিশ করেছি। সুবিধামত সময়ে রাত্রে বিরতি ছাড়াই দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত বিমান পরিষেবা উৎসাহিত করা হবে।

এর অতিরিক্ত যাত্রী, মাল পরিবহন এবং চার্টার সার্ভিসের মতো বিভিন্ন পরিষেবার জন্য পবনহংস হেলিকপ্টারস্ লিমিটেড ইটানগর, ইম্ফল ও মেঘালয় এবং সিকিম রাজ্যে কতকগুলি হেলিকপ্টার উড়ান চালু রেখেছে।

অন্যদিকে ১৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আগরতলা, ডিব্রুগড়, ডিমাপুর, ইম্ফল, লীলাবাড়ি ও জোড়হাটের মতো চালু বিমানবন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য এয়ারপোর্টস্ অথরিটি অব ইন্ডিয়া বেশ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

পুনরায় এয়ারপোর্টস্ অথরিটি অব ইন্ডিয়া দেশের অন্যান্য ১২টি বিমানবন্দরের সঙ্গে গুয়াহাটি বিমানবন্দরকে মডেল বিমানবন্দর হিসেবে চিহ্নিত ও উন্নীত করেছে। ভারত সরকার এই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা দিয়েছে। আনুমানিক ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একই সঙ্গে ১৫০০ যাত্রীকে পরিষেবা প্রদানযোগ্য একটি যাত্রী টার্মিন্যাল ভবন নির্মাণের কাজ এখানে সম্পন্ন হয়েছে। ৭৪৭ বোয়িং বিমান ওঠা-নামার উপযোগী বর্তমান রানওয়েটিকে আরও মজবুত করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং এই রানওয়েটি পুনরায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা মাথায় রয়েছে। এয়ারপোর্টস্ অথরিটি অব ইন্ডিয়া গুয়াহাটি বিমানবন্দরে ইন্স্টুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (আই এল এস) ও মিনিমাম সেফ আল্টিচ্যুড ওয়ার্নিং সিস্টেম (এম এস এ ডব্লু) বসিয়েছে। বিমানভাড়া হ্রাস করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সপ্ত ভগিনীর দেশের সমস্ত রুটকে অন্তর্দেশীয় বিমান পর্যটন কর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই করের হার হল মূল বিমানভাড়ার ১৫ শতাংশ।

টারবাইন প্রপেলড বিমানগুলিতে বিমান চলাচলের জন্য সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় টারবাইন জ্বালানি কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে 'ঘোষিত পণ্য' হিসেবে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। এর ফলে ৪ শতাংশ হারে বিক্রয় কর বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় বিমান ভ্রমণ ব্যয় এর দ্বারা বেশ খানিকটা হ্রাস হবে বলে আশা করা যায়।

অতএব আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ সচেতন এবং ঐসব বাধা দূর করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত স্থিতিপত্রে পূর্বাঞ্চলের পর্যটনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমার মন্ত্রণালয় ঐসব প্রস্তাবগুলি অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে।

সবশেষে আমি আপনাদের সকলকে আমার মতামত পেশ করার সুযোগ দানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস যে এই সম্মেলন ভারতে বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের উন্নয়নে অনেকটাই সহায়ক হবে।

দারিদ্র্যদূরীকরণে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে

—মুখ্যমন্ত্রী

২৩ আগস্ট, ২০০১ কলকাতার তাজ বেঙ্গলে অনুষ্ঠিত 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির এক আলোচনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী ভাষণের পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হল।

—স. প.

অ্যাসোচেম এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির আলোচনাচক্রে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। শুরুতেই আজকের আলোচ্য হিসাবে 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক বিষয়টি নির্বাচন করার জন্য এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন বৃহত্তম শিল্প যার বার্ষিক মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ ৪৫০০০ কোটি ইউ এস ডলার। গোটা পৃথিবীতে প্রায় ৪৫০০ মানুষের জীবিকার সংস্থান করছে এই শিল্প। প্রতি বছর ৬৬৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ দেশ-দেশান্তরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। বিশ্বের এই সুবিপুল পর্যটক প্রবাহের মাত্র ০.৪% কে ভারত পায় এবং বছরে মাত্র ৩০০ কোটি ডলার বিদেশি মুদ্রা পর্যটন থেকে আয় করে। কিন্তু তবুও এ থেকেই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার নিট আয় সবচেয়ে বেশি। কর্মসংস্থানের কথা বললে, দেশের ৯৩ লক্ষ মানুষের জীবনজীবিকা জড়িয়ে আছে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে। সুতরাং পর্যটনকে খুব সঠিকভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে ভাবা যেতে পারে বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত একটি দেশে যেখানে মনোরম বৈচিত্র্যের সহাবস্থান রয়েছে। দেশের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পর্যটনের স্থান হতে পারে গোড়ার দিকেই। আর সে কারণে আজকের আলোচনাটি সত্যিই অত্যন্ত সময়োচিত।



সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ছবি : অরিজিৎ ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে যদিও ভারতের অবস্থান কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক, কিন্তু আমাদের একটি বিশাল অভ্যন্তরীণ পর্যটন ক্ষেত্র রয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশ এবং বিশেষ করে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তাই একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা উদ্ভাবনের প্রয়োজন রয়েছে যাতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে অভ্যন্তরীণ পর্যটক প্রবাহ বাড়ানো যায়। দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পর্যটকের সংখ্যা যত বাড়বে তত তা দারিদ্র্যদূরীকরণে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। শুধু তাই নয়, এই বিশাল ভূখণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে যে পর্যটনের এই উন্নয়নে বিপুল পরিমাণে জাতিগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য রয়েছে, তার মধ্যে আরও ভাল বোঝাপড়া গড়ে তুলবে। সুতরাং আমি দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমস্ত রাজ্য সরকার বিশেষ করে যাঁরা এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত আছেন, তাঁদের কাছে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যটনের উন্নতির জন্যে সর্বাধিক মনোযোগী ও প্রয়াসী হতে আবেদন জানাচ্ছি। এই লক্ষ্যে দেশের পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের, যেখানে পর্যটনের উন্নয়ন ভারতের অন্যান্য অংশের থেকে পিছিয়ে আছে, সেখানে আঞ্চলিক ও সুসংহত যে-কোন উদ্যোগকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করব।

আমার নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনচিত্র এবং সম্ভাবনার বিষয়ে দু-চার কথা না বলাটা অনুচিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দু লক্ষ বিদেশি পর্যটক আসেন (যা সারাদেশের বিদেশি পর্যটক সংখ্যার মাত্র ৭.৫%)। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমরা বছরে পাই মাত্র ৫৫ লক্ষ পর্যটক যা মোট অভ্যন্তরীণ পর্যটক সংখ্যার মাত্র ৩.৫%। আমরা অবশ্য এই সংখ্যায় খুশি নই যেহেতু এতে রাজ্যের প্রকৃত পর্যটন সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয় না। পশ্চিমবঙ্গকে সঙ্গতভাবেই একটি যথার্থ পর্যটনস্থল আখ্যা দেওয়া যায়। একজন পর্যটকের যা প্রত্যাশা থাকে তার প্রায় সমস্ত কিছুই পশ্চিমবঙ্গে আছে উত্তরে তুষারমৌলি হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরের সৈকতভূমি। রয়েছে ঘন অরণ্যানী আর অভয়ারণ্য, যার মধ্যে অনন্যসুন্দর হল উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং দক্ষিণে সুন্দরবন যাকে ইউনেসকো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। এখানে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও কারুকলার এক ঋদ্ধ উত্তরাধিকার, সর্বোপরি রয়েছে ছবির মতো সুন্দর গ্রামাঞ্চল যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করেন। পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তোরণদ্বার কলকাতা একটি সমৃদ্ধ মহানগরী যা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে। সুতরাং দেশের মধ্যে তথা বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গ অনায়াসেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থল হয়ে উঠতে পারে, সরকারি, বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগে। এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

> পশ্চিমবঙ্গকে সঙ্গতভাবেই একটি যথার্থ পর্যটন স্থল আখ্যা দেওয়া যায়। একজন পর্যটকের যা প্রত্যাশা থাকে তার প্রায় সমস্ত কিছুই পশ্চিমবঙ্গে আছে উত্তরে তুষারমৌলি হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরের সৈকতভূমি। রয়েছে ঘন অরণ্যানী আর অভয়ারণ্য, যার মধ্যে অনন্যসুন্দর হল উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং দক্ষিণে সুন্দরবন যাকে ইউনেসকো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এই রাজ্যে সুবিশাল পর্যটন সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৬ সালে 'পর্যটন'কে একটি 'শিল্প' হিসাবে ঘোষণা করে। একটি সুসংহত রাজ্য পর্যটন নীতি তৈরি করা হয়। এতে পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্য ও নীতি সম্পর্কে সবিস্তারে উল্লেখ আছে এবং সে ক্ষেত্রে উন্নয়নকারী, সুযোগপ্রদানকারী এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে রাজ্য সরকারের মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে বেসরকারি সংস্থা স্বয়ংশাসিত সংস্থা, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে সে জন্য কিছু প্রাথমিক নিয়মাবলী তৈরি করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার উন্নয়নে সহায়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার পর্যটন সংক্রান্ত একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যটন স্থলের শ্রেণীগত বিন্যাস এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ধরনটি নির্দিষ্ট করা যাবে। রাজ্য সরকার পরিকাঠামো ও যোগাযোগ এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বাইরে পর্যটন স্থলগুলিকে উন্নীত করার ব্যাপারে আরও বেশি গুরুত্ব দেবে। রাজ্য পর্যটন নীতির ভিত্তিতে রাজ্যের সমস্ত নতুন এবং বিকাশশীল পর্যটনকেন্দ্র যার বিনিয়োগের পরিমাণ ন্যূনতম ১ কোটি টাকা, সেগুলির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ প্রোৎসাহন পরিকল্প ২০০০ প্রযোজ্য হবে।

শিল্পোদ্যোগী এবং শিল্প পরিচালকদের এই সমাবেশে ১৯৯৬ সালে রাজ্য সরকারের পর্যটন নীতি ঘোষিত হওয়ার পর পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে যে সাফল্যগুলি অর্জন করেছে সে বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের ১৬০০ কোটি টাকার পর্যটন প্রকল্প যার মধ্যে রয়েছে আরও ২টি পাঁচতারা বিলাসবহুল হোটেল ও অন্যান্য হোটেল, প্রমোদ উদ্যান, জলক্রীড়া কমপ্লেক্স, রিসর্ট, মাল্টিপ্লেক্স ইত্যাদি। এগুলির কোনটির কাজ শেষ হচ্ছে আর কোনটি পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে সুন্দরবন এবং উত্তরবঙ্গের তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় মেগা প্রকল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, সাহারা ইন্ডিয়া যেটা হাতে নেওয়ার কথা ভাবছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। আমি আশা করি অন্যান্য বাণিজ্য সংস্থা পর্যটন ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তাবগুলি নিয়ে এগিয়ে আসবে। এ ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ মনোযোগ ও সহযোগিতা থাকবে।

আশা করি, আজকের সভার সুচিন্তিত আলাপ-আলোচনা থেকে রাজ্য এবং অঞ্চলে পর্যটনের জন্য একটি 'কর্ম' পরিকল্পনার ধারণাটি কিছুটা দানা বাঁধবে। এই আলোচনাচক্র থেকে যে সুপারিশগুলি বেরিয়ে আসবে আমি প্রত্যাশা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি। আমি উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে রাজ্য সরকার সেগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে।

শেষ করার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে আমার চিন্তা ভাবনাগুলি উপস্থাপিত করার সুযোগদানের জন্য আমি আরেকবার এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি, অতিথিবৃন্দ এবং অন্যান্য অভ্যাগত আজকের আলোচনায় যোগ দিতে এসেছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

বাংলার আর্থিক উন্নয়নে পর্যটনকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি উদ্যোগকেই আহ্বান জানাই

—পর্যটনমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রয়েছে অসংখ্য আকর্ষণীয় স্থান। পাহাড়-জঙ্গল, নদী-সমুদ্র, মন্দির-মসজিদ, প্রাসাদ-সৌধ মূল্যবান মণিমুক্তোর মতো এ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পর্যটন মানচিত্রে প্রতিটি স্থানই উল্লেখযোগ্য ভ্রমণবিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি। কিছুটা বা এককোণে পড়ে থাকা, কিছুটা বা অবহেলিতই বলা যায়—অথচ সম্ভাবনাময় এমন সব জায়গাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা (পর্যটন)। রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটন যতটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, ততটাই পারে পরিবেশ সচেতনার প্রসারে কার্যকরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। পরিবেশ পর্যটন সেজন্য মাত্রা পাচ্ছে। পর্যটন দপ্তর 'বাংলা দেখো' শীর্ষক এক বিরাট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পর্যটনমন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধি মন্দিরা ঘোষাল , সেরিনা জাহান এবং সুকান্ত রায়কে এ রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনা, সমস্যা এবং আগামী পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সাক্ষাৎকারটির পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হল।

প্র: *ভ্রমণ বাঙালির অতিপ্রিয় আলোচ্য বিষয়। তবুও বাংলার ভেতরে বেড়ানোর ব্যাপারে বাঙালির ততটা উৎসাহ দেখা যায় না। এ বিষয়ে আপনারা কী ভাবছেন ?*

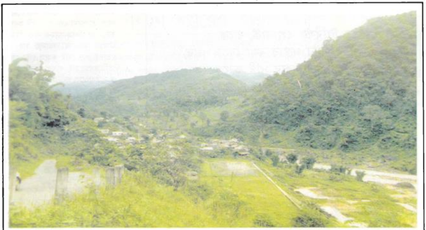
উ: হ্যাঁ, আমরাও সেটা মানি। বাঙালিরা গোটা ভারতবর্ষে ঘোরাফেরা করলেও বাংলার অনেক দর্শনীয় বস্তু দেখে না। বাঙালি দিল্লি আগ্রা ঘুরে আসবে অথচ বিষ্ণুপুর দেখবে না—এটা ঠিক নয়। বাংলার দিকে মুখ ফেরানোর চেষ্টা আমরা করছি। সেইজন্যই আমাদের 'বাংলা দেখো' কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্র: *'বাংলা দেখো'তে যে নতুন বিভাজনের কথা আপনারা ভেবেছেন তা কীভাবে পর্যটন পরিকাঠামোকে সাহায্য করবে বা উন্নত করবে ?*

উ: আমরা গোটা রাজ্যকে ছটা ভাগে ভাগ করেছি। ভৌগোলিক বিভাগ বা জেলা বিভাগের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ জেলাসীমার সঙ্গে এই বিভাজনগুলি নাও মিলতে পারে।



পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন পর্যটনমন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া
ছবি : অরিজিৎ ভট্টাচার্য



পর্যটনের সুবিধার্থে করা প্রশাসনিক এই ভাগগুলির বিন্যাস নিম্নরূপ :

(ক) দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চল—তিনটি পার্বত্য মহকুমা ; প্রধান কার্যালয়—দার্জিলিং।

(খ) নিম্ন হিমালয় অঞ্চল শিলিগুড়ি মহকুমা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ; প্রধান কার্যালয়—কোচবিহার।

(গ) মধ্য বাংলা—দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, নদিয়া, বর্ধমান (দুর্গাপুর ও আসানসোল বাদ দিয়ে) ; প্রধান কার্যালয়—বহরমপুর।

(ঘ) পশ্চিম বনাঞ্চল—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুর্গাপুর-আসানসোল, ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) ; প্রধান কার্যালয়—দুর্গাপুর।

(ঙ) কলকাতা—উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, মেদিনীপুর (ঝাড়খণ্ড, কাঁথি, তমলুক বাদ দিয়ে) ; প্রধান কার্যালয়—কলকাতা।

(চ) উপকূল বাংলা—দীঘা, কাঁথি, তমলুক, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বসিরহাট প্রধান কার্যালয়—দীঘা। এই প্রত্যেকটি বিভাগের দায়িত্ব একজন করে আধিকারিকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁদের মূল লক্ষ্য হল সংগঠিত পর্যটনের ব্যবস্থা ও প্রসার ঘটানো। নানা ধরনের ট্যুরের ব্যবস্থা করবেন এই আধিকারিকরা।

প্র: 'বাংলা দেখো'-র ভাবনার মূল লক্ষ্য কারা ? বাংলার ভেতরের পর্যটকরা না বাংলার বাইরের পর্যটকরা ?

উ: বাংলার বাইরের পর্যটকরাই মূল লক্ষ্য হলেও বাংলার ভেতরের পর্যটকরা তো আছেনই। 'বাংলা দেখো'-র ভাবনাটা নানা ভাষায় প্রচারের মাধ্যমে অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি।

প্র: অভ্যন্তরীণ পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে বড়ো বাধা পর্যটক আবাস বা কন্ডাক্টেড ট্যুরগুলির মূল্যমান। মধ্যবিত্ত বাঙালি পর্যটকের বাজেটের কথা মাথায় রেখে কোনও পরিকল্পনা কি করা যায় ?

উ: মধ্যবিত্ত বাঙালি পর্যটকের সীমিত বাজেটের কথা মাথায় রেখে আমরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করছি। অধিক সংখ্যক ডরমিটরির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি কিছু ইস্কুল বাড়িকে সাময়িক পর্যটক আবাস হিসেবে ব্যবহার করার কথাও আমরা ভেবে দেখছি। আসলে মাস্ ট্যুরিজম-এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমরা। সামনের বাজেটে হয়তো এই খাতে কিছু বরাদ্দ করতে পারব।

প্র: পশ্চিমবঙ্গে অনেক ভ্রমণ-বিন্দু আছে যার চারপাশে কোনও পর্যটন পরিকাঠামো নেই। স্থানীয় উদ্যোগকে বা পরিকল্পিত যৌথ উদ্যোগে এমন কি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা মনে রেখেও কি এগুলো সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় না ?

উ: নতুন জায়গায় ট্যুরিস্ট লজ বানিয়ে বা পর্যটনের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসা করে মুনাফার ইচ্ছা সরকারের নেই। লোকসানের যেখানে ঝুঁকি আছে সেখানে সরকারকেই এগিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গের গোসানিমারিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারই এগিয়ে যাবে। এটাকে একটা পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ধরছি আমরা। তবে পরবর্তী পর্যায়ে লজ বা হোটেলের ব্যবসার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে আমরা উৎসাহ জোগাব।

প্র: নতুন পর্যটন বিন্দু আবিষ্কার বা নতুন ভ্রমণ রুটের ব্যাপারে আপনাদের কোনও ভাবনার কথা যদি বলেন।

উ: গোটা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে অনাবিষ্কৃত জায়গা বা বিভিন্ন জেলায় লুকিয়ে থাকা বা স্বল্প পরিচিত ট্যুরিস্ট স্পটগুলির নাম একত্রিত করে আমরা একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার কথা ভেবেছি। এ ব্যাপারে জেলা সভাধিপতিরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করছেন।

> *ট্যুরিস্ট প্রোডাক্ট, যাকে বাংলায় পর্যটন সম্ভার বলা যেতে পারে, তা পয়সা খরচ করে সৃষ্টি করতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা সরকারি পয়সায় শেড তৈরি করতে চাই। বেঞ্চ তৈরি করতে চাই। অর্থাৎ, বিনা পয়সায় যে সুবিধাগুলো পর্যটকরা পেতে পারেন তা রূপায়ণের দায়িত্ব নেবে সরকার।*

প্র: *রাজ্যের পর্যটনের ক্ষেত্রে সড়ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার কোনও পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে ?*

উ: বিভাগীয় বাজেট থেকে এই খাতে আমরা কিছু বরাদ্দ করি না। গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আমরা প্রস্তাব রেখে থাকি। তবে ট্যুরিস্ট স্পটের অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ আমরাই করে থাকি।

প্র: *পর্যটন 'শিল্প' হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এই শিল্পের সমস্যা বা সম্ভাবনার দিকগুলি কী কী ?*

উ: অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে দু-তিন ধরনের পেশার মানুষ লাভবান হন। প্রথমেই বলতে হয় রিক্‌শাচালক, সাইকেল ভ্যান চালক বা অটো চালকদের কথা। বক্রেশ্বর বা পুরুলিয়ায়, রসিক বিল এলাকায় রোজ অন্তত পঞ্চাশটা অটো চলছে। একদিকে যেমন লজেন্স চকোলেট বিক্রি করে একদল মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছেন তেমনই বড়ো হোটেল তৈরি হলে তাকে কেন্দ্র করে বাজার গড়ে ওঠে। কথায় বলে, পর্যটন ক্ষেত্রে সরকার ২ টাকা বিনিয়োগ করলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৩ টাকা অর্জিত হয়।

প্র: *পর্যটন উন্নয়নে অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলোকে নিয়ে কীভাবে কাজ করছেন ?*

উ: পর্যটনের সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, যেমন বিদ্যুৎ, পূর্ত। বিভিন্ন দপ্তরকে একসঙ্গে নিয়ে আমাদের কাজ করিয়ে নিতে হবে।

পর্যটকদের সুবিধার কথা ভেবে আমরা এক জায়গা থেকে নানা বিভাগের পর্যটন আবাস বুকিংয়ের কথা ভেবেছি। সব দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে বসে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। বন দপ্তর রাজি হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। আপাতত এক বছর এভাবে চলবে, তারপর আমরা চেষ্টা করব পুল ডাউন করার। এখন আলাদা আলাদা কাউন্টারের মাধ্যমে এবং কম্পিউটারের সাহায্যে বুকিংয়ের কাজ চলছে। তাছাড়া মাস্ ট্যুরিজম-এর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে আমরা একযোগে কাজ করতে চাই। জেলা ও মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিকদের কাছ থেকে পর্যটন সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি যাতে সাধারণ মানুষ পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে আমরা আগ্রহী।

প্র: *রাজ্যের পর্যটনে বেসরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তাভাবনা কী ?*

উ: প্লেনে চড়ে ঘোরা পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে উঁচুমানের কিছু পর্যটন আবাসও আমরা তৈরি করতে চাই। নিক্কো পার্কের ধাঁচে টিকিট বিক্রি করে বেড়ানোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা ব্যবসায়ীদের আহ্বান করছি। যেমন গড়পঞ্চকোটে রোপওয়ে চালু করতে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে আমরা উৎসাহী। তবে ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া অধিকার চান আর সরকার চায় প্রতিযোগিতা। ট্যুরিস্ট প্রোডাক্ট, যাকে বাংলায় পর্যটন সম্ভার বলা যেতে পারে, তা পয়সা খরচ করে সৃষ্টি করতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা সরকারি পয়সায় শেড তৈরি করতে চাই। বেঞ্চ তৈরি করতে চাই। অর্থাৎ, বিনা পয়সায় যে সুবিধাগুলো পর্যটকরা পেতে পারেন তা রূপায়ণের দায়িত্ব নেবে সরকার প্রত্যেক জেলায় 'অ্যামিনিটিস ফর দ্য ট্যুরিস্ট' খাতে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা হচ্ছে, এটা সবটাই পরিকাঠামোর জন্য সরকার ন্যূনতম পরিকাঠামোর (infrastructure) বিষয়টি দেখবে। বিনিয়োগের (investment) বিষয়টি দেখবেন ব্যবসায়ীরা। সরকার পর্যটনকে উৎসাহিত করবে কিন্তু লাভ লোকসানের ব্যবসা করবে না। বাংলার আর্থিক উন্নয়নে পর্যটনকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি উদ্যোগকেই আহ্বান জানাই

প্র: *আজকাল প্রচুর বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু অসাধু বা ঠগ ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হচ্ছেন। এ ব্যাপারে কিছু করা যায় কি ?*

উ: ভারত সরকারের একটা রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা আছে। ভ্রমণ সংস্থাগুলিকে তারা নথিভুক্ত করে। রাজ্যে তেমন ব্যবস্থা নেই। তবে আমরা একটা আইন করতে চাই। তার ড্রাফটও তৈরি হয়ে গিয়েছে।

প্র: *নদীপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আপনারা নতুন কিছু ভেবেছেন কি ?*

উ: কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের একটা ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকদের কথা ভেবে পাহাড়ি নদীতে র‍্যাফটিংয়ের ব্যবস্থা করার কথা আমরা চিন্তা করছি।

প্র: *পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ছোট রেল চলে। পর্যটনকে আকর্ষণীয় করতে এই 'ছোট রেল' নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তাভাবনা আছে ?*

উ: 'ছোট রেল'-এর বিষয়টি রেলওয়ে ট্যুরিজম-এর কাছে যদি আমরা প্রস্তাবাকারে পাঠাই তাহলে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা হতে পারে বা কর্মসূচির মধ্যে তা থাকতে পারে। এ ব্যাপারটি রাজ্য সরকারের একক উদ্যোগে সম্ভব নয়।

পর্যটন দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ

গত জুন মাসে পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ২০০১-২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের বাজেট বিধানসভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তৃত আলোচনার পর বিধানসভায় তা অনুমোদিত হয়। সেই বাজেটের পূর্ণ বয়ান নিম্নে দেওয়া হল। —সঃ পঃ

মূল খাতে মোট ১৫,৫৪,০৩,০০০ (পনেরো কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিন হাজার) টাকা মাত্র এবং ৮৪ নং দাবির অন্তর্ভুক্ত "৫৪৫২—পর্যটন মূলধন ব্যয়" মূল খাতে মোট ৪,৬৩,০০,০০০ (চার কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকা মাত্র ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরির জন্য প্রস্তাব পেশ করছি। এই দুই খাতে আপাতব্যয়মঞ্জুরিতে মঞ্জুরিকৃত টাকা (যথাক্রমে ৪,৬৩,৬৮,০০০ এবং ১,৫৪,৩৩,০০০) এই ব্যয়-বরাদ্দের অন্তর্গত। ৮৪ নং দাবির অন্তর্ভুক্ত "৩৪৫২—পর্যটন" মূল খাতে মোট ১৫,৫৪,০৩,০০০ (পনেরো কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিন হাজার) টাকার মধ্যে ৪,৫৪,০৩,০০০ (চার কোটি চুয়ান্ন লক্ষ তিন হাজার) টাকা যোজনা-বহির্ভূত খাতে, ১১,০০,০০,০০০ (এগারো কোটি) টাকা রাজ্য যোজনায় এবং ৩,৩০,০০,০০০ (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে ব্যয় করা হবে।

পরিকল্পনা খাতের ১১ কোটি টাকার মধ্যে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন উন্নয়নের জন্য দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে বরাদ্দ করা ৩০ লক্ষ টাকাও ধরা আছে।

ভারতবর্ষ সহ সমস্ত পৃথিবীর মানুষেরই পর্যটন একটি প্রাচীন প্রবৃত্তি। প্রধানত ধর্ম ও তীর্থস্থানকে অবলম্বন করেই প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে পর্যটন বা ভ্রমণপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা যুগে যুগে বর্ধিত হতে হতে আজও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তীর্থকে অবলম্বন করেই ভ্রমণ করে থাকেন। তীর্থস্থানগুলি শুধু ধর্মের কারণে নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশের কারণেও যুগ যুগ ধরে পারলৌকিক ও ঐহিক ক্ষুধা মিটিয়ে আসছে। সেই সমস্ত স্থানে মানুষের থাকা, খাওয়া, যানবাহন প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেগুলি ক্রমেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবেও গড়ে উঠেছে।

এই রকম তীর্থস্থানের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বেশি নেই। কিন্তু তবুও দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ, গঙ্গাসাগর, তারকেশ্বর, উত্তরবঙ্গের জল্লেশ্বর প্রভৃতি এখনও বহু মানুষকে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে টেনে আনে, দ্বিতীয়ত, ধর্ম ছাড়াও নিতান্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে মানুষকে টেনে এনে চিত্তে শান্তি দেবার মতো স্থানও পশ্চিমবঙ্গে বহু। তার মধ্যে হিমালয়ের পর্বতরানী দার্জিলিং, তার পাশে কালিম্পং, কার্শিয়াং প্রভৃতি ও নিকটবর্তী আরও অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ গোটা ভারতের ও পৃথিবীর মানুষকে চিরকাল টেনে আনছে। পাহাড়ের নিচেই রয়েছে তরাইয়ের অরণ্য, অরণ্য-প্রাণী এবং পাদদেশে সুন্দর সুন্দর চা-বাগিচা ও রঙে-রসে ভরপুর নানা গোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষজন। তারপর থেকেই শুরু হল কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের সুদূর ও নিকট-অতীতের ঐতিহ্যময় স্থাপত্যসমূহ। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে জলজঙ্গলের সমাহারে পৃথিবীখ্যাত সুন্দরবন। কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ও বৃহত্তম মহানগরী কলকাতা আর সেই কলকাতায় ব্রিটিশ আমলের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মনুমেন্ট, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি বহু দ্রষ্টব্য স্থান। সেই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রথম পাতাল রেলপথ, বিড়লা তারামণ্ডল, বিজ্ঞাননগরী প্রভৃতি আধুনিকতম দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য বস্তুসমূহ। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহ আজ পশ্চিমবঙ্গকে একটি আদর্শ পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। কিন্তু বহুদিন ধরে নানা কারণে যেমন ভারতের পূর্বাঞ্চল উপেক্ষিত, পর্যটনের ক্ষেত্রেও তাই জাতীয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। বর্তমান পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করার ও সম্ভাবনাপূর্ণ পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে পর্যটন মানচিত্রে আনার তেমন ব্যবস্থা হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরবার ব্যবস্থা হয়নি।

পর্যটকদের আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য বেসরকারি পুঁজি এখনও পশ্চিমবাংলায় তেমনভাবে নিয়োজিত হয়নি। সরকার অবশ্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে কিছুটা দায়িত্ব পালন করছে। বেসরকারি ব্যক্তিগণও পরিকল্পনাহীনভাবে এ কাজে অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তা পর্যটক পরিষেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অথচ বেসরকারি পুঁজি প্রয়োগ করে সঙ্গতভাবে আয় উপার্জন করার সুযোগ আছে এ ক্ষেত্রে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুঁজির সাহায্যে যথেষ্ট কর্মসংস্থানেরও সুযোগ আছে পর্যটন ক্ষেত্রে।

তাই পুরাতন পর্যটন ক্ষেত্র ও পর্যটন বস্তুগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সাধ্যমত উন্নত করা, নতুন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র ও পর্যটন বস্তুসমূহ জনগণের সামনে আনা ও সেখানে অগ্রণী ভূমিকা হিসাবে প্রয়োজনে পরিবহন ও আবাসনের জন্য প্রাথমিকভাবে সরকারি ব্যবস্থা করা, সাধারণভাবে পরিবহন ও আবাসনের জন্য বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে নিয়োজিত করা এবং বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহকে নতুন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র ও পর্যটন বস্তুসমূহকে বিকশিত করার ও সেগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার উপরই রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করছে। আর এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফলে এ রাজ্যে যে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে রাজ্য সরকার সেই অভিমুখে তার নীতিসমূহ পরিচালিত করবে।

এ সমস্ত কাজের জন্য রাজ্য সরকার পর্যটন দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১১ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রেখেছে। কয়েকটি নতুন পর্যটক নিবাসের কাজ চলছে। সেখানে রাজ্য সরকারকে নিজস্ব অংশ দিতে হবে। কিছু পুরাতন পর্যটক নিবাস পরিবর্তন না করলেই নয়। কিছু পর্যটক নিবাস পুননবীকরণ করতে হবে। তা ছাড়া পুরাতন পর্যটন ক্ষেত্র ও পর্যটন বস্তুর উন্নয়ন, নতুন পর্যটন ক্ষেত্র ও পর্যটন বস্তুর বিকাশসাধন এবং অগ্রণী ভূমিকা হিসাবে নতুন পর্যটন ক্ষেত্রে অপরিহার্য পরিবহন ও আবাসনের ব্যবস্থার জন্য কিছু পুঁজি প্রয়োগের জন্য পরিকল্পনা খাতের অর্থের সঙ্গে বেসরকারি পুঁজিও বেশ কিছু নিয়োজিত হবে বলে রাজ্য সরকার আশা করে। সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিস্তৃত খতিয়ান স্বতন্ত্র বাজেট পুস্তিকায় দেওয়া হয়েছে। আশা করি মাননীয় সদস্যগণ ২০০১-২০০২ আর্থিক বছরের জন্য পরিকল্পনা খাতে ১১ কোটি টাকা ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকার ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করবেন।

রাজ্যের নতুন পর্যটন বিভাগ



দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চল



নিম্ন হিমালয় অঞ্চল



মধ্য বাংলা



পশ্চিম বনাঞ্চল



কলকাতা



উপকূল বাংলা

দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চল



○ দার্জিলিং ○ কালিম্পং ○ কার্শিয়াং

তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, সবুজ পার্বত্য গ্রাম ,খরস্রোতা নদী - রূপসী প্রকৃতির অনাবিল আকর্ষণে পর্যটনের স্বপ্নরাজ্য দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চল । সান্দাকফু - ফালুট, লাভা - লোলেগাঁও -রিশপ , বিন্দু- তোদে-তাংতা, ধোতরে- রিম্বিক-বিজনবাড়ি-কাঁইজলিয়া হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হিমালয়ের পথে

মন্দিরা ঘোষাল

ঠিক হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে হিমালয় নিয়ে একটি প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে পত্রিকার 'পর্যটন' বিশেষ সংখ্যায়। পর্যটন দপ্তরের কাছ থেকে জানা গেল, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে তাঁরা ছয়টি ভাগে ভাগ করে একটি সংহত পর্যটন-পরিকল্পনা করেছেন। দার্জিলিং জেলার তিনটি সাব-ডিভিশন দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং নিয়ে তাঁরা রচনা করেছেন 'হিমালয়ান সার্কিট'। পরিকল্পনার কথা জানাতেই অযাচিত সাহায্য পেলাম পর্যটন দপ্তরের। শিলিগুড়ি থেকেই হিমালয়ের পথে শুরু হল আমার পরিক্রমা।

দার্জিলিং মেলে রওনা হয়েছিলাম সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যখন নামলাম তখন বেলা ৯টা। আধা-কর্মব্যস্ত রবিবারের শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়ে রিক্সায় মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে এসে পৌঁছলাম মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে। অনবদ্য আতিথ্য, ডেস্ক থেকে সর্বক্ষণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছেন বন্ধুরা। ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট করপোরেশনের ট্যুরিস্ট লজ মৈনাক হোটেল। বাইরে সবুজ লন আর অন্তরে উষ্ণ অভ্যর্থনা। সরকারি কর্মচারীর তথাকথিত রুটিন কাজ নয়, পেশাদারি দক্ষতায় তাঁরা চেষ্টা করছেন আপ্যায়ণের। যোগাযোগ হল ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট করপোরেশনের ম্যানেজার অপারেশন (উত্তর) সুব্রত সেনগুপ্তর সঙ্গে। কলকাতায় আসার আগেই শুনেছিলাম উত্তরবঙ্গের ভ্রমণবিন্দুগুলির সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের, আপনজনের মতই পরিচয়। ছুটির দিন হলেও তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই। তবু সন্ধ্যার পর সময় দিলেন কথা বলার।

আগামীকাল দার্জিলিং যাব। অতএব খোঁজখবর করতেই হল যাতায়াত ব্যবস্থার। শুনলাম, সিজনে বাস, শেয়ারে জিপ, মারুতি সবই মেলে। তাতে খরচও কমে অনেকটা। কিন্তু এখন অসময়। গত শুক্রবার পর্যন্ত খুবই বৃষ্টি হয়েছে। আজ দুদিন ধরে আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু ট্যুরিস্ট প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে পুরো মারুতি ভ্যান ভাড়া নেওয়া ছাড়া গতি নেই। ভাড়ার গাড়ি দরাদরি শেষে ৬৫০ টাকায় দার্জিলিং পৌঁছে



দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

ছবি : পঃ বঃ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

দেওয়া সাব্যস্ত হল। কাল সাড়ে আটটায় রওনা হব শৈলসুন্দরী দার্জিলিঙের পথে।

হিমালয়কে কেন্দ্র করে যে পর্যটন তার সূচনাবিন্দু শিলিগুড়ি শহর। যেজন্য পর্যটন বিভাগ দার্জিলিংয়ের তিনটি পাহাড়ি সাব-ডিভিশনকে নিয়ে যে হিমালয়ান সার্কিটের পরিকল্পনা করেছেন তারও মধ্যমণি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে শিলিগুড়ি। এখান থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং তো বটেই, অসংখ্য বাস-ট্রেকার-মারুতি চলছে আসাম-অরুণাচল প্রদেশ-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-নেপাল-ভুটান-সিকিম। চলছে পণ্য পরিবহনও। সারাদিনই শহর জুড়ে ব্যস্ততা। অটো দৌড়ে বেড়াচ্ছে শহরের এমাথা থেকে ওমাথা। রিক্সার ভিড়ে ছোট ছোট মোড়গুলো জ্যাম। কলকাতার মতোই বিশ্বকর্মা পুজোর প্যান্ডেল গলির এ-মাথা ও-মাথায়। আর তাকে ঘিরে ছোট ছোট জটলা পাড়ার ছেলে-বুড়োর। যদিও সময়ের শ্যাওলা জমেছে শহরটির গায়ে, তবু বয়সের ক্লান্তি তাকে তেমন কাবু করতে পারেনি। পায়ে হাঁটলেই শিলিগুড়িতে নজরে পড়ে ট্রাভেল এজেন্সি। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ভাড়ার গাড়ি। নানা ট্যুর প্রোগ্রাম—বিচিত্র ভ্রমণবিন্দুর খবর লেখা কাঁচের গায়ে। অসময়—কেউ আসছে না—তাই ক্লান্ত যুবকটি ঘুমিয়ে পড়েছে

কাউন্টারে মাথা রেখে। প্রশ্ন করে জানলাম—শহর জুড়ে এখন কাজ করছে কম করে ২০৩টি ট্রাভেল এজেন্সি। কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কোনও সরকারি বাঁধনই এদের নেই। অভিজ্ঞতাও নেই ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও ট্রেনিং। দুটো বাস আর চারটে মরুতির মালিক হলেই শুরু করে দিচ্ছেন ট্রাভেল এজেন্সি। বিপত্তিও ঘটছে অনেক. প্রবঞ্চনা—পরিকল্পনাহীনতার শিকার হচ্ছেন অনেক পর্যটক। ফলে বদনাম হচ্ছে কলকাতার পর্যটনের। 'বাংলা দেখো' অভিযান সূত্রে কি এদের জন্য কোনও রেজিস্ট্রেশনের কথা ভাবা যায় না? ভাবা যায় না কোনও নোডাল এজেন্সির কথা—যাঁরা পর্যটন পরিকল্পনার সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ভাববেন, লক্ষ রাখবেন সকলের ওপর? দরকার হলে ট্রেনিং দেবেন, প্রয়োজনে শাসন করবেন—সরকারি উদ্যোগে এমন কিছু কি করা যায় না? শিলিগুড়ি শহরে বা পথে-বিপথে করা যায় না সুলভ শৌচালয়? বড় বড় হোটেল অনেক আছে—ট্যুরিজমের হোটেলগুলি সত্যিই এদের সঙ্গে অনেক টক্কর দিচ্ছে। কিন্তু শিলিগুড়ি তো পর্যটকের বন্ধু যাতায়াতের পথে। শিলিগুড়িতে ২/৩ দিন থাকার মতো মধ্যবিত্তের পকেটসহ যাত্রীনিবাস গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারেন পর্যটন দপ্তর। খুব বিলাসবহুল ব্যবস্থা না-ই বা থাকল—সাধারণ সুযোগসুবিধাটুকু থাকলেই হবে। মৈনাকের পেশাদারি যোগ্যতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সরকারি ব্যবস্থার একটু ভাল সার্ভিস পেলে বিদেশি ট্যুরিস্ট এদিকেই ঝুঁকবেন।

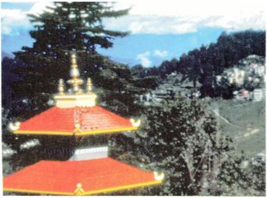
দার্জিলিং

'দোর্জি'—অর্থাৎ বজ্রের দেবতার বাসভূমি এই দার্জিলিং। লেপচাদের ভগবান বজ্রের দেবতার বাসভূমির কাছাকাছিই বাস করতেন এ অঞ্চলের সব থেকে পুরনো উপজাতি লেপচারা। সিকিমের রাজা একসময় দখল নিয়েছিলেন এই পাহাড়-বনের। তিস্তা, রঙ্গিত, রাম্মানের ধারায় ঘেরা এই পাহাড় আর বনভূমিকে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেন ইংরেজ সেনানী লয়েড। তিনিই ইংরেজ সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান এই অঞ্চলে ইংরেজ সৈনিকদের জন্য একটি স্যানাটোরিয়াম গড়ে তোলার। সেটা ছিল ১৮২৯ সাল। এ নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩৫ সাল নাগাদ সিকিম সরকারের থেকে ব্রিটিশরা দার্জিলিং, কালিম্পং ও তরাই অঞ্চলের পত্তনি পায়। তখন দার্জিলিঙে ছিল মাত্র ১০০ জন মানুষের বাস। ১৮৪০-এ দার্জিলিঙে আসার প্রথম রাস্তা পাঙ্খাবাড়ি রোড গড়ে ওঠে। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, সে সময় শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং আসতে হত কিছুটা নৌকা—কিছুটা পালকি—কিছুটা পায়ে হেঁটে। তাতে সময় লাগত অন্তত ১৫ দিন, আর খরচ হত তখনকার মূল্যে ৩০০ টাকা। আর আজ পাহাড়ি পথ বেয়ে মাত্র ৬০/৭০ টাকা খরচা করেই একজন ৩ ঘণ্টায় অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছেন দার্জিলিং। আজকের দার্জিলিঙের রূপকার হিসেবে যদি কোনও বিশেষ ব্যক্তির নাম করতে হয় তাহলে মিঃ ক্যাম্পবেলের অক্লান্ত প্রয়াসের কথা অবশ্যই বলতে হবে। তাঁরই প্রচেষ্টায় এখানে গড়ে ওঠে চা-বাগিচা, স্যানাটোরিয়াম, নামী-দামি মিশনারি স্কুল। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে ১৮৫০ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১০,০০০। ১৮৬১ সালে শুরু হয় হিল কার্ট রোড। পি ডব্লিউ ডি-র এই অনন্য প্রকল্পটি শেষ হয় ১৮৬৬ সাল নাগাদ, খরচ হয় প্রায় ১৪½ লক্ষ টাকা। ১৮৮১ সালে লোকসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় দেড় লক্ষাধিক, শুরু হয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কাজ।

এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘগুলো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। তবু কাঞ্চনজংঘা ঢাকা পড়ে আছে। দার্জিলিঙে এই আমার প্রথম আসা। শুনেছি সোনাঝরা সকালে দার্জিলিঙের নাকি তুলনা নেই। স্বপ্ন দেখছি—কাল সকালেই মেঘ ভেঙে প্রথম সূর্য উঠবে কাঞ্চনজংঘার শিয়রে। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে এই যে এলাম এতটা পথ, এও কি স্বপ্ন নয়? নিবিড় শ্যামলিমায় ঘেরা পাহাড়ি পথ—মেঘ-রৌদ্রের বিচিত্র লুকোচুরি—পাহাড়ি উচ্ছল স্রোতে জেগে ওঠা—বর্ষায় ধরিত্রীর এই নয়নশোভন রূপের তুলনা কোথায়? সত্যি সত্যিই 'তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল/ শ্যামল বনান্তভূমি করে টলমল'। পথ হারিয়ে যাচ্ছে বনের আড়ালে—ওই দূরে পাহাড়ের কোলে জনবসতি আর সবুজ চা-বাগান স্তরে স্তরে—এই পথটার বাঁক ঘুরলেই পাহাড় থেকে নেমে এসে মেঘটা ছুঁয়ে ফেলছে আমাকে—একা অরণ্যানীর নিবিড় মায়ার মাঝে আমি এক মেঘবালিকা—ওই কালো প্রজাপতি, এই বেগুনি রঙের ফুল, ওই ঝোরাটা, ওই দূরের বৃষ্টিভেজা নীল—এরা সবাই বন্ধু ছিল আমার—এদের সঙ্গে আমার খেলা সময় থেকে সময়ান্তরে। শহর কলকাতায় জানালার চৌখুপিতে তোমায় পেয়েছি—এবার তোমায় পাওয়া আমার বিশ্বজুড়ে। বর্ষা না হলে এমন শ্যামল দিগন্ত পেতাম কোথায়? সেজন্য বলি, শুধু



ছবি : লেখিকা



ছবি : পঃ বঃ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

প্রখর গ্রীষ্মে নয়, শরতে বা শীতেও নয়, বর্ষাতেও পথ খোলা থাকলে চলে আসুন পায়ে পায়ে দার্জিলিঙের কাছে। মহিম্ন শ্যামলিমা নিয়ে অপরূপ রূপময়ী বনভূমি আর শৈলমালা মেঘ জড়িয়ে অপেক্ষায় আছে আপনার। পায়ে হেঁটেই ঘুরে আসুন ম্যাল। পরদিন চলুন ঘুরে আসি তেনজিং নোরগে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক, টিবেটান রিফিউজি সেলফ হেল্প সেন্টার, লেবং রেসকোর্স, গোর্খা স্টেডিয়াম ও হ্যাপি ভ্যালি চা বাগিচা। টাইগার হিলে সূর্যোদয় দিয়েই দিন শুরু করতে পারেন, দিন শেষ করা যায় চুন্নু সামার ফল্‌স ও গঙ্গামায়া পার্ক দিয়ে।

ব্রিটিশের সামার ক্যাপিটাল হিসেবেই এই শহর নন্দিত হয় আভিজাত্যের মুকুটে। পুরনো দার্জিলিঙের অধিকাংশই ব্রিটিশ স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে। বিদেশি পর্যটক আজও আসেন এর রমণীয় সৌন্দর্যের আকর্ষণে। কেভেন্টার ডেয়ারির দোকান, বেকারির সঙ্গে ফলের রসের মধুর সাহচর্য, নেপালি কিউরিওর দোকান, ম্যালের চৌমাথায় শখের ঘোড়সওয়ার আর পাকদণ্ডি বেয়ে হেঁটে চলা বহুদূর—এসব কিছুই পালটায়নি শতাব্দী পেরিয়েও। আমাদের এখনকার ঠিকানা দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজও আগের মতোই। চারপাশে কাঁচের জানালা ঘেরা বিরাট বিরাট ঘর—এমনকি লেখার টেবিল জানালা ঘেঁষা, আরামকেদারা—পরদা সরালেই হিমালয়ের শিরায়-শিখরে মেঘ-রৌদ্রের খেলা। নেপালি যুবক-প্রৌঢ় সদাপ্রস্তুত আতিথ্যে। মহার্ঘ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আবাহনে-আতিথ্যেও গভীর আভিজাত্য। ছুটিকে ভরিয়ে দেবে নিজের মতো প্রশান্তি আর প্রয়োজনীয় আমন্ত্রণের উষ্ণতায়। গতকাল কথা হচ্ছিল পর্যটন উন্নয়ন নিগমের সুব্রত সেনগুপ্তর সঙ্গে। বলছিলেন, এখন এসেছেন, অন্যরকম প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবে আপনার। আসলে পর্যটক এখানে যদি শুধু আসেন সাইট-সিয়িং-এর জন্য, তাহলে এর সঙ্গে আসল পরিচয় ঘটা কঠিন। আর যদি ক্লান্ত-শ্রান্ত মনে প্রতিদিনের দৌড়ের জীবন থেকে দূরে খানিকটা অক্সিজেন, প্রশান্তি আর নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে যেতে চান, তাহলে বারবার নানা ঋতুতে আসুন এই হিমালয়ে, উত্তরবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে। কথাটা যে কত সত্যি তা আজকের এই বর্ষায় কিশোরী প্রকৃতিকে না ছুঁয়ে দেখলে কিছুতেই অনুভব করতে পারতাম না। ফুল ফোটার সময়, পাতা ঝরার সময়কার শৈলশিখরের অরণ্যানীর গল্প অনেক শুনেছি—কিন্তু নির্জনতার কাঞ্চনজংঘা, প্রায় ট্যুরিস্টহীন দার্জিলিং—উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীর মতো বন-জঙ্গলের চুপিচুপি কথা বলা, এমন উজল-কালো আকাশ আর হাত বাড়ালেই তুলোর মতো মেঘ—এ এক অন্য পৃথিবীর কথা—রঙ্গময়ী প্রকৃতির এ এক অনন্য রূপমাধুরী।

দার্জিলিং-কার্শিয়াং দুটি সাব-ডিভিশনের প্রায় একই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, একই ধরনের জনগোষ্ঠী নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দার্জিলিং জেলা সদর—তাই সরকারি ব্যস্ততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে তার জনবহুলতা। কিন্তু একটা শহর মানে কি শুধুই ভূগোলের সীমানাচিহ্ন অথবা ভূপ্রকৃতি। না, শুধু তেমনভাবে দেখলে কিছুতেই স্পর্শ করা যাবে না সেই পরশমণিকে যার নাম হৃদয়। ১৯২৯ সাল থেকে যে জনপদ পথচলা শুরু করেছে তার পুরনো ইমারতে লেখা আছে তার ইতিহাস। জেলা তথ্য আধিকারিক সুপ্রীনা ব্রোন সেই ইতিহাসকেই চেনালেন নতুন করে।

কার্শিয়াঙের অবনীন্দ্র ভবন তেমনই এক গল্পকথা—যেখানে ১৯৩৩ সালে বাস করেছেন কবি-গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন আর ১৯৪২ থেকে যেখানে বাস করেছেন শিল্পস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাড়িটি বর্তমানে কার্শিয়াং ডিভিশনের সেকেন্ড অফিসারের সরকারি বাসভবন।

দার্জিলিঙের রাজভবন ১৯৪০ সালে ছিল এডওয়ার্ড হপারের মালিকানায়। অনেক হাতবদলের পর এটি কোচবিহারের রাজার হাতে আসে, তাদের কাছ থেকেই ব্রিটিশ সরকার এটি কিনে নেন ১৯৭৭ সালে। কিছু সংস্কারের পর এটি বাংলা সরকারের লেফটেনান্ট গভর্নরের বাসভবনে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে তিনি এখানে প্রথম বসবাস শুরু করেন। স্যার অ্যাসলি ইডেন এই ভবনে গাড়িবারান্দা ও টাওয়ার যোগ করেন এবং স্যার সি ইলিয়ট যোগ করেন দরবার হল। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক রাজ্যপালই বছরে অন্তত একবার এ বাড়িতে আসেন।

পুরনো সেক্রেটারিয়েট দপ্তরটিও বহু ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৯৮ সাল থেকে এই বাড়িটি নানা দপ্তরের ঠিকানা। ক্রমশ কাজ বেড়ে যাওয়ার দপ্তরগুলি ছড়িয়ে পড়েছে, তবু এই বাড়ি আজও বহু সরকারি দপ্তরকে আগলে রেখেছে। আমাদের জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরও এখানেই।

সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চ দার্জিলিঙের সবচেয়ে পুরনো চার্চ। ১৮৪৩ সালের ৩০ নভেম্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এখানে ১৫০ জন একত্রে উপাসনা করতে পারেন। ১৮৪৪ সালে বহরমপুরের চ্যাপলিন-এর প্রথম উপাসনাটি পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৮৬৭ সালে এক ভয়াবহ বজ্রপাতে চার্চটির কয়েকটি অংশ বিধ্বস্ত হয়। বিশপ মিলম্যানের উদ্যোগে ১৮৭৯ সালে মে মাসে এটি নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকে। তিনবছর পর এর কাজ শেষ হয়।

মহারানী গার্লস স্কুল দার্জিলিঙে বাঙালি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। উচ্চস্তরের শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন কিছু ব্যক্তিত্ব এখানে বসবাসের জন্য, কখনও কখনও লম্বা গ্রীষ্মাবকাশের জন্য এখানে আসেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকার তাঁর স্বামী বিপিনবিহারী সরকার ও কোচবিহারের মহারানীর সহায়তায় ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিঙে মেয়েদের জন্য এই মহারানী বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। প্রথমে এটি ক্যাপিটাল হলের কাছে ছিল, পরে বর্তমান অবস্থানে আসে। ভাবলে অবাক হতে হয়, বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের প্রথম অক্ষর পরিচয় হয়েছিল এই বিদ্যালয়ে।

এরকমই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লরেটো কনভেন্ট। ১৮৪৬ সালে তিনজন আইরিশ সন্ন্যাসিনী এসেছিলেন এ অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের ব্রত নিয়ে। এঁদের মধ্যেই একজন পরবর্তীকালে মাদার টেরিজা নামে বিশ্ববন্দিতা। তাঁরাই একটি কুঁড়েঘরে লরেটো কনভেন্টের গোড়াপত্তন করেন। ১৮৯২ সালে সেটি বর্তমান পাথরের কাঠামোয় সেজে ওঠে। এটির পরিকল্পক ও স্থপতি ছিলেন ই জে মর‍্যালিটি। আজও এটি একটি মিশনারি পরিচালিত আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাসভূমি স্টেপ-অ্যাসাইড ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী। ১৯২৪ সালে এখানেই আকস্মিক জীবনাবসান ঘটে তাঁর। এখন এখানে চালু আছে একটি শিশু ও মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র।

আর একটু পায়ে পায়ে হেঁটে গেলেই দেখা মিলবে রয় ভিলা-র। তিনতলা বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। এই বাড়িতেই ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর জীবনাবসান ঘটেছিল ভগিনী নিবেদিতার।

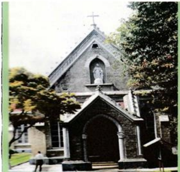
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর গাছের সজীবতার তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে ১৯১৮ সালে এখানে গড়ে তুলেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। আজ সেই প্রতিষ্ঠানেই গড়ে উঠেছে জগদীশচন্দ্র বসু মিউজিয়াম।

মনাস্ট্রি বা বৌদ্ধ উপাসনাগৃহের দেশ এই হিমালয়। ভগবান তথাগতের বাণী নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় এখানে ধর্মচর্চা করেন। ঘুম মনাস্ট্রি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। হলুদ সম্প্রদায়ের লামাদের প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি একসময় রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত। ১৫ ফুট উঁচু চম্পা বা মৈত্রেয়র মূর্তি ছাড়াও এখানে তিব্বতি ভাষায় ব্লকে লেখা বুদ্ধের উপদেশবাণী ১৬টি খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। এ ছাড়াও আছে বহু তিব্বতি ধর্মীয় পুঁথি। প্রাচীরের গায়ে রঙিন ফ্রেসকোগুলি মনোমুগ্ধকর।

দার্জিলিং-ভুটিয়া বস্তির ফোডং মনাস্ট্রি অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে সিকিমের ফোডং মনাস্ট্রির শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি লাল সম্প্রদায়ের করমাপা শাখার উপাসনাগৃহ। এটি প্রথমে ছিল অবজারভেটরি হিলে, পরবর্তীকালে এটি ১৮৬০-৬১ সালে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের পূর্বদিকে স্থানান্তরিত হয় গোর্খাদের ১৮১৫ সালের আক্রমণের পরে। ১৮৭৮-৭৯ সালে এটি বর্তমান অবস্থান ভুটিয়া বস্তিতে স্থানান্তরিত হয়।

কার্শিয়াংয়ের সেলফুতে লেপচা বৌদ্ধ মনাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯ সালে। সেলফু কার্শিয়াং শহর থেকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠা করেন সুনপতি লামা এবং নাম দিয়েছিলেন সাকচিয়েলিং বৌদ্ধ গুম্ফা। এখানে যে সব মূর্তিগুলি আছে তা তৈরি করার জন্য ভুটান থেকে মাটি নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সে মূর্তিগুলি আজও অবিকৃত আছে—জানালেন গুম্ফার বর্তমান রক্ষক চৌগে লামা।

দার্জিলিঙের টয় ট্রেন দার্জিলিঙের বিস্ময়। ১৮৭৮ সালের মধ্যে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এসে গিয়েছিল রেলপথ। দার্জিলিঙে তখন সড়কপথে সাধারণ পর্যটককে যেতে হত টাঙ্গায় করে। ফ্রাঙ্কলিন প্রেস্টেজ নামে এক ইংরেজ ১৮৭৮ সালে একটি বাষ্পীয় ট্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত ও কার্যকরী হয় দ্রুততার সঙ্গে। ১৮৮০-র শেষদিকে রেলপথ কার্শিয়াং-এ পৌঁছয় এবং ১৮৮১ সালে জুলাই থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আজ পর্যন্ত এই ট্রেনটি পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠছে তিনটি লুপ, ব্রিজ, ছয়টি রিভার্স(২) পেরিয়ে সর্বোচ্চ স্টেশন ঘুমে পৌঁছচ্ছে (৭,৪০১ ফুট)। এই ট্রেনটি বিখ্যাত শম্বুকপথ 'বাতাসিয়া লুপ' পার হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পথটি এক মনোমুগ্ধকর পাহাড়-বনের মধ্যে দিয়ে।



লরেটো কনভেন্ট, দার্জিলিং

ছবি- সুপ্রীনা ব্রোন

এই টয় ট্রেন—এই গুম্ফা—এই মহারানী স্কুল—এই লেবং রেসকোর্স—এই গির্জা—এই সব মিলিয়েই দার্জিলিং। স্বপ্ন আর ইতিহাসের দেশ—টাইগার হিলে প্রথম সূর্যরশ্মির হিমালয়ের গভীর প্রশান্তির বার্তাবহ দার্জিলিং।

কালিম্পং

'কালিম' শব্দটির অর্থ রাজার মন্ত্রী এবং 'পং'—শব্দটির অর্থ শক্ত ঘাঁটি। অতএব, কালিম্পং কথাটির অর্থ হল রাজার মন্ত্রীর শক্ত ঘাঁটি। এ ছাড়া 'কালিবং' নামের একটি আঁশযুক্ত গাছ, যা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা থেকেও এ অঞ্চলের নাম কালিম্পং হয়ে থাকতে পারে।

কালিম্পং মানেই রাজ্যের শেষ সীমানা, আর সেই সীমানা ঘিরে আছে নেপাল, ভূটান, সিকিম আর তিব্বত। এখানকার জনজীবন তাই গড়ে উঠেছে বিচিত্র অর্থনৈতিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুট উচ্চতার এই শহর আবহাওয়ার দিক থেকে বেশ আরামদায়ক। শীত-গ্রীষ্মে এর তাপমাত্রা ৫° সেন্টিগ্রেড থেকে ২৭° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে চলাফেরা করে।

ইতিহাসের পাতায় খুঁজলে দেখা যায়, এই কালিম্পং সাব-ডিভিশনের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে ছিল গভীর অরণ্য, ফলে জনবসতি ছিল প্রায় বিরল। এই এলাকার আদি বাসিন্দা ছিল লেপচারা, যারা নিজেদের পরিচয় দিত 'রঙ' নামে এক যোদ্ধা জাতি হিসেবে। ১৭০৬ সাল নাগাদ তিস্তার পূর্বদিকের এই জনবসতিতে ভূটানি জীবনধারা ও ধর্মের গভীর প্রভাব এসে পড়ে। ডামাং ও ডালিংকোটার ভুটানি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ১৮৬৫ সালের ভুটান যুদ্ধ পর্যন্ত' যে সামরিক দক্ষতা তারই পরিচয় বহন করছে। ১৮৭০ সালে কালিম্পং ব্রিটিশের অধীনে আসে এবং তার সঙ্গে আসতে শুরু করেন খ্রিস্টধর্মপ্রচারক মিশনারিরা। কালিম্পঙের উন্নয়নে এদের ভূমিকা অনেকখানি। এই শতাব্দীর শেষদিকে, কালিম্পং ছিল ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের একমাত্র পথ। পর্যটনের মানচিত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগবিন্দু। এখান থেকেই অনায়াসে যাওয়া যায় নেপাল, ভুটান, সিকিম।

দার্জিলিং

উচ্চতা

৭১০০ ফুট, তাপমাত্রা—শীতে ১°—১১°

গ্রীষ্মে ৮.৫°—১৮.৫°

শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব

৮০ কিমি বাসে ৩৫ ঘণ্টা, ট্রেনে ৭৫ ঘণ্টা

ভাড়া

ট্রেন—৬০ টাকা

বাস—৩৪ টাকা ল্যান্ড রোভার / ট্যাক্সি—৮০-১২৫ টাকা, ৮৫-১৫০ টাকা (জনপ্রতি)

দর্শনীয় স্থান

টাইগার হিল, ঘুম, বৌদ্ধ গুম্ফা, ম্যাল, অবজারভেটরি হিল, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম তিব্বতীয় রিফিউজি সেন্টার, তেনজিং নোরগে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল গার্ডেন, বটানিক্যাল গার্ডেন, লেবং রেস. কোর্স।

থাকবার জায়গা

সরকারি ট্যুরিস্ট লজ, দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের ট্যুরিস্ট লজ ছাড়াও আছে নানা সরকারি-বেসরকারি হোটেল-লজ হলিডে হোম, গেস্ট হাউস।

কালিম্পং

উচ্চতা—তাপমাত্রা

গ্রীষ্মে—৩০° সে. শীতে—৭° সে।

দূরত্ব

দার্জিলিং ৫১ কিমি--২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি—৬৯ কিমি ২৫ ঘণ্টা

ভাড়া

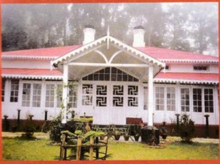
শিলিগুড়ি বাস—৪০ টাকা

ল্যান্ড রোভার / ট্যাক্সি—১০০-১২৫ টাকা

১২৫—১৫০ টাকা (জনপ্রতি)

দর্শনীয় স্থান

দুরপিন দারা, গৌরীপুর ভবন, ড. গ্রাহামস হোম, ভুটানিজ পেডং মনাস্ট্রি, কালিম্পং আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌টস সেন্টার, ধর্মোদয় বিহার, দেলো পাহাড় ও অর্কিড নার্সারি।



মংপুতে রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতেই থাকতেন — ছবি- ঋজু মজুমদার

রওনা হয়েছিলাম সকাল সাতটায়। সাত পাহাড় চার নদী পেরিয়ে যখন কালিম্পঙে এসে পৌঁছলাম তখন বিকেল পাঁচটা। টাইগার হিল দেখা হয়নি আফশোস ছিল, গতকাল বিকেল থেকে তুমুল বৃষ্টি রাস্তা বন্ধ। মনোবেদনা বোধহয় হিমশীতল হৃদয়েও আলোড়ন তুলল—ট্যুরিস্ট লজের পর্দা সরাতেই তুষারশুভ্র হিমালয়। কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়েই তিনি আবার মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকলেন। দার্জিলিং থেকে সুখিয়াপোখরি সারা পথই পাকদণ্ডী ঘিরে কুয়াশার আঁধার। সুখিয়াপোখরিতে একটি ছোট ন্যাচারাল পার্ক গড়ে উঠেছে। বনপর্বতে ঘেরা জায়গাটি অসাধারণ। পরিকাঠামো গড়ে তুললে একটি নতুন আরণ্যক ট্যুরিস্ট স্পটের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। সুখিয়াপোখরি থেকে নেমে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মিরিক। অনেকদিন ধরেই টুরিস্টের আকর্ষণের বস্তু পাহাড় ঘেরা লেক ও তার চারপাশে গড়ে ওঠা পর্যটনকেন্দ্র। ঘোড়ার পিঠে লেকের চারপাশে ঘুরে বেড়ান অথবা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ান লেকের পাশে একটু গল্প করতে করতেই স্বাদ নিয়ে দেখুন গরম গরম মোমো অথবা আলু টিকিয়ার বেশ চেনা চেনা লাগবে পরিবেশটা বড়, ট্যুরিস্ট ট্যাক্সির নিয়মিত যাতায়াত আছে এই পথে। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত সরকারি-বেসরকারি দুরকমই। দিনে দিনে বেড়িয়ে আসা যেতে পারে অথবা বিশ্রামে থাকা যেতে পারে দু-একটা দিন।

মিরিক থেকে শিলিগুড়ি, সেখানে দু-একটা জরুরি খোঁজ নিয়ে রওনা হলাম কালিম্পঙের পথে। আশ্চর্য, গোটা পথের কোথাও মেঘ-বৃষ্টি নেই। পথের সৌন্দর্যের তুলনা মেলা ভার। পথ চলেছে এ-পাহাড় ও-পাহাড় পেরিয়ে মাঝে কোথাও খরস্রোতা নদী, কোথাও ঝিলমিল ঝর্না। সবুজ গহন বনানী আর তার আড়ালে রোদ্দুরের ঝিলিক। কবির কল্পনা ছাড়া কোথাও এর তুলনা নেই।

এমনি করেই স্বপ্নের দেশ পৌঁছলাম দেবগৃহে। বাঙালির দেবতা রবীন্দ্রনাথ। মংপুতে সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের খবর অনেকেই জানেন, কিন্তু রবীন্দ্রস্মৃতিভবনের খবর অনেকেরই অজানা। ট্যুরিস্ট স্পটে তেমন করে এর জায়গা মেলেনি। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে। কবির ভাষায় যে আতিথ্যে 'মাত্র পনেরো আনা সম্বল' করে এসে পড়া যায়, কিন্তু যাওয়াটা কিছুতেই স্বেচ্ছায় হয়ে ওঠে না। অসাধারণ সংগ্রহ—আন্তরিক আয়োজন। আরক্ষক যুবকটি সাগ্রহে ডেকে নিয়ে যান অন্দরে। বাগানে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি—ভিতরে অফুরান রবীন্দ্রনাথ। গভীর ভালোলাগা নিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী জেনে আরক্ষক যুবকটি আবেদন জানালেন, আমাকে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি পাঠিয়ে দিতে পারেন ? তাহলে আর একটু ভাল করে জানাতে- বোঝাতে পারি। এই 'নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একাকী' সেখানে একটু সুগম যাতায়াতের ব্যবস্থা, প্রয়োজনে একটু থাকার ব্যবস্থা করে মানুষকে নিয়ে যাওয়া যায় না কি ?

মংপু থেকে কালিম্পং পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। মেঘপাহাড় স্পর্শ করতে করতেই পৌঁছে গেলাম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের



ছবি- লক্ষ্মীমণি ভট্টাচার্য

বাংলো মরগ্যান হাউসে। কাঠের মেঝে—কাঁচের জানালা বাগান-বারান্দা-লনে ছড়িয়ে থাকা পুরনো সাহেবের বাংলো। নিজেদের কথা ছাড়া এই নির্জনতায় আর কিছুই শোনা যায় না। আকাশ যখন হাতের সীমানায় আর ফুলেও যখন আকাশ-নীল—তখন আর কিইবা চাইবার থাকতে পারে ? দেলো পাহাড়ে সূর্যোদয় এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হবে এটাই পৃথিবীর শেষ সীমানা। দূরে ওই জনপদ, নদী একটু একটু করে আলোয় জেগে উঠছে। পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। আকাশের এত কাছাকাছি, লোকালয় থেকে এতদূরে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকটাই বড় মনে হয়। মুছে যায় জীবনের ক্ষুদ্রতার গ্লানি কিছুক্ষণের জন্য।

শহরের একেবারে অন্যদিকে দুরপিন দারা মনাস্ট্রি। তিব্বতি লামারা এখানেও ঈশ্বরকে খুঁজছেন নিজেদের মতো করে। শুনেছি এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত নদী, বন, এমনকি পাশের রাজ্যের শহরও দেখা যায়। মেঘের প্রতিবেশী আমরা। তাই ভিউ পয়েন্ট থেকে দুটো নদীর মিলে-মিশে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। দেখে এলাম ডঃ গ্রাহাম্‌স হোম। অনাথ শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় আজও জীবনের প্রতি তাঁর ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করছে।

অর্কিডের শহর কালিম্পং। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় অর্কিডের ফার্ম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রজাতির অর্কিডের সংগ্রহ আছে এখানে। এমন অর্কিডও আছে এখানে যার মাদার প্ল্যান্টের দাম লক্ষাধিক টাকা।

কালিম্পংয়ের রুটিন দ্রষ্টব্য বস্তুও আছে বেশ কিছু। ১৮৭০ সালে দার্জিলিং জেলায় শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে আসেন স্কট রেভারেন্ড ডব্লিউ ম্যাকফারলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ সালের মধ্যেই ওই জেলায় ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৮৭ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে হঠাৎই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁরই স্মৃতিতে গড়ে ওঠে ম্যাকফারলেন মেমোরিয়াল চার্চ।

ক্যাথারিন গ্রাহামের প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৭ খ্রিঃ) কালিম্পং আর্ট ও ক্রাফ্‌ট সেন্টারটি কালিম্পংয়ের স্থানীয় শিল্পীদের কার্পেট, ব্যাগ, চিত্রশিল্প ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। ডঃ গ্রাহাম্‌স হোমের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এটি আজও একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দুরপিন দারার পথে আছে বনদপ্তর পরিচালিত ইকো-ট্যুরিজম্‌ সেন্টার ও প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র। এখানে ঝর্না, অরণ্যানী ও বন্যপ্রাণীর নমুনা ও ফটোর দুর্লভ সংগ্রহ আছে।

রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত গৌরীপুর হাউস কালিম্পংয়ের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ এখানে অবকাশযাপনে এসে বহু কবিতা রচনা করেছেন। ১৯৪০-এর ২৫ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ এখান থেকেই 'জন্মদিন' কবিতাটি টেলিফোন যোগাযোগের মাধ্যমে আবৃত্তি করেন ও তা আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত হয়।

বিখ্যাত শিল্পী ও মনীষী রডরিক ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন কালিম্পংয়েরই মানুষ। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছানুসারে তাঁরা একটি শ্বেতশান্তিস্তূপ দুরপিন পয়েন্টে নির্মাণ করে তাঁর স্মৃতিরক্ষা করেছেন।

ত্রিপাই পাহাড়ে অবস্থিত থোরপা চোলিং মনাস্ট্রি হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল। এটি ১৯২২ সালে তৈরি। বর্তমান দালাই লামা এই সম্প্রদায়েরই উপাসক।

দুরপিন হিলের শিরোমণি জ্যাং ডু পালরি ফো ব্রং মনাস্ট্রি। দালাই লামা এই মনাস্ট্রিকে দুর্লভ তিব্বতি পুঁথি 'কাঞ্জুর' (১০৮ খণ্ড) উপহার দিয়েছেন। এখান থেকে হিমালয়ের সম্পূর্ণ রেঞ্জ, শহর আর নিবিড় শ্যামলিমা দেখা যায়। ভুটানি ঐতিহ্যের থাংসা মনাস্ট্রি কালিম্পংয়ের সবচেয়ে প্রাচীন মনাস্ট্রি, তৈরি হয়েছিল ১৬৯২ সালে।

নেপালি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল নেপালি বৌদ্ধ মন্দির আছে ঋষি রোডে। ১৯৫২ সাল থেকে এটি কালিম্পং ধর্মোদয় সভার পরিচালনায় চলছে। এর ভিতরে যে বুদ্ধমূর্তিটি আছে বার্মার বৌদ্ধদের উপহার।

শহর থেকে এক কিলোমিটার দূরে লেপচা মিউজিয়ামে লেপচা জীবনপ্রণালী, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্যের এক উজ্জ্বল সংগ্রহ আছে।

কালিম্পং থেকে ৩৫ কিমি দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭২০০ ফুট উঁচুতে লাভা। অনন্যসুন্দর প্রকৃতির বনমায়ায় ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। এখান থেকে সমগ্র হিমালয় এবং জালাপ-লা ও রেচালা গিরিবর্ত্ম দেখা যায়। বন দপ্তর এখানে প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। বন দপ্তর ও বন উন্নয়ন নিগমের থাকার জায়গা আছে। এখন কিছু ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

কালিম্পং থেকে ৫৬ কিমি দূরে ৫৫০০ ফুট উচ্চতায় লোলেগাঁও বা কাফের শান্তির দেশ। আদিম প্রকৃতিকে একেবারে সরাসরি অনুভব করা যায় এখানে। এখানকার ঝান্ডিদাড়ায় এক অসাধারণ সূর্যোদয় দেখা যায়।

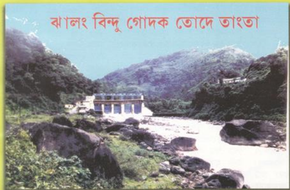
কালিম্পং থেকে লাভার পথে ২২ কিমি দূরে ৬৪১০ ফুট উচ্চতায় রিসিয়ামও এরকমই একটি ছোট গ্রাম। ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে এখনও অখ্যাত। তাই নির্জন প্রকৃতিকে এখানে অবাধে উপভোগ করা যায়।

এই প্রকৃতি—এই মিশ্র জনসংস্কৃতি—এইসব নিয়েই কালিম্পং। নির্জনতা আর ফুলের সাজ তার আন্তরিক বৈশিষ্ট্য। সব ঋতুতেই এর আবহাওয়া অতি মনোরম। তাই আপনার অবকাশের দু-একটা দিন কালিম্পঙের নীল নির্জনের জন্য রেখে দিলে ক্ষতি কি ?

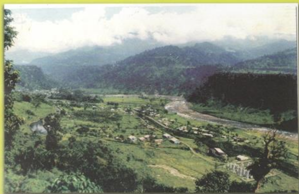
ভেবেছিলাম, পথ চলা শেষ হয়েছে। ফিরছিলাম কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ির পথে। ক্লান্তি ছিল, মনও ছিল ঘরে ফেরার দিকে। তাই ভাবছিলাম, নতুন করে আর কিই বা দেখব ? যেদিন রওনা হয়েছিলাম, সেদিন সদ্য মেঘ ভেঙে সূর্য উঠেছে। আর আজ চারপাশে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। মাথার উপর ঝকঝকে নীল আকাশ। বাঁক ঘুরতেই দুরন্ত তিস্তা—সবুজ পাহাড় ঘিরে তার উদ্দাম পথচলা। সমতলে ফেরার আগেই পাহাড় তার পায়ের বেড় জুড়ে পরে নিয়েছে তিস্তার রুপোর খাড়ু। দুকূলপ্লাবী সেই নদী অজস্র কলকণ্ঠে ভরিয়ে তুলছে আকাশ, পৃথিবী। আগের পাহাড়টাকে ঘিরে ছিল নদী, এখন ব্রিজ পেরিয়ে বাঁক পেরোতেই অদৃশ্য, আবার সেবক ব্রিজের কাছে তার উজ্জ্বল উদ্ধার। মানুষ বাঁধতে চেয়েছে, পেরোতে চেয়েছে নদী আর নদী অহংকারী স্রোতে ফুলে-ফেঁপে ঘোষণা করেছে তার বিদ্রোহ—প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বমধুর সৌন্দর্য এখানে না এলে পেতাম কোথায় ? আবার, আবার অনুভব করলাম তিস্তা-রঙ্গিত-হিমালয়ের সফর একদিনে, এক ঋতুতে, একযাত্রায় শেষ হবার নয়। নব নবরূপে তার প্রাণময় অস্তিত্ব ছুঁয়ে যেতে হবে বারংবার, তবেই সার্থক হবে আজকের পথচলা—এ সফরনামা।

অচেনা দার্জিলিংয়ের খোঁজে

কাজল বিশ্বাস



উপরে - বিন্দু ব্যারেজ। নীচে- জলঢাকা প্রকল্পকে ঘিরে গড়ে ওঠা লোকালয়
ছবি- অসিত বিশ্বাস



কালিম্পং মহকুমাতেই ভুটান সীমান্তে আছে এইসব অপরূপ গ্রাম। ঝলং, বিন্দু, গোদক, তোদে, তাংতা—এই অচেনা দার্জিলিং পাহাড়প্রিয় পর্যটকদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

শিলিগুড়ির ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড থেকে সকালে দুটি বাস যায় ঝালং ও বিন্দুর পথে। কালিম্পং ও গরুবাথান থেকেও বাস যায় ঝালং। একমাত্র ঝালংয়েই আছে থাকার ব্যবস্থা। রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের বাংলো, বেসরকারি টুরিস্ট লজ আর জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অতিথি নিবাস।

শিলিগুড়ি থেকে মহানন্দী অভয়ারণ্যের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পথে মংপং, বাগরাকোট, ওদলাবাড়ি, ডামডিম, মালবাজার, চালসা, চাপরামারি ছাড়িয়ে ঝালং পৌঁছবে বাস ঘণ্টা তিনেকে। কখনও অরণ্য নিবিড়, কখনও মায়াময় ছায়াময়, কখনও ঝিমঝিমে স্তব্ধ। পুরো পথ জুড়েই রমণীয় ভ্রমণ।

ঝালংয়ে আছে জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকালয়। জলঢাকার বাঁদিকে ঝালং শহর। ছোট্ট ছিমছাম। প্রকল্প কর্মীদের প্রয়োজনেই ঘরবাড়ি দোকান-বাজার। নদীর ডানদিকে ভুটান পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো ভুটানি গ্রাম।

শহরের প্রবেশ পথে ঝোলুং নদী। ঝোলুং নদীর ব্রিজ পেরোলে বনবিশ্রামাগার। শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টা তিনেকে বাসে পৌঁছানো যায় ঝালংয়ে। সরকারি বেসরকারি নানা বাস আছে ঐ পথে। ভাড়াও সামান্য। প্রকৃতির অসাধারণ নিসর্গ-সৌন্দর্য সঙ্গী হয় এ পথে। উচ্ছল ঝোলুংয়ের অবিরাম বয়ে চলা বড়ই উপভোগ্য।

ঝোলুং ব্রিজ পেরোলেই চেকপোস্ট। অঞ্চলটি ভুটান লাগোয়া বলে ঝালং পার হতে বিদেশি পর্যটকদের অনুমতি নিতে হয়। চেকপোস্ট পেরোলেই ছোট্ট বাজার। বুধবারে হাট বসে। স্থায়ী দোকানে প্রায় সবই মেলে।

বাজার ছাড়িয়ে আরও উত্তরের পথ ধরে ১২ কিমি গেলে বিন্দু। বাস যায়। সময় নেয় ঘণ্টাখানেক। ঝালং আর বিন্দুর মাঝে প্যারেন। এখান থেকে পথ আর চড়াই নয়, ক্রমাগত উৎরাই। ডানদিকে খাড়া দেওয়ালের মতো ভুটান পাহাড়। সামনে হিমালয়।

বিন্দু যেখানে জলঢাকায় মিশেছে সেখানে থেমে গেছে চলার পথ। জলকে বেঁধে রেখে তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। ৩৯ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ভাগ পায় ভুটানও। কারণ, জলঢাকার জলে যে তাদের ভাগ আছে। বিন্দুর ওপারে বকবকি। ভুটানগ্রাম। নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট এই গ্রামগুলোতে যেন অসীম শান্তি বিরাজ করছে। থাকার ব্যবস্থা তেমন নেই। যানবাহনের স্বল্পতা আছে। তাই আবার ফিরে আসতে হয়।

গোদক-তোদে-তাংতা

প্যারেন থেকে উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা চলে গেছে গোদকে। ছোট্ট পার্বত্য গ্রাম। সীমান্তের ওপারে ভুটান। ঝালং থেকে এর দূরত্ব ১৫ কিমি। গোদক থেকে আরও উত্তরে কিমি সাতেক গেলে আর এক গ্রাম। তোদে উপজাতিপ্রধান গ্রাম। এই গ্রাম দুটি পর্যটন মানচিত্রে বিশেষভাবে উঠে আসছে। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলঢাকা আর নিচের ঝালং উপত্যকা প্রকৃতিকে বড় সুন্দর করে তুলেছে। খাড়া চড়াইয়ের জন্য বাস যায় না এ পথে। ঝালং থেকে জিপ নিয়ে আসা যায়।

এই গোদক তোদে-তাংতা—এখনও ট্রেকিংয়ের পথ হিসেবে রমণীয়। তোদে থেকে হাঁটা পথে চলে যাওয়া যায় তাংতা। আরও উত্তরে রোচে-লা-পাস।

এপ্রিল-মেতে এই তোদে তাংতা হয়ে যায় ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স। এই ফুলের রাজ্যে আসা যায় কালিম্পং থেকে রেনক হয়েও। নানা বর্ণের পাহাড়ি ফুলে তোদে-তাংতার পাহাড়ি লাবণ্য যে কত রূপময়ী এখনও পর্যটকদের কাছে তা তেমনভাবে পৌঁছয়নি। রুকস্যাক কাঁধে করে যেকোনও সময় এই তোদে তাংতার পথে বেড়িয়ে পড়া যায়।

রোমাঞ্চ পর্যটন

নেমে পড়ুন তিস্তা-রঙ্গিতের জলে

উদ্দাম জীবনের স্বাদ নিতে নেমে পড়ুন খরস্রোতা পাহাড়ি নদী তিস্তা-রঙ্গিতে দাঁড় বাইতে। দুর্বার গতিতে পাহাড় থেকে নেমে আসছে নদী। নদীর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে র‍্যাফ্‌ট অর্থাৎ হাওয়া ভরা সিন্থেটিক ভেলা। ঢেউয়ের আছাড়ে দোলায় দোলায় দুরন্ত ছন্দে নামে নানা রঙের ভেলা। একেই বলে র‍্যাফটিং।

তিস্তা এবং রঙ্গিত—দুটো নদীতেই র‍্যাফটিং হয়। রঙ্গিতে র‍্যাফটিংয়ে বেশি ঝুঁকি, তাই মজা বেশি। সাঁতার না জানলেও র‍্যাফটিং করা যায়। দু-ধরনের র‍্যাফটিং আছে। যারা সাঁতার জানে তাদের জন্য এবং যারা জানে না তাদেরও জন্য।

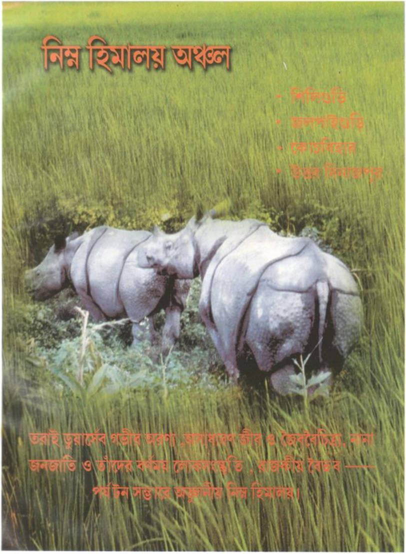
সারাদিন নদীতে ভেসে বিকেলে ক্যাম্পে ফেরা যায়। র‍্যাফটিংয়ের জন্য যোগাযোগ করা যায়—

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল কাউন্টার। আই টি ডি সি, এমব্যাসি বিল্ডিং ৪ সেকশপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭১, ফোন-২৪২-১৪০২।

তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগেও নানান ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনীয় র‍্যাফ্‌ট, লাইফ জ্যাকেট, ওয়াটার প্রুফ জুতো বা স্যান্ডাল, হেলমেট, রোদ চশমা—সবই সরবরাহ করে কর্তৃপক্ষ। যাদের হার্টের সমস্যা আছে, বা ভার্টিগো ধরনের অসুখ থাকলে এ খেলায় না মাতাই ভাল।

সাত-আট জনে মিলে হৈ হৈ করে ভেলায় চড়ে বসা। সঙ্গে থাকে গাইড। এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

নিজস্ব প্রতিবেদক


নিম্ন হিমালয় অঞ্চল
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
উত্তর দিনাজপুর
তরাই ডুয়ার্সের গভীর অরণ্য, অসাধারণ জীব ও জৈববৈচিত্র্য, নানা জনজাতি ও তাঁদের বর্ণময় লোকসংস্কৃতি, রাজকীয় বৈভব — পর্যটন সম্ভারে অতুলনীয় নিম্ন হিমালয়।

জলপাইগুড়ি—রূপের দেশে অসামান্য হাতছানি



গরুমারা অভয়ারণ্য

হিমালয়ের পাদদেশে পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই জেলাটি অসামান্য রূপের ছটায় উজ্জ্বল। পাহাড়-অরণ্য-নদী-নালা-ঝোরা—বৈভব যেন উপচে পড়ছে। বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্য—যেমন উদ্ভিদে, তেমনই প্রাণীর ক্ষেত্রেও। শুধু ফার্নই আড়াইশ প্রজাতির। চারশো প্রজাতির পাখি। বৈচিত্র্যময় অগণ্য অর্কিড পরিবার। পশ্চিমে মহানন্দা আর পুর্বে সঙ্কোশ। সারা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, কালজিনি কত নদী। কত জনগোষ্ঠী। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মেচ, রাভা, টোটো। বৈচিত্র্যে ভরা এদের লোকসংস্কৃতি, জেলার নানা জায়গায় আছে পর্যটন কেন্দ্র।

গরুমারা—জেলা শহর থেকে ৫০ কিমি দূরে। ১৯৪৯ সালে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত হয়। যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার থেকে অনেক বন্যপ্রাণীই দেখা যায়। হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

কোথায় থাকবেন—বনবিভাগের বাংলো। ২টি ৪ শয্যাবিশিষ্ট ঘর। ভাড়া দৈনিক ১৫০ টাকা।

চাপরামারি—জেলা শহর থেকে ৬৫ কিমি দূরে। অসাধারণ প্রকৃতিপথ সঙ্গী করে যেতে হয়।

কোথায় থাকবেন—বনবাংলো। ২টি ৪ শয্যাবিশিষ্ট ঘর। ভাড়া দৈনিক ১৫০ টাকা।

গরুমারা-চাপরামারি বনবাংলো সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ করুন **বিভাগীয় বনাধিকারিক**, *বন্যপ্রাণী শাখা (২) অরণ্যভবন, জলপাইগুড়ি, দূরভাষ—(০৩৫৬১) ২৪৯০৭।*

বিঃ দ্রঃ—প্রতি বৃহস্পতিবার বন্ধ। বর্ষাকালে ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

মূর্তি—মূর্তি নদীর তীরে বনবাংলোয় থাকার অভিজ্ঞতাই আলাদা। ৬টি ঘর আছে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের। কলকাতা থেকে বুকিং হয়। (ভাড়া ইত্যাদির জন্য—পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের আবাস তালিকাটি দেখুন)। শিলিগুড়ির পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম থেকেও বুক করা যায়।

চালসা—জেলা শহর থেকে ৫৭ কিমি। পূর্ত বিভাগের দুটি বাংলো আছে। মাথাপিছু ভাড়া ৯০ টাকা।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন—

নির্বাহী আধিকারিক

নাগরাকাটা নির্মাণ বিভাগ (পূর্ত বিভাগ) মাল, জলপাইগুড়ি

দূরভাষ—(০৩৫৬২) ৫৫১২৯

এখান থেকে মেটেলি ও সামসিং যাওয়া যায়।

মালবাজার—জেলা শহর থেকে ৬৫ কিমি। 'মেঘমল্লার'—পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পর্যটন আবাস আছে। দুই শয্যার ১০টি ঘর আছে। ৪৫০ টাকা ঘরপিছু ভাড়া। বাতানুকূল দুটির ঘরপিছু ভাড়া ৭০০ টাকা।

মালবাজার থেকেই গরুমারা, চাপরামারি ঘোরা যায়। *পর্যটন আবাস বুক করা যায়—*

(১) ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, ৩/২ বি বা দি বাগ, কলকাতা-১। (২) **ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার** *হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, মেঘমল্লার ট্যুরিস্ট লজ, মালবাজার থেকে।*

কাঠামবাড়ি—৫০ কিমি দূরে। বনবিভাগের বাংলো আছে। ঘরপিছু দৈনিক ১০০ টাকায় ২টি ঘর আছে।

ওদলাবাড়ি—৯০ কিমি দূরে। তিস্তা ব্যারেজের কাছে। বনবিভাগের ৪ শয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘরের একটি বাংলো আছে। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে বাসে আসা যায়।

আম্বাড়ি—হলদিবাড়িগামী ট্রেনে আম্বাড়ি ফালাকাটা স্টেশন থেকে আসা যায়। ঘরপিছু ৫০ টাকা ভাড়ায় ২ ঘরের বনবাংলো আছে।

বোদাগঞ্জ—২৫ কিমি দূরে শিকারপুরে ২ ঘরের বনবাংলো। মাথাপিছু ভাড়া ৫০ টাকা।

চারটি বনবাংলো সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ—**বিভাগীয় বনাধিকারিক,** *বৈকুণ্ঠপুর বিভাগ, হসপিটাল মোড়, শিলিগুড়ি। দূরভাষ*—(০৩৫৩) ৪৩৬৪৩৬।

খুট্টিমারি—৭০ কিলোমিটার দূরে। গয়েরকাটা জঙ্গলের ভিতর ২ ঘরের বনবাংলো। ঘরপিছু ভাড়া ১০০ টাকা।

সংরক্ষণের' জন্য যোগাযোগ—**বিভাগীয় বনাধিকারিক,** *জলপাইগুড়ি বিভাগ, অরণ্যভবন, জলপাইগুড়ি। দূরভাষ*—(০৩৫৬১) ৩২০১৬।

মাদারিহাট—জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের প্রবেশ পথে মাদারিহাট। এখানে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ। দ্বিশয্যার ১০টি ঘর আছে। ঘরপিছু ভাড়া ৭৫০ টাকা। ১৩ শয্যার ডরমিটরি মাথাপিছু ৮০ টাকা ভাড়া। দুই শয্যার দুটি কটেজ। প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা।

তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের একটি বাংলো আছে। ৪টি ব্লক আছে। যোগাযোগ—**ডিভিশনাল ম্যানেজার,** শ' মিলিং ডিভিশন, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি, দূরভাষ (০৩৫৬১) ৩০৯৪৫।

ব্লক	মোট ঘর	শয্যা	দৈনিক ভাড়া	কাদের জন্য
এ	X	X	X	ভি আই পি
বি	১	২	২০০	সাধারণ
সি	১	৪	২৫০	সাধারণ
ডি	১	৪	২৫০	সাধারণ

হলং—মাদারিহাট থেকে ৭ কিমি দূরে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের গভীর জঙ্গলে হলং বাংলো। হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে ঘোরা যায় এখান থেকে। মাথাপিছু ৭০ টাকা লাগে। মাদারিহাট পর্যটন আবাসে জানালে ওরাও ব্যবস্থা করে দেয়।

মোট ৬টি দু শয্যার ঘর আছে। ৩টি কলকাতা থেকে এবং ৩টি শিলিগুড়ি থেকে বুকিং করা হয়। ঘর ভাড়া ৫৭৫ টাকা। মাথাপিছু রাতের খাবার এবং সকালের জলখাবারের জন্য ১১০ টাকা।

মাদারিহাট ও হলং-এ ঘর সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ—

(১) **ট্যুরিস্ট পয়েন্ট,**
৩/২ বি বা দী বাগ, কলকাতা-১,
দূরভাষ—(০৩৩) ২৪৮-৮২৭১,
২৪৮-৮২৭৩

(২) **ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার,**
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি,
দূরভাষ—(০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪,
৫১১-৯৭৯

(৩) **জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ,**
মাদারিহাট,
দূরভাষ—(৩৫৬৩) ৬২২৩০।

টোটোপাড়া—মাদারিহাট থেকে ২২ কিমি দূরে। পৃথিবীর অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী টোটোরা পাহাড়ের কোলে এখানে থাকেন থাকার ব্যবস্থা—অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের একটি থাকার জায়গা আছে। [দূরভাষ—(০৩৫৬১) ৩০৯১৭]। শিলিগুড়ি থেকেও টোটোপাড়ায় যাওয়া যায়।

বড়ডাবরি—হাসিমারার কাছে বড়ডাবরির ১৪ শয্যার যুব আবাসে মাথাপিছু ১০ টাকা ভাড়ায় থাকা যায়। বড়ডাবরির অতিথি নিবাসটি আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে। ২টি দু শয্যার ঘর আছে। ঘরপিছু দৈনিক ভাড়া ১৫০ টাকা।

শিলিগুড়ি ট্যুরিস্ট ব্যুরো,
পঃ বঃ সরকার, হিলকার্ট রোড,
দূরভাষ—(০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪,
৫১১-৯৭৯।

নিলপাড়া—আলিপুরদুয়ার থেকে ২৭ কিমি দূরে দু ঘরের দু শয্যাবিশিষ্ট অতিথি নিবাস। ঘর ভাড়া ১৫০ টাকা।

চিলাপাতা—কাছেই নল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ২ ঘরের অতিথি নিবাস আছে। ভাড়া ১৫০ টাকা।

কোদালবস্তি—চিলাপাতা অরণ্যের মাঝে কোদালবস্তি। আলিপুরদুয়ার থেকে ২২ কিমি দূরে। ১০০ টাকা ভাড়ায় একটি ঘর আছে।

উপরোক্ত তিনটি স্থানের বনবাংলো সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ—

বিভাগীয় বনাধিকারিক,
কোচবিহার, বন বিভাগ,
কোচবিহার, ৭৩৬১০১,
দূরভাষ —(০৩৫৮২) ২২৪৮৫, ২২৯১৯।
হাসিমারা থেকে যাওয়া যায়।

নতুন পর্যটন কেন্দ্র

কুঞ্জনগর—জেলা শহর থেকে ৭০ কিমি দূরে ফালাকাটার কাছে। চড়ুইভাতির জন্য জনপ্রিয় হচ্ছে। আছে একটি মৃগদাব।

ভুটানঘাট—রায়ডাক নদীর পাড়েই ভুটানঘাটের বনবাংলো। দু শয্যার তিনটি ঘর। ১৫০ টাকা ঘরপিছু ভাড়া।

জয়ন্তী—আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৩০ কিমি দূরে। পাহাড়-জঙ্গলের মাঝে এক ছোট্ট গ্রাম। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের একটি বাংলো আছে। দু শয্যার ৩টি এবং ৬ শয্যার একটি ডরমেটরি। মাথাপিছু ভাড়া ৫০ টাকা।

সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ—
নির্বাহী আধিকারিক,
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর,
ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি।
দূরভাষ—(০৩৫৬১) ৩০৬৫৯।

জয়ন্তী মহাকাল—জয়ন্তী থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে ৫ কিমি গেলে মহাকাল। পাশেই অন্ধকার গুহা। মোমবাতি জ্বালিয়ে দেখতে হয় চুন আর জলের কারসাজিতে তৈরি হওয়া অসাধারণ দৃশ্যপট। উপর থেকে যেগুলো ঝুলছে তাদের নাম স্ট্যালাকটাইট। যেগুলি উঁচু হয়ে উঠছে তাদের বলে স্ট্যালাকমাইট। পাহাড়ের চূড়ায় মহাকাল মন্দির।

বক্সা—জয়ন্তী থেকে লেপচাখা হয়ে বক্সা পাহাড়। সান্দ্রাবাড়ি থেকে হাঁটাপথেও যাওয়া যায়। এখান থেকে অনেকগুলি ট্রেকিং রুট আছে। সিঞ্চুলা পর্বতমালায় এটি অবস্থিত। মধ্য ও পশ্চিম ভুটান এবং তিব্বতের সঙ্গে বাংলার অন্যতম বাণিজ্যপথ এটি। চুনাভাটি, ডাসিগাঁও, রূপং, লেপচাখা, ওসেলুম, তাসিডিংকা, কাতলুং নদী এবং এই জেলার সর্বোচ্চ পাহাড় তপর্গা (৫,৬০০ ফুট)। এখানে আছে বক্সা বন্দীশিবির। সান্তলাবাড়ি থেকে ৫ কিমি পাহাড়িপথ হেঁটে বক্সাদুয়ারে যাওয়া যায়। ২৬০০ ফুট উঁচুতে স্থানীয় ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির পরিচালনায় ১৬ শয্যার ডরমেটরি আছে। মাথাপিছু ৬০ টাকা ভাড়া। বন বিভাগের ১০ শয্যাবিশিষ্ট এক-একটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ২টি ঘর আছে।

৭৬০.৮৭ বর্গ কিমি জুড়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প। এর মধ্যে ২৬৯ বর্গ কিমি অভয়ারণ্য এবং ১১৭.০১ বর্গ কিমি জাতীয় উদ্যান। প্রায় ৩৪টি চা-বাগান এই অঞ্চলকে অসামান্যভাবে সবুজ করে রেখেছে।

আলিপুরদুয়ার থেকে বারবিশা, কুমারগ্রাম, কালিখোলা, রাজাভাতখাওয়া, রায়মাটাং, নিমাতি বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। প্রতিটি স্থানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ্য।

কিভাবে যাবেন ও কোথায় থাকবেন

বারবিশা—আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে। দু শয্যার ২ ঘরের বনবাংলো। দৈনিক ভাড়া ১৫০ টাকা।

কুমারগ্রাম—অসম-ভুটান সীমান্তে, সঙ্কোশ নদীর ধারে। আলিপুরদুয়ার থেকে ৬৫ কিমি, বাস যায়। ২ শয্যার একটি বনবাংলো।

যোগাযোগ—
ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর,
বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ইস্ট)
আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
দূরভাষ—(০৩৫৬৪) ৫৬০০৫।

রাজাভাতখাওয়া—আলিপুরদুয়ার-বক্সাদুয়ারের মাঝপথে। বনবাংলো আছে ২টি। লিও হাউস ও টাইগার লজ। লিও হাউসে ২ শয্যাবিশিষ্ট ৩টি ঘর। প্রতিটি ঘর ১৫০ টাকা। টাইগার লজে ২ শয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ১৫০ টাকা।

রায়মাটাং—কালচিনি পর্যন্ত গাড়ি বা বাসে এসে আবার গাড়ি করে রায়মাটাং বনবাংলো। ২ শয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ১৫০ টাকা। আলিপুরদুয়ার থেকে ৪৫ কিমি দূরে।

নিমাতি—আলিপুরদুয়ার থেকে ১৭ কিমি। ২ শয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ১৫০ টাকা।

বনবাংলোর জন্য যোগাযোগ
ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর
বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট)
আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
দূরভাষ—(০৩৫৬৪) ৫৫১২৯।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম কর্তৃক ডুয়ার্সে প্যাকেজ ভ্রমণ

- সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করা হয়।
- প্রতি শনিবার দুপুর ১২টায় শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে থেকে বাস ছাড়ে।
- মালবাজার হয়ে জলদাপাড়া—গরুমারা অভয়ারণ্য, রাতে হলং-এ পর্যটন আবাসে থাকা, পরদিন সকালে জল্পেশ মন্দির, বিকেলে শিলিগুড়ি।
- দুদিনের প্যাকেজ ট্যুর।
- মাথাপিছু ১১০০ টাকা।
- হাতির পিঠে চড়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ।
- ১২ জনের ব্যবস্থা করা হয়। ৬টি কলকাতা ও ৬টি শিলিগুড়ি থেকে বুকিং।

রোমাঞ্চকর ট্রেন ভ্রমণ

শিলিগুড়ি থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে চড়ে পাহাড়-জঙ্গল-নদীর পাশ দিয়ে প্রায় সমগ্র ডুয়ার্স ছুঁয়ে রাজাভাতখাওয়া হয়ে আলিপুরদুয়ারে ৪ ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়।

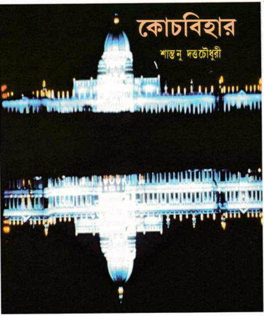
ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ছাড়ে

- আলিপুরদুয়ার থেকে ভোর সাড়ে ৫টায়।
- শিলিগুড়ি থেকে বিকেল ৪টায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

কোচবিহার

শান্তনু দত্তচৌধুরী



ছবি : পঃ বঃ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের জেলা কোচবিহার। কলকাতা থেকে ট্রেনে ও দূরপাল্লার বাসে যাওয়া যায় জেলার সদর কোচবিহার শহরে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম নদী তোর্সার তীরে অবস্থিত এই সাজানো শহরটি পর্যটকদের কাছে ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে।

স্বাধীনতার আগে কোচবিহার ছিল একটি দেশীয় করদ মিত্ররাজ্য। স্বাধীনতার পর কোচবিহার ভারতে সংযুক্ত হয় ও পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলারূপে ঘোষিত হয়। তন্ত্রগ্রন্থে কোচবিহারের নাম কোচবধুপুর রূপে উল্লিখিত আছে। কথিত আছে এই অঞ্চল শিবের অতি প্রিয় বিহারক্ষেত্র ছিল বলে এর নাম কোচবিহার হয়েছে। আর একটি কিংবদন্তী—পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়দের একাংশ এখানে দেবী ভগবতীর ক্রোড়ে বা কোচে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে এই অঞ্চলের নাম কোচবিহার। তবে মনে হয় কোচ জন গোষ্ঠীর মানুষদের বসতি বলেই এ-অঞ্চলের নাম হয়েছিল কোচবিহার।

উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি বড় নদ-নদী কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এগুলি হল—তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা (এ জেলায় নাম কোথাও মানসাই, কোথাও ধরলা, আবার কোথাও বা সিঙ্গিমারী), কালজানি, গদাধর ও রায়ডাক। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য ছোট স্রোতোধারা। চিরসবুজ কোচবিহারে শরতে নদীর চরে কাশফুলের সমারোহ আর শীতে পরিযায়ী পাখিদের মেলা।

কোচ রাজা বিশ্বসিংহ ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বসিংহের মধ্যম পুত্র নরনারায়ণের সময়ে কোচবিহার রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর ছোটভাই শুক্লধ্বজ ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি। চিলের মতন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম ছিল চিলারায়। কোচবিহার শহরের সামরিক বাহিনীর ছাউনিটির নাম তাই তাঁরই নামে নামাঙ্কিত 'চিলা রায় ব্যারাক'। রাজা নরনারায়ণ কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এটি ৫১ পীঠের একটি প্রসিদ্ধ পীঠ। রাজা নরনারায়ণের সময় আসামের প্রখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক শঙ্করদেব কোচবিহারে আসেন। রাজা তাঁকে পরম সমাদরে আশ্রয় দেন। সেই থেকে কোচ রাজারা বৈষ্ণব মতবাদে আকৃষ্ট হন। রাজাদের গৃহদেবতা হন মদনমোহন। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ভুটানের আক্রমণে বিব্রত কোচবিহার রাজ বাধ্য হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৭৩-এর ১৫ এপ্রিলের চুক্তিতে কোচবিহার পরিণত হয় কোম্পানির করদ মিত্ররাজ্যে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিশোর রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা কেশবচন্দ্র সেনের বড় মেয়ে সুনীতি দেবীর বিবাহ হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। কেননা তখন সুনীতি দেবীর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর এবং পাত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের ১৭ বছর। ব্রাহ্মসমাজ বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিল। অবশেষে এই বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। সুনীতি দেবী রাজবধূ হয়ে এসে কোচবিহারে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কোচবিহার শহরে সুনীতি দেবী গার্লস অ্যাকাডেমি, জেনকিন্স স্কুল, ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রভৃতি সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কিছুদিন অধ্যক্ষ ছিলেন, বর্তমানে কলেজটির নাম তাই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ইমারত রাজআমলের স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। সুন্দর সাজানো শহর কোচবিহার। এখন হয়ত জনসংখ্যার চাপে কিছুটা অবিন্যস্ত। কোচবিহার শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য কোচবিহার রাজপ্রাসাদ। এই সুরম্য প্রাসাদটির স্থপতি ছিলেন এফ ব্র্যাকলে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার। ১৮৮৫ সালে

নির্মিত প্রাসাদটির আয়তন ৫১,৩০৯ বর্গফুট। প্রাসাদটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৯৩ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৯৬ ফুট ২ ইঞ্চি বিস্তৃত। প্রাসাদটির মূল প্রবেশ তোরণ পূর্বদিকে। সামনের ঝিলে প্রাসাদের জলছবি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাসাদের একতলাটি মাটি থেকে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু। একতলায় অবস্থিত দরবার কক্ষটির আয়তন ৭২ ফুট × ৬৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। দরবার কক্ষটির গম্বুজাকৃতি ছাদটির উচ্চতা ১২৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। ১৯৭৩ সালে শেষ খেতাবপ্রাপ্ত রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রাসাদটি অবহেলিত হতে থাকে। এই রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রহরার অভাবে কার্যত এই সুন্দর প্রাসাদটি দুর্বৃত্তদের আক্রমণ ও লুঠতরাজের শিকার হয়। অবশেষে প্রাক্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসানের হস্তক্ষেপে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রাসাদটির সংস্কার কাজে হাত দেয়। প্রাসাদটি এখন প্রতি শনি ও রবিবার আলোকমালায় আলোকিত করা হয়। প্রাসাদটির প্রদর্শনীকক্ষটি অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

সাগরদীঘি

রাজপ্রাসাদের দক্ষিণদিকে অবস্থিত শহরের সবচাইতে বড় জলাশয় সাগরদীঘি। দীঘির চারপাশে প্রশাসনিক ভবনগুলি এখনও রাজ আমলের সাক্ষ্য বহন করছে। উত্তরদিকে রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের মর্মরমূর্তি ও পশ্চিমদিকে একটি চালা আকৃতির শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি ১৮০৭ সালে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন। দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগার। সাগরদীঘির জলে শীতে পরিযায়ী পাখিরা দল বেঁধে আসে। শহরের মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় সচেতন। সাগরদীঘির ধারে কিছু সময় কাটানো যে কোনও পর্যটকের কাছে সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

দীঘির শহর কোচবিহার। শহরে আছে অনেকগুলি দীঘি যথা—লালদীঘি, মড়াপোড়া দীঘি, বৈরাগী দীঘি প্রভৃতি। শহরে শিশু, কদম, নাগকেশর, আম, কাঁঠাল গাছের সমারোহ। সুন্দর, সরলরেখার সড়ক এই শহরকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। লালদীঘির পাড়ে রয়েছে ভিক্টোরিয়া জুবিলি টাওয়ার, ১৮৮৭ সালে নির্মিত টাওয়ারটির উচ্চতা ৭০ ফুট।

সাগরদীঘির পশ্চিমদিকের রাস্তার কাছেই অবস্থিত দেবীবাড়ি। কোচবিহার রাজপরিবারের দুর্গামণ্ডপ। দুর্গোৎসবটি এখনও আয়োজিত হয়। এখানে দেবী দুর্গা তাঁর পাশে দুই সখী জয়া-বিজয়াকে নিয়ে অসুর নিধন করছেন। ছেলেমেয়েরা অনুপস্থিত। প্রতিমার মুখমণ্ডলে তিব্বতীয় (ভুটান) মুখোশ বা মুখমণ্ডলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দেবীবাড়ির কাছেই রানীবাগান, কোচবিহার রাজ পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক স্মৃতি মন্দির রয়েছে এখানে। সাগরদিঘির পূর্বদিকে সুনীতিদেবী রোডের পাশে অবস্থিত ব্রাহ্মমন্দির। অযত্নে অবহেলায় মন্দিরটি ভগ্নপ্রায়।

কোচবিহার শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য মদনমোহন মন্দির বৈরাগী দীঘির পারে অবস্থিত। ১৮৮৯ সালে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মন্দিরটি স্থাপন করেন। গৃহদেবতা মদনমোহনের এই মন্দিরটি কোচবিহারবাসীর এক মিলনস্থল। কয়েক বছর আগে মদনমোহন বিগ্রহটি চুরি যাওয়ায় জনমানসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে ও প্রতি সন্ধ্যায় আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। পূজা দিতে ও সন্ধ্যারতি দেখতে প্রত্যহ অনেক মানুষ এই মন্দিরে আসেন। কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমায় প্রতি বছর মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাসমেলা বসে। এটি জেলার ও উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম মেলা।

কোচবিহার শহর থেকে ৭ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মধুপুর ধাম, ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেবের সমাধি মন্দির। অসম-এর বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থ। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ভাগবত পাঠ করা হয়।

মধুপুরের কাছেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। কাছেই আছে হরিহর শিবের মন্দির। কোচবিহার আলিপুরদুয়ার সড়কে বাণেশ্বরে রয়েছে বাণেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রাণনারায়ণ। কিংবদন্তি, পুরাণের বাণাসুর-এর তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। ভক্তের নামে তার নাম বাণেশ্বর। শিবরাত্রিতে বড় মেলা বসে। সংলগ্ন দীঘিতে রয়েছে প্রচুর কচ্ছপ। প্রচলিত ধারণা এরা মোহন নামক কচ্ছপের বংশধর। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার মিটার গেজ রেলপথে বাণেশ্বরে একটি রেল স্টেশনও আছে।

কোচবিহার থেকে অসমমুখী সড়কে মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ। তুফানগঞ্জে রয়েছে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। অনুমান এটি চিলারায়ের গড় ছিল।

কোচবিহার জেলার মহকুমা শহরগুলি হল যথাক্রমে তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহার (সদর)। প্রতিটি শহরেই রাজপরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি করে মদনমোহন মন্দির আছে।

মহকুমা শহর মাথাভাঙ্গায় প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর দিন থেকে ৮ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় সারস্বত উৎসব। উৎসবে কোচবিহারের লোকগীতি ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারে দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলার অনেক মানুষ এসে বসতি করেন। এঁদের সূত্রে ভাটিয়ালি গানও কোচবিহার জেলায় এসেছে। মাথাভাঙ্গা সারস্বত উৎসবে ভাটিয়ালি গানের প্রতিযোগিতাও হয়। কয়েকশো প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করে। উৎসাহীরা আসতে পারেন।

কোচবিহার থেকে দিনহাটাগামী সড়কে তোর্সা নদীর সেতু পেরিয়ে ধলুয়াবাড়ি গ্রাম। এখানে অনেক মানুষ শীতলপাটি তৈরি করে জীবিকা অর্জন করেন। অত্যন্ত ভালো মানের শীতলপাটি তৈরি দেখতে ও কিনতে অনেকেই আসেন এখানে। ধলুয়াবাড়িতে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

শহরের দক্ষিণে তোর্সার ধারে রয়েছে তোর্সাপীরের দরগা। অনেকেই আসেন পীরের দরগায় নানা প্রার্থনা নিয়ে।

গোঁসানিমারী

কোচবিহার শহর থেকে চোদ্দ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত গোঁসানিমারী গ্রাম। নিকটবর্তী রেল স্টেশন দিনহাটার (কোচবিহার-গিতালদহ মিটার গেজ লাইনে) দূরত্ব পাঁচ মাইল। দিনহাটা, জেলার একটি মহকুমা শহর। দিনহাটা সড়ক পথে কোচবিহার শহরের সঙ্গেও যুক্ত।

গোসানিমারী গ্রামের দক্ষিণদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সিঙ্গিমারী নদী। গ্রামে কামতেশ্বরী বা গোসানী দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রাচীন। কোচবিহার রাজবংশের রাজা প্রাণনারায়ণের নির্দেশে কবিমণ্ডল ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরগুলির সঙ্গে মিল আছে।

কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

কামতেশ্বরী বা গোসানীদেবী সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচলিত বহু কাহিনী ও কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের 'কোচবিহারের ইতিহাস' থেকে এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। কথিত আছে যে, প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত মহাভারত যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর মন্ত্রপূত কবচ (দেবী ভগবতী প্রদত্ত) অযত্নে পতিত ছিল এবং রাজা চক্রধ্বজ বা কান্তেশ্বর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তা নিয়ে এসে রাজধানীতে স্থাপন করেন। গোসানীমঙ্গলে লিখিত আছে স্ফটিক কুড়ার তটে এক শিমূল গাছের মূলে ওই 'কবচ' নিহিত ছিল। রাজা কান্তেশ্বর 'মধুজালী' নামক চণ্ডালের সাহায্যে তা পেয়েছিলেন এবং সেজন্য তিনি তাকে মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত করেন ও ফুলতোলা দেউরী উপাধি দান করেন। মতান্তরে ভগদত্তের ওই অক্ষয় চণ্ডিকা কবচ যুদ্ধাবসানে তাঁর বংশধরদের অধিকারে ছিল। ১৮০৮ সালে ড. বুকানন হ্যামিলটন কবচসংক্রান্ত জনরবগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিংবদন্তীর রাজা কান্তেশ্বর কর্তৃক গোসানীদেবী প্রতিষ্ঠিত বলে দেবীর নাম 'কামতেশ্বরী' হয়েছে এরকম জনপ্রবাদও আছে। কান্তেশ্বর, সম্পর্কে আমানতউল্লা সাহেব তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, স্থানীয় লোকের মুখে কামতাপুরের একপুরুষী রাজা কান্তেশ্বরের গল্প শুনতে পাওয়া যায়। গোসানীমঙ্গল পুঁথিতেও এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, পরে ভগদত্তের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ভগদত্তবংশ বিলুপ্ত হলে, কামতাপুরের নিকটস্থ জামবাড়ি গ্রামে মহাদেবের বরে কান্তেশ্বর নামক একটি বালক জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতা ভক্তিশ্বর, মাতা অঙ্গনা। দরিদ্র সন্তান কান্তেশ্বর এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিল। তার কাজে মন ছিল না। ব্রাহ্মণ একদিন তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল এক বিষধর সাপ ফনা বিস্তার করে বালককে ছায়া দান করছে। এই রাজলক্ষণ দেখে ব্রাহ্মণ তাকে আদর-যত্ন আরম্ভ করে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন ভবিষ্যতে রাজা হলে সে ব্রাহ্মণকে রাজগুরু করবে। রাজা হবার আগে তাঁর বাসস্থানের নিকটবর্তী কাজলীকুড়া নামক জলাশয়ের তীরে গিয়ে যে কোনও দ্রব্য জল থেকে উঠবে সেগুলিকে স্পর্শ করতে কান্তেশ্বর দেবী চণ্ডী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আদেশানুযায়ী তিনি তা করতে পারেননি। জল থেকে উত্থিত সাপ, কুমীর ইত্যাদি দেখে তিনি ভয় পান, তাঁর হাত একটি সাপের লেজ পর্যন্ত অতিকষ্টে অগ্রসর হয়েছিল এবং সে কারণে তাঁর রাজত্ব মাত্র একপুরুষ স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর মহিষী বনমালার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার অপরাধে কান্তেশ্বর মন্ত্রীপুত্র মনোহরকে বধ করে তাঁর পিতা শশিপাত্রকে সেই নিহত পুত্রের মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য করেন। রাজার এই আচরণে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী দিল্লির মোগলের শরণাপন্ন হন এবং তাঁদের সাহায্যে কান্তেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি করেন। কিন্তু পরে চণ্ডীর কৃপায় রাজা 'কাজলীকুড়া' জলাশয়ে স্নানকালে অন্তর্হিত হন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, কোচ রাজাদের আগে ১৪৯৩ সালে হোসেন শাহের আক্রমণে কামতাপুর রাজ্যের খ্যেন রাজবংশের পতন ঘটে। স্ফটিক পাত্রে আবদ্ধ কবচরূপিণী দেবীর নিত্যপূজা ও উৎসব এতদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু বাংলা ১৩৬৩ সালে জনৈক দুর্বৃত্ত ওই কবচ অপহরণ করে। ফলে বর্তমানে ওই বেদী পূজা হয়।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সারা মাসব্যাপী বিশেষ সমারোহের সঙ্গে 'গোসানী' দেবীর পূজা হয়, এই সময় প্রতিদিন গড়ে ১০ হাজার নরনারী ধর্ম নির্বিশেষে সমবেত হন।

ইতিহাসের নিদর্শন

১৯৫২ সালে ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অফ আর্কিওলজি এম এস ভ্যাটস এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল তিনি নোট আকারে District Handbook of Coachbehar, 1951-এ সংশ্লিষ্ট করেন। কামতাপুর রাজ্যের রাজপাট দুর্গবেষ্টিত ছিল। দুর্গটি বিস্তৃত ছিল পূর্ব-পশ্চিমে। উত্তর-দক্ষিণে সীমাবদ্ধ। বহিঃপ্রাচীরের আয়তন অন্তত ২০ মাইল। দক্ষিণদিকে সিঙ্গিমারী নদী। এছাড়া তিনদিক ঘেরা পরিখার সাহায্যে। কেন্দ্রস্থলে রাজপাটের চিহ্নসমূহ দেখা যায়। ছড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন মূর্তি। ভিতরকামতা গোসানীমারী গ্রামে দেবী কামতেশ্বরী বা গোসানীদেবীর বৃহৎ মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। প্রধান গেট দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে প্রথমেই দোলভিটা, গারোদক্ষ (দেবীর ধনাগার) এবং হোম-গৃহের পরেই পাকা মন্দির। অভ্যন্তরে উত্তর পাশে সূর্যমূর্তি এবং পৃথক চৌকিতে মহাদেব, নারায়ণ, গোপাল ও ব্রহ্মার মূর্তি আছে। মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্বে একটি মন্দিরে মহাদেব ও বৈষ্ণব, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি মন্দিরে মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি মন্দিরে তারকেশ্বর শিব প্রভৃতি দেবদেবী বিদ্যমান, সকলেরই নিত্যপূজা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা প্রাণনারায়ণ নির্মিত মন্দিরটি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার করেছে।

গোসানিমারী থেকে ২ মাইল দূরে ধরলা বা সিঙ্গিমারী নদী। শরৎকালে নদীর চরে কাশফুলের বন্যা। রঙবেরঙের পালতোলা নৌকো ফেরি পারাপার করে। আরপারে আদাবাড়ি ঘাট। এই জলভ্রমণ আপনার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকতে পারে। এই সেই ধরলা নদী যা মরমী গায়ক আব্বাসউদ্দিনের গানে অমর হয়ে আছে।

'উড়িয়া যায়রে চখোয়া পঙ্খী,
বগীক বলে ধারে
তোমার বগা বন্দী হইছেন,
ধরলা নদীর পারে
হায়রে ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।'

আদাবাড়িঘাট থেকে ঘুরে আসা যায় বাংলাদেশের সীমান্তে সিতাই থানায়। গোসানিমারীতে সাক্ষাৎ করতে পারেন কোচবিহারের লোকনাট্য 'কুষান গান'-এর প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ললিত বর্মনের সঙ্গে।

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ পাখিরালয়

উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের সদর শহর রায়গঞ্জ। ১৪০২২ একর সবুজ বনভূমিতে রায়গঞ্জ পাখিরালয়। রায়গঞ্জ শহরকে বাঁহাতে রেখে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই কুলিক নদী ও তার ছোট্ট সেতু। জাতীয় সড়কের ঠিক পাশে নদীর পাড়ে বনবিভাগের জমিতে এই পাখিরালয়। অর্জুন, মেহগনি, সেগুন, কদম, জারুল, শিশু, শিমুল, হিজলসহ নানা গাছপালার সমারোহ এখানে। এই পাখিরালয়ে মূলত বাগলা, নানা জাতের বক, শামুকখোল, পানকৌড়ি, দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে ইত্যাদি দেখা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিযায়ী পাখিরা বেড়াতে আসে প্রতিবছর। মার্চ-এপ্রিলে গাছে গাছে নতুন পাতা আসার পরেই পরিযায়ী পাখির প্রতীক্ষা। মে মাসে বৃষ্টিবাদলের পর হঠাৎ উড়ে আসে কয়েকশো পাখির ঝাঁক।

প্রতিদিন কাতারে কাতারে নতুন নতুন পাখি আসতেই থাকে। সংরক্ষিত পাখিরালয়ে জায়গায় না কুলোলে ছড়িয়ে পড়ে অসংরক্ষিত এলাকাতেও। জুন-জুলাই নাগাদ অর্থাৎ বর্ষার শুরুতে বাসা বাঁধার তৎপরতা। বর্ষায় জলাশয়ে কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, সাপের বাচ্চা, কীটপতঙ্গ ও মাছই এদের খাদ্য। মা-পাখিরা এ সময়ই বাসায় তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে।

এ মাসের ৩য়, ৪র্থ সপ্তাহে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা। তারপর ওড়ার। টানা নভেম্বর মাস ধরে চলে প্রশিক্ষণপর্ব। শিক্ষান্তে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তারা ফিরে চলে খাদ্যের সন্ধানে। কেননা ততদিনে জল নেমে গেছে, খাদ্যও কমেছে। ফাঁকা বাসাগুলি খাঁ-খাঁ করে। আবার আসছে বছর ওদের আসার আশায়........।

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশিষ্ট এই শিল্পীকে রাজ্য সরকার লালন পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

রসিক বিল

কোচবিহার জেলার এবং উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য জলাভূমি (Water Body) রসিক বিল। কোচবিহার থেকে মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ হয়ে সড়কপথে রসিক বিল যাওয়া যায়। তবে যাওয়া সহজ আলিপুরদুয়ার মহকুমার কামাখ্যাগুড়ি হয়ে। কামাখ্যাগুড়ি থেকে রসিক বিলের জলাভূমি মাত্র তিন মাইল পথ। রিকশায় যাওয়া যায়। ব্যস্তগঞ্জ কামাখ্যাগুড়ি বাস ও ট্রেনপথে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে যুক্ত।

রসিক বিলকে ঘিরে রয়েছে লাগুরহাট ও আটিয়ামোচর এলাকার বনভূমি। এই দুটি এলাকার মধ্যে যোগাযোগ 'বটিকাটা নালার' ওপর তৈরি সাঁকো। সংলগ্ন বনে আছে শিশু, গামার, কদম, মিনজুরী ও অন্যান্য গাছপালা।

এই জলাভূমিতে সারা বছরই নানারকম পাখি দেখতে পাওয়া যায়। শীতে যাযাবর পাখিরা এসে রসিক বিলের বৈচিত্র্য আরও বাড়িয়ে তোলে। পানকৌড়ি, খুন্তেবক, ছোট কোর্চেবক, গোবক, কোঁচবক, শামুকখোল, মাছরাঙা, সাদা কাক, মরাল, বড় দিঘর, তুলিকা, লাল বনমুরগি, ফিঙে হরবোলা, জলপিপি, পাপিয়া, কোকিল, তিলে ঘুঘু, শালিক, কোড়াল, চিল, টিয়া, লালকণ্ঠি টিয়া, ভারতীয় ময়না, প্যাঁচা, ঈগল, রাজশকুন প্রভৃতি পাখ-পাখালির কলরবে ভরে ওঠে রসিক বিল।

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম এখানে একটি ১৬ শয্যার ডরমিটরি ও দুটি দুই শয্যার কটেজ তৈরি করেছে। পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের বাড়িটিও তৈরি হয়ে গিয়েছে। আশা করা যায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটিও তাড়াতাড়ি চালু হবে।

রসিক বিলের মাছের সুখ্যাতি না করলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকবে। নানারকমের সুস্বাদু ছোট মাছের রকমারি রান্না পর্যটকদের রসনাকে অবশ্যই তৃপ্ত করবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত মৎস্যদ্বয় বোড়োলি ও খট্টিপুঁটি।

রসিক বিলে অবস্থানকালে পর্যটকদের উপরি পাওনা হতে পারে শরৎ রাভার গলায় ভাওয়াইয়া গান শোনা। বন বিভাগের কর্মী এই সদাহাস্যময় যুবকের দোতারা বাদ্যযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও অপূর্ব কণ্ঠস্বরে ভাওয়াইয়া লোকগীতির পরিবেশনা আপনাকে মুগ্ধ করবে। শরৎ-এর সঙ্গে চলে আসুন কাছেই রাভা সম্প্রদায়ের গ্রাম শোলাবাড়িতে। পরিচিত হোন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। রাভা পরিবারের আন্তরিকতা আপনাকে মুগ্ধ করবে।

যোগাযোগ ও থাকার ব্যবস্থা

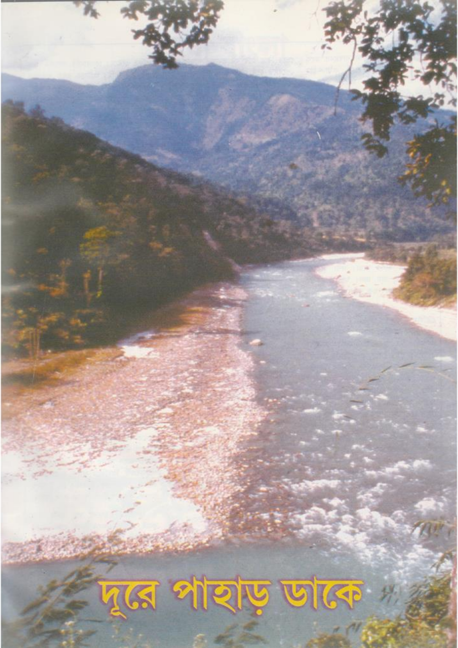
হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে কোচবিহার যাওয়ার অনেকগুলি ট্রেন আছে। হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস-এ নিউ কোচবিহার যাওয়া যায়। দূরত্ব প্রায় ৭০০ কিলোমিটার। স্টেশন থেকে কোচবিহার শহর ৫ কিমি দূরে। রিকশায় যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে রকেট বাসে কোচবিহার যেতে ১৫/১৬ ঘণ্টা সময় লাগে।

কোচবিহার সড়ক পথে আলিপুরদুয়ার, বক্সা অরণ্যের রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী, ভুটানের ফুটসোলিং, ডুয়ার্সের সর্বত্র, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির সঙ্গে যুক্ত। সব পথেই বাস চলে। কোচবিহার একমাত্র জেলা যেখানে দোতলা বাস চলে।

কোচবিহারে থাকার জন্য রয়েছে পৌরসভা পরিচালিত পান্থনিবাস ও জেলা পরিষদীয় অতিথিনিবাস। চিঠি দিয়ে অগ্রিম সংরক্ষণ করা যায়। কোচবিহার হোটেলসহ দু-তিনটি বেসরকারি হোটেলও আছে কোচবিহারে।

---

* গোঁসানিমারী কোচবিহার জেলার অন্যতম পুরাকীর্তি অঞ্চল।


দূরে পাহাড় ডাকে

বাহারি সব চা বাগানের মাঝে সুন্দরী ডুয়ার্সে ক'টা দিন কাটানোর মজাই আলাদা। প্রকৃতি এখানে সদা লাস্যময়ী। অথচ আছে নিবিড়তা, অরণ্যের আদিম ছোঁয়া, ছমছমানি নিশুতি রাত। উচ্ছল কিশোরীর মত অরণ্য-ঝোরা। দুরন্ত পাহাড়ি নদী। অপরূপা চা বাগানের সবুজ হৃদয়। মন এখানে নিজের মতো ছড়িয়ে পড়তে জানে।

বাঘপুল পেরিয়ে শিলিগুড়ি থেকে যে সেবক রোড চলে গেছে ওটা ধরেই গাড়ি ছুটবে। আস্তে আস্তে শুরু হবে নিজেকে হারানোর পালা। দু-পাশে মহানন্দা অভয়ারণ্য। ৩১নং জাতীয় সড়ক ধরে তিস্তা পেরিয়ে পথ চলেছে আসামের গুয়াহাটি। কাছেই মংপং। ইচ্ছে হলে এখানেও থাকা যায়। ছবির মতো জায়গাটি। অবশ্য সারা ডুয়ার্সই তো ছবির মতো। ঘণ্টা দুয়েকে পৌঁছে যাওয়া যায় মাল। মালকে কেন্দ্র করেই ডুয়ার্স ভ্রমণ শুরু করা যায়।

তেসিমলা

পর্যটন মানচিত্রে নতুন যে নামটি উঠে আসছে, তা হল তেসিমলা। মালের ক্যালটেক্স মোড় থেকে জলপাইগুড়ি যাবার পথে দু কিমি. এগোলেই প্রকৃতির নিভৃত কোল তেসিমলা গ্রাম। বেসরকারি ব্যবস্থা আছে থাকার। মোম-জ্যোৎস্নায় এখানে প্রকৃতি স্বর্গীয় রূপে দেখা দেয়। তেসিমলা থেকে চলে যাওয়া যায় ডামডিম, গরুবাথান, পাপরিখেতির পথ ধরে লাভা-লোলেগাঁও, যেখান থেকে অনায়াসে দেখা যাবে তুষারশুভ্র হিমালয়। গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপমারির অভয়ারণ্য কিংবা চালসা, খুনিয়া হয়ে ঝালং, বিন্দু—যেদিকে ইচ্ছে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

চাপরামারি অভয়ারণ্য

শিলিগুড়ি থেকে ৭০ কিমি দূরে চাপরামারি। প্রকৃতি নিজেকে এখানে অসাধারণ রূপসী করে রেখেছে। লিস, ঘিস, চেল, নেওড়া—এইসব সুন্দরী নদীরা আপনাকে দেখা দেবে মুখের উড়নী সরিয়ে। কী করে যে পৌঁছে যাবেন এ পথের শেষ জনপদ চালসা টেরই পাবেন না। এখানেই সেরে নিতে হবে বন ভ্রমণের বাজার-হাট। পেরোতে হবে যৌবনবতী মূর্তি নদী। দূরে পাহাড়শ্রেণী হাতছানি দেবে। পাশে ছোট ছোট গ্রামের খেত। উঁচু মাচা মাঝে মাঝে।

চালসা থেকে খুনিয়া মোড় সাত কিমি। এই খুনিয়া মোড় থেকে নানাদিকে রাস্তা চলে গেছে। উত্তরে চাপরামারি, ঝালং হয়ে বিন্দু পর্যন্ত। পূর্বে মাদারিহাট, হাসিমারা। দক্ষিণে মূর্তি, গরুমারা, লাটাগুড়ি।

খুনিয়ামোড় থেকে বাঁ দিকে উত্তরের রাস্তাটি পৌঁছে দেবে চাপরামারির বনবাংলোয়। এ পথে কিমি চারেক গেলেই চোখে পড়বে মিটার গেজ রেলপথ। চলেছে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার।

গরুমারা অভয়ারণ্য দিয়েও আসা যায় চাপরামারি। মালবাজারের টুরিস্ট লজে থেকে গাড়িতে করে একদিনেই বেড়িয়ে নেওয়া যায় গরুমারা, চাপরামারি, ঝালং, বিন্দু। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার—নানা দিক থেকেই বাসে করে পৌঁছে যাওয়া যায় চালসা। চালসা থেকে জিপ বা গাড়িতে চাপরামারি, গরুমারা যাওয়া যায়। রাতে গাড়ি চলে না ও পথে।

চালসা থেকে লাটাগুড়ির পথে গরুমারা অভয়ারণ্যের প্রবেশ দ্বার বাঁদিকে রেখে এগোলে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পরিচিতি প্রাঙ্গণ বা প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র। সকাল নটার আগে প্রবেশের অনুমতি মেলে না।

প্রকৃতিকে হাতেকলমে চিনিয়ে দেবার বিরাট আয়োজন এখানে। শুধু সবুজ অরণ্যে দুটি দিনের বিশ্রামে সাঙ্গ করা যাবে না বনভ্রমণ। পর্যটককে প্রকৃতি সচেতন করার জন্য নানা আয়োজন এখানে। বন্যপ্রাণীই শুধু নয়, যাবতীয় বন্যপ্রাণীবিষয়ক সচেতনতার জন্যই এই প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল বিষয়েও তথ্য জানা যাবে ইলেকট্রিক বোর্ডের মাধ্যমে। সকাল নটা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা। ছুটির দিন বন্ধ। চাপরামারির জঙ্গলে দিনে দিনে বেড়ানোর অনুমতিপত্রও সংগ্রহ করা যায় এখানে অফিস থেকে।

গরুমারা প্রায় ৮০ বর্গ কিমি জুড়ে। ১৯৮০ সালে এটি জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। চাপরামারি আয়তন প্রায় ৯৪২ বর্গ কিমি। আটাত্তর রকম প্রজাতির বন্য প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সংখ্যাটি সম্প্রতি হয়তো কিছুটা বেড়েওছে। গাউর, হাতি যেমন আছে, আছে তেমন চিতা, হাতি বানর এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর। বিচিত্র সমারোহ নানা প্রজাতির ও নানা দৈর্ঘ্যের ঘাসের। প্রায় তিরাশি রকমের ঘাস আছে। উঁচু ঘাস যাকে এলিফ্যান্ট গ্রাস বলে তারই পাশে মধুকা, টাটা, গুয়াতেমালা, পরুভু কত প্রজাতির ঘাস।

নানা রকমের পাখি আছে ছোট ছোট জলাগুলিকে ঘিরে। শীতের দুপুরে এই জলায় কত না পাখিদের ভিড়। সম্বর, চিতল, হগ ডিয়ার আর বার্কিং ডিয়ার—চার ধরনের হরিণ আছে এখানে। আছে নানা ধরনের বিড়াল। জঙ্গল ক্যাট, লেপার্ড ক্যাট বা ফিশিং ক্যাট।

ছোট্ট টিলার ওপর কাঠের বনবাংলো। পিছনে কর্মীদের আবাসস্থল। সামনে ফুলবাগান। চারপাশ পরিখা বেষ্টিত। আট-দশ ফুট গভীর পরিখার ওপরে ড্র-ব্রিজ পাতা থাকে। রাত নামতেই তা সরিয়ে নেওয়া হয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বনবাংলো। সুতরাং বুঝে নিতে কষ্ট হয় না—এখানে অরণ্য ভীষণভাবেই বন্য। বন্যতার কারণেই নিরাপত্তার এত কঠোর বেষ্টনী।

অরণ্য অতি যত্নে এখানে নিবিড়তা নামায়। নিস্তব্ধতা এখানে নিজেকে সঙ্গ দেয় একাকী। বনবাংলোর বারান্দা থেকে পর্যটক দেখতে পান দলবদ্ধ বাইসন বা দুরন্ত চিতল হরিণের ঝাঁক। সামনের কৃত্রিম নুনিতে নুন চাটতে আসে বনের প্রজারা। আরও দূরে পাহাড়শ্রেণী, ঝিমঝিমে অরণ্য, দূরে কোনও অচেনা লোকালয়ের জোনাকির মত টিমটিমে আলো—চাপরামারিকে অনন্য করে তোলে।

চাপরামারি থেকে সাত কিমি. দূরে কুমাই। জঙ্গল এখানে ফিকে হচ্ছে। কুমাই থেকে শুরু হচ্ছে হিমালয়ের চড়াই পথ। সেই প্যাঁচালো রাস্তা ধরে চলে যেতে হবে গৈরিবাস। পথ তারপর নেমে আসছে ঝালং। এই গৈরিবাস থেকে যাওয়া যায় রঙ্গো। সিঙ্কোনা প্ল্যানটেশনের কাজ হয় এখানে।

মধ্য বাংলা

ঐতিহ্য পর্যটনের স্বর্ণখনি মধ্য বাংলা

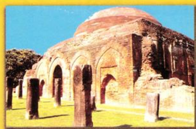
- দক্ষিণ দিনাজপুর
- মালদহ
- মুর্শিদাবাদ
- বীরভূম
- বর্ধমান
- নদীয়া

অতীতের শিক্ষা , শিল্প , সাহিত্য, সংস্কৃতি , ধর্ম, রাজনীতির মূল পীঠস্থান মধ্য বাংলা । ইতিহাস আজও এখানে কথা বলে । বৈচিত্র্যময় হাজারো ভ্রমণবিন্দু পর্যটকদের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে ।



মালদা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও পর্যটন সম্ভাবনা

অমল রায়



চিকা মসজিদ



জগজ্জীবনপুর

ছবি : লেখক

বিগত কয়েকবছর ধরে মালদা জেলার জগজ্জীবনপুর গ্রামের তলাভিটায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার দ্বারা উৎখননকার্য পরিচালিত হওয়ায় এক বিশাল বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রামটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পুনর্ভবা নদীর পশ্চিমদিকে মালদা শহর থেকে ৪১ কিমি পূর্বে অবস্থিত।

১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ তুলাভিটায় আকস্মিকভাবে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাম্রশাসনের আবিষ্কার ও তার পাঠোদ্ধার হবার পর ওই প্রত্নস্থলের গুরুত্ব অনুধাবন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা তুলাভিটাকে ১৯৯০ সালে "সংরক্ষিত স্মারক" হিসাবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান ও উৎখনন কার্যের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জগজ্জীবনপুরে অবস্থিত মুখ্য প্রত্নস্থলগুলি হল : তুলাভিটা, আখরিডাঙা, নিমডাঙা, মাইভিটা বা রাজার মায়ের ঢিবি ·এবং লক্ষ্মীঢিবি। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে জগজ্জীবনপুর মৌজায় আরও কয়েকটি ছোট প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তাম্রফলকটির একদিকে ৪০টি পঙ্‌ক্তি এবং অন্যদিকে ৩২টি পঙক্তি খোদিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় নবম শতাব্দীর "সিদ্ধমাতৃকা" লিপিতে এই দলিলটি লেখা হয়েছে। নতুন রাজা মহেন্দ্রপালদেবের নাম এই প্রথম পাওয়া গেল—যা ইতিহাসে অজানা ছিল। তাম্রশাসন ব্যতীত উৎখননের পূর্বে একটি 'ব্রোঞ্জ' নির্মিত ছোট বুদ্ধের মূর্তি (৪.৪ সেমি x ৩.৫ সেমি x ২.৭ সেমি) এবং হালকা কালো পাথরের একটি বুদ্ধমূর্তি (৩০ x ১৭ x ১২ সেমি) পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৯২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসন্ধান ও উৎক্ষেপণ চলছে। লোকবসতি থাকায় প্রথম দিকে কাজের অগ্রগতি সেভাবে হয়নি। ১৯৯৬ সাল থেকে ব্যাপকভাবে উৎখনন চলছে এবং বিহার সৌধের অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে।

উৎখননের সময় স্তরবিন্যাস, প্রাপ্ত পুরাবস্তু এবং অন্যান্য নিদর্শন থেকে বোঝা

যাচ্ছে যে বিহারটি পালযুগের এবং তার পূর্বে কোনও বসতির সাক্ষ্য নেই।

বিহার অঙ্গনটি পুরোপুরি উন্মোচিত হবার পর দেখা গেছে যে, এটি প্রায় বর্গাকার (২৪.৫ মিঃ x ২৩.৫ মিঃ)। নির্মাণকার্যে বিভিন্ন মাপের ইট ও কাদার মশলা ব্যবহার করা হয়েছিল। পাথরের ব্যবহার খুবই কম। নবম-দশম শতাব্দীতে এই প্রকার প্রায়-বর্গাকার বিহার-নকশা পূর্ব ভারতের অনেক স্থানেই অনুসৃত হয়েছিল। ওড়িশার ললিতগিরি, উদয়গিরি এবং বিহারের নালন্দার বিহার-নকশা প্রায় অনুরূপ। অধিক ব্যবহৃত ইটের মাপ হল ৩২ x ১৮ x ৬ সেঃ মিঃ, ২৮ x ১৭ x ৪ সেঃ মিঃ, ২৬ x ১৭ x ৬ সেঃ মিঃ, ২৩ x ১৮ x ৫ সেঃ মিঃ এবং ২৮ x ২৫ x ৫ সেঃ মিঃ।

এ পর্যন্ত উৎখননে মোট ২২টি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কক্ষগুলির মাপ একরকম নয়। কক্ষগুলির দরজার মাপ মোটামুটিভাবে সব ক্ষেত্রেই ১ মিটার।

বিহারের পশ্চিম দিকে একটি বর্গাকার গর্ভগৃহ উন্মোচিত হয়েছে। গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে।

বিহারের বাইরের দিকের দেওয়াল বরাবর চার কোণেই একটি করে গোলাকার প্রকোষ্ঠ পাওয়া গেছে। এগুলির পরিধি হল ১৯.৬০ মিটার এবং সংলগ্ন কৃষিজমি থেকে এর উচ্চতা হল গড়ে ৩.৫০ মিটার। এই প্রকার বরুজ-প্রকোষ্ঠ বিহার রাজ্যের আন্তিচকে পাওয়া গেছে।

তুলাভিটার এই বিহারের প্রবেশদ্বারটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস। এটি পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং কেবলমাত্র ভিত্তি-নকশাই অনাবৃত হয়েছে। প্রবেশদ্বারটি বাইরে থেকে বেশ বড় একটি সিঁড়ি দ্বারা যুক্ত। এর দুটি কক্ষ রয়েছে—সম্মুখ কক্ষ ও পশ্চাৎ কক্ষ। সম্মুখ কক্ষের মাপ হল উত্তর-দক্ষিণে ১০.২০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৫ মিটার।

বিহার অঙ্গনটি চতুর্দিকের বারান্দা ও কক্ষ থেকে বেশ নিচু এবং অবতরণের জন্য পূর্ব দিকে এবং পশ্চিম দিকে দুটি সিঁড়ি আছে।

উৎখননে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশ্র-ধাতুর মারীচী মূর্তি, পোড়ামাটির সিলমোহর, পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির ও উপরত্নের পুঁতি, পোড়ামাটির বল; লোহার বিভিন্ন বস্তু, নকশাযুক্ত ইট প্রভৃতি।

মারীচী মূর্তিটি বিহারের ১৩ নং কক্ষ থেকে প্রায় ১ মিটার গভীরে পাওয়া গেছে। এটির মাপ হল ১৭.৫ সেঃ মিঃ x ৮.৩ সেঃ মিঃ। দেবী 'প্রত্যালিঢ়' ভঙ্গিমায় শূকরবাহিত রথের উপর দণ্ডায়মান। দেবীর ৩টি মস্তক ও ৬টি হাত রয়েছে। দক্ষিণ হস্তের আয়ুধগুলি হল, 'বজ্র', 'তীর' ও 'সুচ' এবং বাম হস্তের আয়ুধগুলি হল 'পত্রশাখা', 'ধনু' এবং 'সুতা'।

এ পর্যন্ত উৎখননে শতাধিক পোড়ামাটির সিলমোহর পাওয়া গেছে। বিহার-সিলমোহরে ৩টি পঙ্‌ক্তি ও ব্যক্তিগত সিলমোহরগুলিতে ১টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। বেশির ভাগ সীলমোহরে 'শ্রীবজ্রদেব কারিত নন্দদীর্ঘী বিহারীয় আর্যভিক্ষু সংঘঃ (সংঘস্য)' লেখা রয়েছে। সিলমোহরে 'নন্দদীর্ঘী' কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এ পর্যন্ত কোনও বৌদ্ধমঠের নামকরণ জলাশয়ের নামে হয়নি।

এ পর্যন্ত উৎখননে শতাধিক পোড়ামাটির ফলক উদ্ধার করা গেছে। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, এই ফলকগুলি বিহারের দেওয়ালগুলি অলংকৃত করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। সবগুলি একই মাপের নয়। ফলকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মূর্তি বা আকার হল শিব, সূর্য, বোধিসত্ত্ব, বরুণ, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, কর্কট ও মীন রাশি, রাহু, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর-কিন্নরী, গণ, যোদ্ধা, ছত্রধর, ভারবাহক, উপাসক, পদ্মের উপর সংস্থাপিত ধর্মগ্রন্থ, বরাহ, সিংহ, হরিণ, মহিষ, মুক্তাফলিত হংস, হাতি, ময়ূর, বাঁদর, কুকুর, ভেড়া, ছাগল, গরু প্রভৃতি। যদিও ফলকগুলি বিভিন্ন মাপের তথাপি ২৮ x ২৪ x ৭ সেঃ মিঃ মাপের ফলকের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

ফলক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের নকশাযুক্ত ইটকেও দেওয়ালের অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। নকশাযুক্ত ইটগুলিকে সাধারণভাবে ৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন পদ্মপাপড়ি, তির্যক আকারের ফলা, পিরামিডাকৃতি, মাদুর-বেড়া, ওল্টানো খিলান, গোলাকার পদ্মপাপড়ি, বরফি আকৃতির ফুলের শিকলমালা, পদ্মকান্ড ইত্যাদি।

উৎখননে বিস্তর মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। সেগুলি বিশ্লেষণে নানা তথ্য পাওয়া গেছে। তুলাভিটার মৃৎপাত্রগুলিকে মূলত ৩টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা হাল্কা লাল, ধূসর এবং কালো। মুখ্য আকারগুলি হল হাঁড়ি, কলসি, বাটি, প্লেট, ঢাকনা, সরা এবং নলযুক্ত ছোট পাত্র।

উন্মোচিত বিহার স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষগুলিকে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের সূত্র মেনে সংরক্ষণে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। পুরানো ইটগুলিকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনমত মাপে কেটে তারপর মশলা দ্বারা মেরামতির কাজ চলছে।

তুলাভিটায় উৎখননের ফলে বৌদ্ধবিহারের অনেকখানি উন্মোচিত হওয়ার ফলে জগজ্জীবনপুর গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটন মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

প্রত্নস্থলটির গুরুত্ব অনুধাবন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর জগজ্জীবনপুরকে একটি নতুন পর্যটন স্থল হিসাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে বিশদ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে যে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। ওই সংগ্রহশালায় উৎখননে প্রাপ্ত পুরাবস্তু রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, মানচিত্র মডেল প্রভৃতি দ্বারা বৌদ্ধবিহারটির সমগ্র চিত্র তুলে ধরা হবে। সংগ্রহশালা ছাড়া আরও প্রস্তাব রয়েছে একটি পর্যটন আবাস ও রেস্তরাঁ গড়ে তোলার। নন্দদীর্ঘী জলাশয়টিকে নৌকাবিহারের আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা যাতে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায়। লোক চলাচলের সুবিধার জন্য পাঁচটি মুখ্য প্রত্নফলকে রাস্তাদ্বারা যুক্ত করার কথাও ভাবা হয়েছে। ইতিমধ্যেই লক্ষ করা গেছে যে জগজ্জীবনপুর গ্রামটি বনভোজনের জন্য আদর্শস্থান হিসাবে সাড়া ফেলেছে।

মালদা জেলায় অবস্থিত অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য ও জেলা সংগ্রহালয়কে জগজ্জীবনপুরের সঙ্গে যুক্ত করে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর যে উদ্যোগ নিয়েছে তা পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে যদিও এ ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

মালদা জেলা সংগ্রহালয়টি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় হিসাবে বেশ সমাদৃত। এখানে মূলত পাল-সেন যুগের উৎকৃষ্ট মূর্তিগুলি রয়েছে যা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া জগজ্জীবনপুর থেকে প্রাপ্ত মহেন্দ্র পালদেবের তাম্রশাসনটি এই সংগ্রহশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। বেশ কিছু সুলতান মুদ্রা, তাম্রশাস্ত্র এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালাটিতে সুরক্ষিত রয়েছে।

মালদা জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হল গৌড় ও পাণ্ডুয়া।

গৌড় শহরের ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। এই প্রাচীন নগরটিতে তার সুউচ্চ প্রাকার, শহর-নকশা এবং বেশকিছু ভাল স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। ১৫৩৯ খ্রিঃ শেরশাহ গৌড় আক্রমণ করে এই সমৃদ্ধ নগরটিকে ধ্বংস করেন। যদিও এই নগরের অনেকখানি কালের নিয়মে ও কিছু লোকের স্বার্থপরতায় নষ্টপ্রায়। তথাপি কিছু স্থাপত্য এবং দুর্গের অংশবিশেষ এর মহিমা এখনও বজায় রেখে চলেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) সুলতান নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত গৌড়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্থাপত্য বারদুয়ারি বা বড়সোনা মসজিদ (১৫২৬ খ্রিঃ)।

(২) দাখিল দরওয়াজা বা সালামি দরওয়াজা। অনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়েছিল। এই স্থাপত্যটির মূল আকর্ষণ হল এর উচ্চতা, ছোট ছোট 'লাখৌরি' ইটের সুন্দর অলংকরণ ও সজ্জা।

(৩) ফিরোজ মিনার গৌড়ের অন্যতম আকর্ষণ। মিনারটির উপরে উঠলে গৌড়নগরীর পুরোটাই দেখা যায়। উপরে ওঠার জন্য ভিতরে গোলাকার সিঁড়ি আছে। এই মিনারটির নির্মাণকর্তার নাম নিয়ে বেশ দ্বন্দ্ব রয়েছে। সাধারণভাবে জানা যায় যে সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪৮৬ খ্রিঃ এটি নির্মাণ করেছিলেন। এটির উচ্চতা ৮৪ ফুট। বলা হয়ে থাকে যে দিল্লির কুতবমিনার-এর মতো এই মিনারটি জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত হয়েছিল।

(৪) হজরত মহম্মদের চরণচিহ্ন সম্বলিত পবিত্র কদম রসুল গৌড়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য। ১৫৩১ খ্রিঃ এটি নির্মাণ করেছিলেন নসরত শাহ।

(৫) চিকা মসজিদটির সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না। তবে হুসেন শাহ বন্দিশালা হিসাবে এটিকে ব্যবহৃত করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী সনাতনকে তিনি এখানে বন্দী রেখেছিলেন। মীনা করা ইটের কাজ এটিতে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

(৬) তিনতলবিশিষ্ট লুকোচুরি দরওয়াজা গৌড়ের স্থাপত্যগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৬৫৫ খ্রিঃ শাহ সুজা এটি নির্মাণ করেন।

(৭) মীরসাদ খান কর্তৃক ১৪৮০ খ্রিঃ নির্মিত তাঁতিপাড়া মসজিদটি স্থাপত্যের এক অনন্য নজির। মসজিদের সামনের দিকের দেওয়ালটি জ্যামিতিক ও ফুলের নকশাদ্বারা শোভিত।

(৮) লোটন মসজিদটি ১৪৭৫ খ্রিঃ সুলতান ইউসুফ খান নির্মাণ করেন। হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে এই মসজিদের কিছু কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল। এই স্থাপত্যটি পর্যটকদের আকর্ষিত করে থাকে।

(৯) কোতওয়ালি দরওয়াজাটি প্রথম নাসিরুদ্দিন মহম্মদ কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয়েছিল। এটি মহদিপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত।

এইসব স্থাপত্য ছাড়াও আরও বেশ কিছু স্থান পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে যেমন, ছোট সাগরদিঘি, চাঁদসদাগরের ভিটা, পিয়াসবাড়ি দিঘি ও রামকেলির তমালতলা, বড়সাগর দিঘি ইত্যাদি।

মালদহের অল্প দূরে (১৭.৫ কিমি) পাণ্ডুয়া বাংলার সুলতানি আমলের রাজধানী ছিল। নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৪৪২-৫৯) তাঁর রাজধানী এখান থেকে সরিয়ে গৌড়ে নিয়ে যান। পাণ্ডুয়ায় বেশ কিছু স্থাপত্য পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আদিনা মসজিদ, একলাখি, বড়দরগা, জামি মসজিদ, সালামি দরওয়াজা, ছোটদরগা, চিল্লাখানা, কুতুবশাহী মসজিদ, হামাম ইত্যাদি। স্থাপত্যগুলি ছাড়াও পাণ্ডুয়ার অন্যতম আকর্ষণ হল ডিয়ার পার্ক। মালদহের সন্নিকটে জহুরাতলায় মা জহুরাদেবীর মন্দির আছে। এখানে নাকি পুজো দিয়ে প্রার্থনা করলে সব মনস্কামনাই পূর্ণ হয়।

মালদহ থেকে জগজ্জীবনপুর যাওয়ার পথে বুলবুলচণ্ডী শহরে মা চণ্ডীর মন্দির রয়েছে। ওই মন্দিরে একটি কালো পাথরের 'সদ্যোজাত' মূর্তি রয়েছে। যা ১১/১২ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

মালদহ শহরকে কেন্দ্র করে মুখ্যত মালদা জেলা সংগ্রহশালা, গৌড়, পাণ্ডুয়া ও জগজ্জীবনপুরকে নিয়ে একটি সুন্দর পর্যটন ব্যবস্থা করা যেতে পারে—যা নিয়ে পঃ বঃ সরকারের পর্যটন দপ্তর অনেকখানি কাজ এগিয়ে ফেলেছে। অচিরেই এর বাস্তব রূপায়ণ দেখা যাবে বলে বিশ্বাস।

মালদহে থাকতে গেলে সরকারি ও বেসরকারি সব ব্যবস্থাই রয়েছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। বেসরকারি হোটেল বা লজগুলি মাঝারি ধরনের। ভাল হোটেল খুবই কম। তবে নতুন কিছু ভাল হোটেল এবং লজ সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে।

সরকারিভাবে থাকার জায়গাগুলি হল জেলা পরিষদ অতিথি আবাস, পুরানো ও নতুন সারকিট হাউস, বনদপ্তরের গেস্ট হাউস, যুবআবাস, পূর্ত দপ্তরের গেস্ট হাউস, মঙ্গলবারি গেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট লজ, গৌড় ভবন, মহানন্দা ভবন এবং পর্যটন আবাস।

ভাল বেসরকারি হোটেল এবং লজগুলি হল হোটেল চাণক্য, হোটেল প্যারাডাইস, হোটেল নটরাজ, হোটেল প্রতাপাদিত্য, হোটেল মেঘদূত, হোটেল ময়ূখ, মনোহর হোটেল, হলিডে ইন, হোটেল পূর্বাঞ্চল এবং রাজ হোটেল।

এই ট্যুরিস্ট স্পটগুলোয় কোনও বাস যাতায়াত করে না। কেবল ভাড়া ট্যাক্সির উপর নির্ভর করে যেতে হবে। গৌড়-পাণ্ডুয়া-আদিনা যাওয়া-আসার (মালদহ থেকে) ভাড়া মোটামুটি ৩৫০-৪০০ টাকা। একদিনের সময় দরকার।

জগজ্জীবনপুর যাওয়া-আসার খরচ পড়বে ৪০০-৪৫০ টাকা। এটিও প্রায় একদিন লেগে যাবে। কারণ পথে বুলবুল চণ্ডীর মন্দিরটাও দেখতে হবে।

মোটামুটিভাবে তিনদিনের মধ্যে মালদহের প্রায় সবই দেখা হয়ে যাবে।

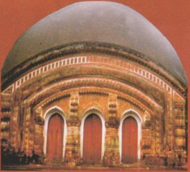
মালদহে যাবার জন্য সবদিক থেকেই ট্রেন (প্যাসেঞ্জার এবং এক্সপ্রেস) পাওয়া যাবে। বাসও নিয়মিত পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৫০ টাকার মত ও রকেট সার্ভিস বাসে ১৪৮ টাকা এবং এক্সপ্রেস বাসে ৯২ টাকা।

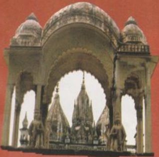
নানা আলোয় মুর্শিদাবাদ



সুপ্রিয়া রায়







নবাবি মুর্শিদাবাদ

বাংলা বিহার ওড়িষার শেষ স্বাধীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ। সেইকালের নবাবি বৈভব এখনও দর্শনীয়। সুলতান হুসেন শাহকে রোগমুক্ত করে মুখসূদন দাস উপহার স্বরুপ পেয়েছিলেন একটি পরগণা ,ক্রমে সেই পরগণা হয়ে ওঠে মুখসুদাবাদ থেকে -আজকের মুর্শিদাবাদ । মধ্য বাংলার ঐতিহ্যি পর্যটনে নবাবি মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব অপরিসীম ।



জাহানকোষা কামান



কাটরা মসজিদ

বাংলার রাজধানী—ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ

নবাবি মুর্শিদাবাদে ঘুরতে গেলে ইতিহাস আপনাকে জানতে হবে, ইতিহাস শুনতে হবে, ইতিহাসের মধ্যেই থাকতে হবে। ইতিহাস মুর্শিদাবাদের প্রতিটি বালুকণাতেও। নবাবি বৈভব শুধু চোখ ধাঁধায় না, ইতিহাসের মায়াবী রূপকথা প্রতিটি শিশুরও মুখে মুখে।

ভারত শাসন করছেন তখন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। ১৭০১ সাল। বাংলার সুলতান সম্রাট-পৌত্র আজিমুশ্‌শান বিলাসিতায় ডুবে আছেন। 'মির্জা হাদি' নামে সম্রাটের এক কর্মচারী রাজধানী ঢাকায় এলেন রাজকার্য তদারকি করতে। কর ঠিকমতো আদায় হচ্ছিল না। রাজস্ব বিভাগে কাজের সুবাদে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছেন মির্জা হাদি। রাজকোষে টাকা জমা পড়ছে না কিন্তু প্রজারা নিয়মিত কর দিচ্ছেন। মির্জা হাদি বুঝে গেলেন—এর মূলে আছেন বেহিসাবি সুলতান ও তাঁর পার্শ্বচররা। ঔরঙ্গজেবের কাছে খবর গেল। সম্রাটের গোপন অনুমতি নিয়ে মির্জা হাদি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিলেন দেওয়ানি। রাজকোষ ফুলে ফেঁপে উঠল। সম্রাটের প্রয়োজনেও টাকা পাঠানো হতে লাগল এখান থেকে। মারাঠা যুদ্ধে অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন সম্রাট মির্জা হাদির কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেলেন। বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য মির্জা হাদিকে তিনি নাম দিলেন 'মুর্শিদকুলি খাঁ'। যার অর্থ 'পরিত্রাতা দেবদূত'।

কিছুদিন পরে সম্রাট তাঁকে বাংলার নবাব ও দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ১৭০৪ সাল। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে নিয়ে এলেন মুর্শিদাবাদে।

১৭০৪—১৭৫৭

বাংলা, বিহার, ওড়িশা তখন স্বাধীন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ তখন খ্যাতির শীর্ষে। ১৭৫৭-য় সিরাজের পরাজয়ের পর নবাবরা হয়ে পড়েন পুতুল-নবাব। ইংরেজরাই সর্বেসর্বা। ইংরেজরা রাজধানী সরিয়ে নেয় কলকাতায়।

৫৪ বছরের নবাবি আমল মুর্শিদাবাদকে চিরকালের জন্য নবাবি বৈভব দান করেছে। তার অতীত ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে এখনও নব উদ্যমে ত্বরান্বিত করতে পারে।

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের জন্য একটি বা দুটি দিন নয়, কম করে পাঁচটি দিন হাতে রাখতে হবে। মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ কোনও 'বুড়ি-ছোঁয়া খেলা' হতে পারে না।

প্রায় শতাধিক দ্রষ্টব্য স্থান মুর্শিদাবাদ শহর ও সংলগ্ন এলাকা জুড়ে

প্রধান দ্রষ্টব্য—হাজারদুয়ারি : ১৮২৯ থেকে ১৮৩৮ সাল—এই সুদীর্ঘ সময় ধরে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইতালীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হয় হাজারদুয়ারি। তখন নবাব নাজিম হুমায়ুন খাঁ। ১৮২৯ সালে ভিত্তিপ্রস্তরের সময় গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নকশা তৈরি করেন ব্রিটিশ স্থপতি স্যার ডানকান ম্যাকলিয়ড। উচ্চতায় এটি ৮০ ফুট। ত্রিতল বিশিষ্ট এই প্রাসাদের আয়তন আনুমানিক ৪২৫ x ৪০০ ফুট। ৮টি গ্যালারি নিয়ে মোট ১১৪টি ঘর। আসল দরজা ৯০০টি, ১০০টি কৃত্রিম দরজা। মোট ১০০০টি দরজা। গথিক শৈলীর এই প্রাসাদের একতলায় আছে—অস্ত্রাগার, মহাফেজখানা ও তোশাখানা ; দোতলায় আছে দরবার কক্ষ, ডাইনিং হল, ড্রয়িং রুম, বিনোদন কক্ষ এবং তিনতলায় আছে নাচঘর, গ্রন্থাগার ও শয়নকক্ষ। দোতলার দরবার কক্ষে রূপার সিংহাসন যা বাংলার মসনদ নামে খ্যাত সেখানে বসে তখনকার নবাব রাজত্ব চালাতেন। যদিও এই প্রাসাদে তিনি বাস করতেন না। এক অভিনব আয়না আছে এই প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে। নিজেকে দেখা যায় না, বাকি সব দেখা যায়।

হাজারদুয়ারি এখন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে। সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 'হাজারদুয়ারি প্যালেস মিউজিয়াম' নামে এটি পরিচিত। ৪১ একর জায়গা জুড়ে হাজারদুয়ারি। দরবার হল পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু সিঁড়ি উঠে গেছে। এখানের আর্ট গ্যালারিতে রয়েছে অসাধারণ মূল্যবান ও দুর্লভ সব ছবি। র‍্যাফেল, মার্শাল, টিশিয়ান, ভ্যানডাইক—বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা প্রায় চার শতাধিক অয়েল পেন্টিং দেখতে দেখতে মন ভরে ওঠে। গ্রন্থাগারে আছে মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজ, তাম্রলিপি, পাণ্ডুলিপি, চুক্তিপত্র, আছে বাগদাদ সম্রাট হারুন-আল-রসিদের হাতে লেখা কোরান, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপি।

আছে ব্রিটেনের মহারানীর উপহার দেওয়া শতাধিক ঝাড়লণ্ঠনযুক্ত ঝাড়বাতি। আছে নানা পাথরের মূর্তি, ফুলদানি, অভিনব চাইনিজ প্লেট—খাবারে বিষ থাকলে যে প্লেট ফেটে যায়।

গ্রন্থাগারে আছে ১০,৭৯২টি বই, ৩৭৯১টি পুঁথি। অস্ত্রাগারে আছে প্রায় ২৭০০টি অস্ত্র। পলাশি যুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত অস্ত্র যেমন আছে, তেমনই আছে আলিবর্দির তলোয়ার, সিরাজের তলোয়ার, বহুনলওয়ালা বন্দুক, নাদির শাহের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ, মীরকাশিমের ছোরা এবং মহম্মদি বেগের ছুরি যেটি দিয়ে সিরাজকে হত্যা করা হয়। শুক্রবার এটি বন্ধ থাকে। অন্যদিন ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। হাজারদুয়ারির পিছন দিকের বাগানটিও মনোরম। হাজারদুয়ারি থেকে সূর্যাস্ত মনোমুগ্ধকর।

ঘড়িঘর-মদিনা-বাচ্চাওয়ালি তোপ

হাজারদুয়ারির সামনের মাঠে পাশাপাশি অবস্থান করছে এই তিনটি দ্রষ্টব্য জিনিস।

ঘড়িঘর—হাজারদুয়ারির সামনের মাঠে একটি সুউচ্চ মিনার। এই মিনারে লাগানো আছে ঘড়ি। নবাব হুমায়ুনজাই বা হুমায়ুন খাঁই এটি বানিয়েছিলেন হাজারদুয়ারির প্রাসাদ নির্মাণের সময়।

মদিনা—আলিবর্দি-সিরাজের সময়ে যেসব সৌধ নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে এই মসজিদটিই এখনও অবশিষ্ট আছে। এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। সিরাজদ্দৌলার মায়ের স্বপ্ন ছিল, সিরাজ নবাব হয়ে পবিত্র মদিনার মাটি এনে একটি মসজিদ তৈরি করবে যার দরজা নির্মিত হবে মূল্যবান রত্ন ও পাথরে। সিরাজ মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য কারবালার পবিত্র মাটি এনে এই মসজিদ তৈরি করেন এবং এর নাম দেন মদিনা। মহরমের সময় মসজিদের দরজা খোলে।

বাচ্চাওয়ালি তোপ—এক বিশাল কামান। ১৬৪৭ সালে এটি জনার্দন কর্মকার তৈরি করেন বলে কথিত। ভাগীরথীর নদীগর্ভ থেকে নবাব হুমায়ুন খাঁ এটি উদ্ধার করেন। একবার এই কামান দাগলে ১৮ সের বারুদ লাগত এবং ১৬ কিমি পর্যন্ত তা ছড়িয়ে যেত। এর বিকট শব্দে অনেক শিশু মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসত। সেই থেকে এর নাম হয় বাচ্চাওয়ালি তোপ এবং এ সব

ঘটনার পর থেকে তোপ দাগাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ইমামবাড়া

হাজারদুয়ারির উত্তর দিকে ভারতের বিশালতম ইমামবাড়া ক্রমশ ভাঙছে। ১৮৪৭ সালে প্রায় সাত লাখ টাকা (তখনকার মূল্যে) ব্যয়ে নতুনভাবে করানো হয়, সিরাজ-নির্মিত কাঠের ইমামবাড়াটি ১৮৪৬-এ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায়।

এই ইমামবাড়ার মাঝের মেদিনা অংশটি রঙিন চিনা ও ওলন্দাজি টালিতে অলঙ্কৃত। মূল্যবান দর্শনীয় জিনিসের একটি মিউজিয়াম এখানে আছে। মহরমের সময় দশদিন এগুলি সাধারণের জন্য খোলা হয়। মহরম উপলক্ষে এখানে মেলা চলে দশদিন। শোকমিছিল বেরোয়। মহরমে হাজারদুয়ারি প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়ে ওঠে।

ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস

বিশ শতকের প্রথমদিকে এটি নির্মিত হয়। স্যার ওয়াসেফ আলি মির্জা তখন মুর্শিদাবাদের নবাব। হাজারদুয়ারির দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে এই পশ্চিমমুখী প্রাসাদটি। সামনে সুন্দর উদ্যান। দোতলায় একটি মিউজিয়াম আছে। নবাবি বৈভবের কিছু চিহ্ন বিদ্যমান। বর্তমানে এখানে অতিথি নিবাসও গড়ে উঠেছে।

টাঙা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এবার চলে আসুন **ত্রিপুলিয়া** গেট। গেট পেরোবার আগেই পড়বে **চক মসজিদ**। এই অঞ্চলটির কাছে চকবাজার। ১৭৬৭ সালে মীরজাফর এই মসজিদটি তৈরি করেন। এখানেই ছিল মুর্শিদকুলি খাঁয়ের দরবার গৃহ 'চেহেল সেতুন'। ১২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের এই মসজিদ বর্তমানে স্থানীয় মুসলিমদের প্রয়োজনীয় মিলনস্থল। সাতটি গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি মীরজাফরের স্ত্রী মণিবেগম বীণাবাদক ওয়াজেদ আলিকে দান করেছিলেন। ওয়াজেদ আলির সমাধি আছে এখানে। নবাব সুজাউদ্দৌল্লার আমলে নির্মিত, বর্তমানে ভগ্নপ্রায় তিনমুখী ত্রিপুলিয়া গেট দিয়ে বেরিয়ে চলুন মোতিঝিল। এই ত্রিপুলিয়া গেটে নহবত বসত। সেই সুর ছড়িয়ে পড়ত বহু দূর দূরান্তে।

তোপখানা

মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশনের কাছেই তোপখানা। মুর্শিদকুলি খাঁর অস্ত্রাগার ছিল এখানে। পরবর্তী নবাবদের তোপখানাও



মদিনা ও ঘড়িঘর



ইমামবাড়া



কাঠগোলা বাগান

এখানে ছিল। এখন এখানে আছে জাহানকোষা কামান। সম্রাট শাহজাহানের আমলে ১৬৩৭ সালে ঢাকার জাহাঙ্গীর নগরের জনার্দন কর্মকার (যিনি বাচ্চাওয়ালি তোপও নির্মাণ করেছিলেন) অষ্টধাতুর এই কামান নির্মাণ করেন। ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের সময় এটি নিয়ে আসা হয়। দৈর্ঘ্যে এটি প্রায় ১২-১৩ হাত লম্বা। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় কামান। কামানে খোদিত লেখা থেকে জানা যায় শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খাঁর আদেশে এটি নির্মিত হয়। ওজন সাত টনের বেশি। প্রতিবার তোপ দাগার জন্য সতেরো কেজি মতান্তরে তিরিশ কেজি করে বারুদ ব্যবহার করা হত। অষ্টধাতুর এই কামানে এখনও মরিচা পড়েনি। এটিও লক্ষণীয়।

কদমশরীফ

তোপখানার পথে কদমশরীফ। ক্রমশ ভাঙছে। এই কদমশরীফের মসজিদে এখনও নমাজ পড়তে আসেন স্থানীয় মানুষ। এখানের মক্তব, লঙ্গরখানা ও অন্যান্য সৌধ এখন ধ্বংসাবশেষ। নবাব হুমায়ুনজার পিতার রাজত্বকালে বসন্ত আলি খাঁ নামে এক খোজা জীবনের সব সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এগুলি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়।

হুমায়ুন মঞ্জিল

এটি কদমশরীফের কিছুটা দক্ষিণে। নবাব হুমায়ুনজা অবসর বিনোদনের জন্য সম্ভবত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে এই সুন্দর প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট হাউস ছিল এখানে। ছিল সুদৃশ্য মোতিমহল ও লালবাংলা মহল। শাহ্ সুজার আমলের কষ্টিপাথরের গোলাকার মসনদটি যেটি বিচারালয়ে রাখা হত বর্তমানে সেটি কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

কাটরা মসজিদ

মুর্শিদকুলি খাঁ শেষ বয়সে একটি কাটরা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। কাটরা মানে বাজার। তাঁর বাসনা ছিল এই কাটরার মাঝখানে থাকবে একটি মসজিদ এবং তাঁর সমাধি। তাঁর জীবিতাবস্থায় শুধুমাত্র মসজিদটি সম্পূর্ণ হয়। ১৭২৩-২৪ সালে এটি নির্মিত হয়। ১৭২৫ সালে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর তাঁকে ওখানেই সমাধিস্থ করা হয়।

কাটরা মসজিদের নির্মাণশৈলিতে মক্কার কাবার অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের দুদিকে দুটি উঁচু মিনার। উচ্চতা ৭০ ফুট। এই মিনার দুটি দর্শকদের বিস্মিত করে। মিনারের উপর থেকে মুর্শিদাবাদের অনেকটা অঞ্চলই দৃষ্টিগোচর হয়। মসজিদের ভেতরের দেয়ালে কোরান পাঠের জন্য অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। কড়ি-বরগাবিহীন এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলে অভিনবত্ব আছে। এখানে ৭০০ কোরান পাঠক বাস করতেন অতীতে। ২০০০ লোক একসঙ্গে কোরান পাঠ করতে পারতেন। ১৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট ২টি গম্বুজ এখনও অবশিষ্ট, ৩টি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

মুর্শিদকুলি খান জাফর খান নামে পরিচিত ছিলেন। কাটরা মসজিদকে তাই জাফর খানের কাটরাও বলা হয়। কাটরা মসজিদের নির্মাণ কৌশল এখনও বিস্ময়কর। বর্তমানে এটি অতি যত্নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কাটরা মসজিদের চারপাশের সবুজ লন ও বাহারি বাগান পর্যটকদের দৃষ্টিকে তৃপ্ত করে। শীতকালে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে এই অঞ্চলে।

ফুটি মসজিদ

মোতিঝিল যাবার পথেই পড়বে জঙ্গলে ঘেরা ফুটি মসজিদ। কাটরা মসজিদের অনুকরণে মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ এটি নির্মাণের চেষ্টা করেন। এর সঙ্গে একটি অলৌকিক গল্পও জুড়ে দেওয়া হয়। এক রাতেই নাকি এটি নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদের আসল নাম ফৌতি মসজিদ। কিন্তু একটি গম্বুজ অসম্পূর্ণ থাকায় মসজিদটি সম্পূর্ণ হয় না। মাঝখানটা ফুটো' থাকায় এটিকে ফুটা বা ফুটি মসজিদ বলা হয়। অপর দুটি গম্বুজ এখনও বিদ্যমান। ১৭৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়।

রাধামাধব মন্দির

মোতিঝিলের কাছেই কুমোরপাড়ায় রাধামাধবের এই মন্দিরটি ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশে শিষ্য হরিপ্রিয় বৃন্দাবন থেকে রাধামাধবের মূর্তি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করান। বর্তমান মন্দিরটি চুনাখালির জমিদার তৈরি করান। কষ্টিপাথরের বিগ্রহটিকে ঘিরে স্নানযাত্রায় বিরাট উৎসব হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছেই রাধামাধবকে কেন্দ্র করে নানা গল্প শোনা যয়।

আজিমুন্নেশার জীবন্ত সমাধি

মুর্শিদকুলির মেয়ে, সুজা খাঁর পত্নী আজিমুন্নেশা 'কলিজাখাকি' নামে বিখ্যাত। আজিমু'ন্নেশাকে জীবন্ত অবস্থায় সামধিস্থ করা হয়। বেহিসাবি জীবনযাপনে অভ্যস্ত আজিমুন্নেশা প্রতিদিন একটি করে শিশুর (মতান্তরে যুবকের) কলিজা খেতেন। স্বামী সুজা খাঁ তা জানতে পেরে তাকে জীবন্ত সমাধি দেন। তাঁর সমাধিস্থলের ওপরে একটি মসজিদ। মসজিদটি অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছে।

জগৎ শেঠের বাড়ি

হাজারদুয়ারিকে পাশে রেখে কাঠগোলা বাগানের দিকে যাওয়ার পথে জগৎ শেঠের বাড়ি। পরেশনাথ মন্দিরটি এখনও আছে। বাড়িটি বর্তমানে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

নশীপুর রাজবাড়ি

কাঠগোলা বাগান থেকে এক কিমি দূরে নশীপুর রাজবাড়িটি দেবীসিংহের বাড়ি বলেও পরিচিত। পানিপথ থেকে ব্যবসা করতে এসে ইংরেজ কোম্পানির রেভিনিউ কালেক্টর পদে থাকার সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত দেবীসিংহ হাজারদুয়ারির অনুকরণে এই বর্তমান ভগ্নপ্রায় প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। প্রাসাদের মধ্যে আছে বৈষ্ণব মন্দির। নশীপুর রাজবাড়ির কিছু দূরে নশীপুর আখড়াটি রামানুজ সম্প্রদায়ের। ঝুলন উপলক্ষে এখানে মেলা বসে।

নিমকহারাম দেউড়ি

মীরজাফর ইতিহাসে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। তাঁর প্রাসাদের প্রবেশদ্বারও নিমকহারাম দেউড়ি নামে খ্যাত হয়েছে। আলিবর্দির বোন ছিল মীরজাফরের পত্নী। ভাই আলিবর্দি বোন শাহখানমের জন্য এটি নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদেই মীরনের নির্দেশে সিরাজকে ছুরিবিদ্ধ করে মহম্মদি বেগ।

জাফরগঞ্জ সমাধি

এই জায়গাটিতে ছিল একটি সুন্দর উদ্যান। বেগম শাহখানমের এই প্রিয় উদ্যানটিতে মীরজাফর ও তাঁর বংশধরদের সমাধিস্থ করা হয়। এটি বর্তমানেও দর্শনীয়।

হাজারদুয়ারির দিকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য স্থান আছে মোটামুটিভাবে সেগুলি ঘোরা গেল। আর টমটমের সুরেলা আওয়াজের সঙ্গে ঘোরা নয়। এবার ভাগীরথীর অপর পারের মুর্শিদাবাদ যাত্রা। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় এদিকটি অবহেলিত হয়ে আছে। মুর্শিদাবাদকে আকর্ষণীয় করতে গেলে এদিকটিতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার।

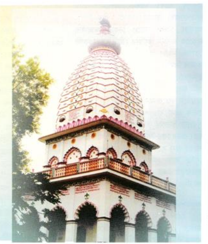
এদিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল খোসবাগ, রোশনাইবাগ, ডাহাপাড়া, হীরাঝিল কিরীটেশ্বরী মন্দির।

হীরাঝিল : জিয়াগঞ্জ-হাজারদুয়ারীর পথে হীরাঝিল, সৌখিন সিরাজ নবাব হবার আগেই হীরাঝিল প্রাসাদের জন্য নানান পাথর আনান গৌড় থেকে। প্রাসাদের পাশে দামি পাথর বাঁধানো বিশাল ঝিল, চারপাশে বিদেশি গাছ। আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রাসাদের কিছু ভাঙা অংশ দৃশ্যমান।

রোশনাইবাগ : নবাব সুজাউদ্দৌলা এটি বানিয়েছিলেন। ফোয়ারা আর আলোর রোশনাইতে উদ্যানের বিরাট চত্বর স্বর্গীয় হয়ে উঠত। বসত গান-বাজনার কাব্য-সাহিত্যের আসর। দিল্লির অনুকরণে ছিল শাহী মঞ্জিল, শাহী দরওয়াজা, দহপাড়া মসজিদ, ফারহাবাগ। এখানেই আছে নবাবের সমাধি।

ডাহাপাড়াধাম : রোশনাইবাগের থেকে কিছু দূরেই প্রভু জগবন্ধুর জন্মভিটেতে গড়ে উঠেছে আশ্রম। বৈশাখ মাসে প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে সাতদিন উৎসব চলে। থাকারও ব্যবস্থা আছে এখানে।

কর্ণসুবর্ণ : ডাহাপাড়াধাম হয়ে চলে যাচ্ছে কর্ণসুবর্ণ। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এখানে নানান গ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙের লেখাতেও রক্ত মৃত্তিকার উল্লেখ আছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন। এই কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে নান্া মত। অনেকেই বলেন, এই সেই কর্ণসুবর্ণ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী। এখানকার রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ-বিহার উৎখনন যতই বিতর্কিত হোক পর্যটকদের এখানে আসা উচিত। খ্রিস্টপূর্ব ২ থেকে ১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি যে অস্তিত্বশীল ছিল তার প্রমাণ মিলেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নানা ঘর দেখা যাবে—সেও কম চমকপ্রদ নয়।



ডাহাপাড়াধামের মন্দির

পাঁচথুপী-কুলী-কান্দি-গোকর্ণ মহালন্দী

পাঁচথুপী : বহরমপুর থেকে বাস যাচ্ছে পাঁচথুপী। পাঁচটি বৌদ্ধ স্তূপ এখানে ছিল। আজ তা নিশ্চিহ্ন। বারকোনার দেউলটিকে একটি স্তূপ বলে দাবি করা হয়। অষ্টাদশ শতকের নবরত্ন মন্দিরটি রেখ দেউল শৈলীতে তৈরি। বারো মিটার উচ্চতার এই মন্দিরে আছে ৯ শিবলিঙ্গ। টেরাকোটায় অলংকৃত প্রবেশ দরজা—সবই ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ মন টানে। সিংহবাহিনী মন্দিরটি বেশি পুরনো নয়। নানা মন্দিরের থেকে পোড়ামাটির কাজ এনে ১৯৫২-তে এটি নির্মিত। আছে জোড়াবাংলা শিবমন্দির। নানান মন্দির, মসজিদে পাঁচথুপী এখনও নিজেকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। থাকার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

কুলী : পাঁচথুপী থেকেই যাওয়া যায় অতীতের কলিঙ্গ, বর্তমানের কুলীতে। নিজানী সাহেবের দরগা এখনও অলৌকিকতা নিয়ে উপস্থিত। উরস উৎসব আর চড়কের মেলায় জেগে ওঠে কুলী।

কান্দি : দ্বাদশ শতকে এক পণ্ডিত জঙ্গল কেটে বসতি গড়েন লক্ষ্মণ সেনের থেকে দান পাওয়া জমিতে। পণ্ডিত বনমালি সিংহের ওই রাজবংশ বৈভব আর প্রতিপত্তিতে খ্যাতি অর্জন করে। রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে এবং শহরে আছে নানা দেব-দেবী মন্দির। টেরাকোটার মন্দিরও আছে। কান্দিতে থাকার জায়গা আছে। নানা জায়গার সঙ্গে বাস সংযোগও বর্তমানে এখানে পর্যটন আকর্ষণ বাড়াচ্ছে।

গোকর্ণ ও মহালন্দী : অতীতের সমৃদ্ধ নগরী আজ ধ্বংসস্তূপ। তবু দেখা যাবে টেরাকোটা সমৃদ্ধ শিবমন্দির। মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব আছে। নৃসিংহের মূর্তিটিও অভিনব। কথিত, কর্ণসুবর্ণের গোশালা ছিল এখানে। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সিংহবাহিনীর মন্দির ছাড়াও আছে অজস্র মন্দির, সিংহের পুকুর, ১৭৭১-৭২-এ প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটা সমৃদ্ধ বৃন্দাবন মন্দির—সবই দ্রষ্টব্য। গোকর্ণ সাগরদিঘির পথে মহালন্দীতে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।



মোতিঝিল



মোতিঝিল পার্ক

মধ্য বাংলার পর্যটন মানচিত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পর্যটন-বিন্দু। ফুটি মসজিদের পথ ধরে টমটম নিয়ে এবারের গন্তব্য হোক মোতিঝিল। নামের মধ্যেই এক মায়াবী মাদকতা আছে। মোতিঝিল ৭৫০ বিঘার অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি হ্রদ, বর্তমানে কচুরিপানায় ভর্তি। এক সময় এখানে মোতি বা মুক্তোর চাষ হত। সেজন্য এই হ্রদের নাম ছিল মোতিঝিল। মোতিঝিল ও সংলগ্ন অঞ্চলটির মোট আয়তন প্রায় ১০০০ বিঘা। মোতিঝিলের দেখভালের জন্যই আলিবর্দির বড় মেয়ে মেহেরুন্নেসা তথা ঘসেটি বেগমের স্বামী নোয়াজেস খাঁ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদটিতে ঘসেটি বেগম থাকতেন। সেই প্রাসাদ 'সাংহী দালান' এখন ধ্বংসস্তূপ।

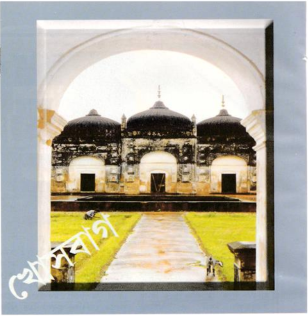
পাশেই আছে ঘসেটি বেগমের গুপ্তঘর। এই গুপ্তঘরকে ঘিরে নানান কাহিনী ছড়িয়েছে মুখেমুখে। কেউ বলেন, ঘসেটি বেগমের অনেক ধনরত্ন এই ঘরটিতে ছিল। এখনও আছে। দরজা-জানালা বিহীন এই ঘরটি সত্যিই বিস্ময়কর সৌধ।

মতিঝিলের তীরেই কালো মসজিদ। নিঃসন্তান ঘসেটি বেগম ও নোয়াজেস খাঁ সিরাজের ছোটো ভাই এক্রামকে দত্তক নিয়েছিলেন। অল্প-বয়সে এক্রামের মৃত্যু হলে নোয়াজেস খাঁ খুব কষ্ট পান এবং তিনিও মারা যান। এই মসজিদ চত্বরে দুজনেরই সমাধি আছে। মসজিদটি এখনও অক্ষত আছে। মোতিঝিল বর্তমানে খুব পীড়াদায়ক অবস্থায় আছে। হাজার বিঘে জমির এই অপচয় খুবই বেদনাকাতর করে তোলে। পর্যটন যখন শিল্প হিসাবে ঘোষিত তখন পর্যটন মানচিত্রে মোতিঝিলের মতো উল্লেখযোগ্য জায়গাটির দুরবস্থা নতুন-ভাবে ভাবায়। ৭৫০ বিঘের এই ঝিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অসাধারণ। মধ্যবাংলার পর্যটন সাম্রাজ্যে মোতিঝিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এতবড় ও সুন্দর একটি জলাশয়কে ঘিরে তৈরি করা যেতে পারে স্বল্পমূল্যে পর্যটক আবাস। নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এই ঝিলকে। নৌকোবিহার বা জলক্রীড়াই শুধু নয়, পিকনিক স্পট বা পার্ক হিসেবেও সংলগ্ন জায়গাটি ব্যবহৃত হতে পারে। কোনও এক সময় এখানে ডলফিন পার্ক করার প্রস্তাবও বোধহয় ছিল—জানালেন মোতি ঝিলের রক্ষণকর্মীরা। বর্তমানে পর্যটকরা খুব কমই মোতিঝিলে আসেন। কারণ মোতিঝিল বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের মাঝখানে পড়ছে। হাজারদুয়ারির চত্বর সংলগ্ন দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখেই আজকালকার একদিনের পর্যটকরা মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ শেষ করেন। সময়াভাবে দূরত্বের জন্য মোতিঝিলে তাঁরা আসতে চান না। আর কীই বা দেখতে আসবেন !

পর্যটকরা এখন আসেন **মোতিঝিল পার্কে**। মোতিঝিল পার্ককেই মোতিঝিল বলে ভেবে নেন তাঁরা। মোতিঝিল পার্ক একটি সফল বেসরকারি উদ্যোগ। পর্যটনের উন্নয়নের জন্য বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা বেশ কয়েকবছর ধরেই নিয়েছে রাজ্য সরকার। পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে পর্যটন দপ্তর। কিন্তু বিরাট বিনিয়োগের সামর্থ্য সরকারের নেই। পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকেই উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মাত্র তেত্রিশ বিঘা জমিকে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র করা যায় তার নিদর্শন মোতিঝিল পার্ক। প্রকৃতির মাঝে একটি দিন কী করে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার সবই হাজির এই মোতিঝিল পার্কে। মাত্র চার বছরে এই পার্কটির নাম ছড়িয়ে পড়ছে সারা রাজ্যে। পিকনিকের যাবতীয় ব্যবস্থাই এখানে আছে। শিশুরা নিতে পারবে টয়ট্রেনে চড়ার স্বাদ। বোটিং করার ব্যবস্থা আছে ছোট ঝিলে। ঝিলের মাঝখানে আইল্যান্ডে রিসর্ট তৈরির পরিকল্পনা আছে। ছোট মিউজিয়ামও তৈরি হয়েছে সিরাজদ্দৌলার নামে। তবে এটিকে আরও ইতিহাস-তথ্যবহুল করা হলে ভালো হয়। যাঁরা ঘুরতে বা পিকনিক করতে আসবেন তাঁদের মধ্যে ইতিহাস-সচেতনতার রঙিন আবির ছড়িয়ে দেবার কাজটি আরও কার্যকরীভাবে করা যাবে। উদ্যোগ প্রশংনীয়। আমরা অপেক্ষায় রইলাম, আসল মোতিঝিলও অসাধারণ একটি পর্যটন বিন্দু হয়ে উঠবে অচিরেই। ৫ বা ৫০ টাকা বেতনের কয়েকজন কর্মচারী নয়, অনেক বেশি প্রশিক্ষিত যুবকেরা বেকারির জ্বালা জুড়োতে পারবে এই মোতিঝিলকে কেন্দ্র করে। মুর্শিদাবাদের অন্যতম কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে উঠবে এই মোতিঝিল।

অল্পচেনা মুর্শিদাবাদ



ট্যাক্সি নিয়ে মুর্শিদাবাদের গ্রামে-গঞ্জে ঘোরা যায় না। বর্ষার কাদায় ভারি গাড়ি আটকে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই পরদিন আর গাড়ি নয়। এবার অটোয় চললাম অল্পচেনা মুর্শিদাবাদের পথে পথে। লালবাগের ঘাট পেরিয়ে খোসবাগ। বড় নৌকায় অটোও নদী পেরোল। খোসবাগ যাবার রাস্তাটি এখন ভাল হয়েছে। কিন্তু এপারে যানবাহনের অভাব পর্যটককে তেমন টানে না। খোসবাগে আছে আলিবর্দি, সিরাজ, লুৎফার সমাধি। ৪০ বিঘা জমি নিয়ে এই সমাধি প্রান্তর। খোসবাগে এক সময় খুশির আমেজ বইতো। নানা বাহারি ফুলের সৌগন্ধে জমে উঠত খোসবাগ। সেই খোসবাগ এখন গল্পকথার উপাদান। স্থানীয় লোকেরা ঘাস কাটতে আসে। বিশ্রাম নেয় খোসবাগের সমাধির নিরাপদ শীতল আশ্রয়ে। তেমনি অবহেলায় পড়ে আছে রোশনীবাগ বা হীরাঝিল। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে পর্যটনকে আকর্ষণীয় করা যায় সহজেই। ব্যবহার করা যায় জলপথকে। ফলে পর্যটকরা জলপথ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করবে, অবহেলিত জায়গাগুলি সুলভে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরতে পারবে। জানতে পারবে ইতিহাসের অনালোকিত দিকগুলি। স্থানীয় প্রশাসন এবং জনসাধারণও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারে।

পরিকাঠামোগত অসুবিধার কারণে আরও বেশি মাত্রায় স্থানীয় ভিত্তিতে কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা করা যায়। স্থানীয় শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করতে পারে। এই অঞ্চলের পর্যটন অনেকটাই সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে।

সবচেয়ে বড় কথা এখানে পর্যটক আসে। তাদের আরও বেশি ধরে রাখা দরকার। তাদের পর্যটনকে আরও বেশি সার্থক করে তোলার জন্য স্থানীয় স্তরে বেশি মাত্রায় উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

কিরীটেশ্বরী বা রানী ভবানীর বড়নগরের মন্দিরপল্লী এখনও মূল্যবান সম্পদ। দিগন্তজোড়া সবুজ ফসলের ক্ষেতের এক প্রান্তে নীল আকাশের গায়ে যে ভাঙা মন্দিরপল্লী, সামনে বিস্তৃত মাঠ—গুচ্ছ গুচ্ছ ভাঙা ভাঙা মন্দির বিস্মিত করে পর্যটককে। কী কারণে এইসব জনবিরল জায়গায় মন্দিরপল্লী গড়ে তোলা হয়েছিল তা ভাবার বিষয়।

ডাহাপাড়াধামের পাশ দিয়ে সোজা পথে আসতে যে ঝুনকা ক্যানেল, তা ছাড়াতেই আশ্চর্যভাবে চোখে পড়ে প্রকৃতির পাল্টে যাওয়া। রাঢ়ভূমির স্পষ্ট বৈচিত্র্য বাড়ির গঠনে, নারীর হাঁটায়, পথের ধুলোর রঙে, আলধারে সারি সারি তালগাছের খেয়ালি বিন্যাসে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মন খুলে যায় পরতে পরতে।

সতীর কিরীট পড়েছিল এখানে। কালীমাতার আদি মন্দির **কিরীটেশ্বরীতে** সতীর কিরীটই পূজিত হচ্ছে। পৌষ মাসে শনি-মঙ্গলবার মেলা বসে। গ্রামীণ মেলার স্বাদ পাওয়া যায় এখনও। বাঁশি বাজে। খোঁপায় লালফুল গুঁজে আসে সাঁওতাল মেয়ের দল। শহুরে মানুষ আর আদিবাসী কৃষক মিলেমিশে এক হয়ে যায়। কিরীটেশ্বরীর পৌষমেলায় এখনও অনেক বেশি প্রাণ আছে। চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি নেই। আছে মুক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতির সন্তান গ্রামের মানুষজন।

১৭২টি শিবমন্দির গড়ে উঠেছিল একদিন। এই উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণে। পুণ্য হিন্দু তীর্থ হিসেবে এর খ্যাতি ছিল। কিরীটেশ্বরী ছিল তখন কিরীটকণা। বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থেও 'কিরীটকণা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪০৫-এর মূল মন্দির আর নেই। বর্তমান মন্দিরটি ১৮ শতকে তৈরি। তৈরি করেন মুর্শিদকুলী খাঁর প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ রায়, যিনি 'বঙ্গাধিকারী' নামে খ্যাত ছিলেন। দেবীর সেই 'কিরীট' বা মুকুটটিও কিছু দূরে রানী ভবানী নির্মিত গুপ্তমঠে। পাথরের তৈরি কিরীটই পূজিত হচ্ছে। রানী ভবানীও এখানে একটি মন্দির তৈরি করেন। সেই দেবীমূর্তিও কান্দির জমিদার অযত্নে পড়ে থাকার কারণে তুলে নিয়ে যান। পাশেই বড় দিঘি কালিসাগর। দর্পনারায়ণ এটি কাটিয়েছিলেন। মতান্তরে, কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়ে মীরজাফর এটি কাটান বলে কথিত। অসংখ্য মন্দির, দেবীমূর্তি, শিলাখণ্ড, কিছু ধ্বংসাবশেষ, নানা কাহিনী যেমন আছে, তেমনি আছে ইতিহাসের অন্যরূপ। রানী ভবানীর পালিত ছেলে রাজা রামকৃষ্ণ পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন [illegible] প্রচার চালানো

হয়। এ দাবি ঠিক ততটাই জোরালোভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বড়নগরের রানী ভবানীর পুরোহিতকুলের বর্তমান বংশধররাও। নন্দকুমার নির্মিত মন্দিরের ফাটল বা মন্দিরস্থ শিবের ভেঙে যাওয়ার গল্প অন্যত্রও শোনা যায়। নন্দকুমারের ফাঁসির সময় নাকি মন্দিরের দেওয়াল এবং শিব খণ্ডিত হয়ে যায়। অদূরেই সেই শিব পড়ে আছে। কিছুটা অলৌকিকতা, কিছুটা অতথ্য—সব মিলেমিশে এসব জায়গাকে আরও যেন আকর্ষণীয় করে তোলে। সত্য ইতিহাস জানতে উন্মুখ হয়ে ওঠে মন। মনে হয়, আবার আসিব ফিরে এই দিঘিটির তীরে। মন্দিরে এখনও ভাঙা মন্দিরগুলোর বড় বড় শিব। নিত্য পূজা হয়।

আজিমগঞ্জ : বড়নগর গ্রামের যাতায়াতের পথেই পড়ে আজিমগঞ্জ শহর। ঘিঞ্জি পুরনো শহর। জৈন-অধ্যুষিত। বিশালকায় প্রাসাদোপম সব সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের পুরনো বাড়িগুলোও দর্শনীয়। আছে লিঙ্গনাথজির মন্দির। বহু চুড়োওয়ালা মন্দিরটি দর্শনীয়। পর্যটক আকর্ষণে বড় ভূমিকা নিতে পারে নওলাক্ষা উদ্যান। এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

পরিকাঠামোগত অসুবিধার কারণে আরও বেশি মাত্রায় স্থানীয় ভিত্তিতে কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা করা যায়। স্থানীয় শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করতে পারে। এই অঞ্চলের পর্যটন অনেকটাই সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে।

জিয়াগঞ্জ : ভাগীরথী পেরিয়েই আজিমগঞ্জ থেকে জিয়াগঞ্জ। যদিও দুটি শহরই একই পৌরসভায়। জিয়াগঞ্জও জৈন অধ্যুষিত। আদিনাথ, বিমলানাথ ও শম্ভুনাথজীর জৈন মন্দির দ্রষ্টব্য। জিয়াগঞ্জ বাজারের এই মন্দিরগুলি মুর্শিদাবাদ-হাজারদুয়ারীর সঙ্গেও সময় থাকলে দেখে নেওয়া যায়। এ দিকেই পড়ে সাধকবাগ, বড়নগরের বিপরীতেই সাধকবাগ, রামানুজ সম্প্রদায়ের সন্তরাম আউলিয়া সাধকবাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তা নদীগর্ভে প্রায় ৫০০ বিষ্ণুর অবতাররূপী নানা মূর্তি ও শালগ্রাম শিলার বিপুল সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

রানী ভবানীর মেয়ে তারাসুন্দরীকে নিতে এসেছিলেন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত সিরাজউদ্দৌলা। সন্তরাম আউলিয়ার সাধনা বলে হঠাৎই তারাসুন্দরী বসন্তে আক্রান্ত হয়। ভয় পেয়ে চলে যান সিরাজ। হঠাৎ তারাসুন্দরীর শরীর থেকে উধাও হয়ে যায় বসন্তের গুটি। আউলিয়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। রানী ভবানীর অনুগ্রহে সাধকবাগ বিশাল আকার ধারণ করে। ছোট দিগম্বর আখড়াতেও সারা বছর জুড়ে হয় নানা উৎসব। রথযাত্রাও এখানে বিখ্যাত।

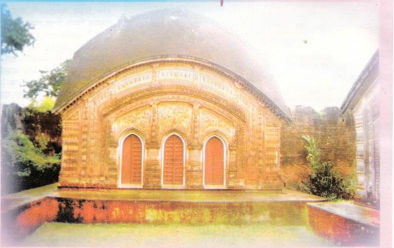
নেহালিয়াতে আছে মুর্শিদাবাদ প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা। সাধারণের জন্য এটি উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।


SAINTHIA TOWN LIBRARY
SAINTHIA
BIRBHUM

কিরীটেশ্বরী মন্দির

জিয়াগঞ্জের জৈন মন্দির

রানী ভবানীর বড়নগর



চারবাংলা মন্দির- টেরাকোটার অপূর্ব নির্দশন

বড়নগর : রানী ভবানীর মন্দির নগরী। এক মন্দিরপল্লী থেকে আর এক মন্দিরপল্লীর উদ্দেশে রওনা হই, প্রকৃতি মাঝে মাঝেই ভীষণ বেশি বৃষ্টি ছড়াচ্ছে। আজিমগঞ্জের ঘিঞ্জি গলি পেরিয়ে নদীপথ ধরে চলেছি। দীর্ঘ সময় নদীর সঙ্গে এভাবে চলা—মনে হল নাগরিক পর্যটকদের এটাই তো একটা বড় পাওয়া। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, সব জায়গাতেই একটা করে মন্দির আছে। পুণ্যের লোভে কষ্ট করে মানুষ সেখানে ওঠে। তারপর দেখে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। মিথ্যে হয়ে যায় ধর্ম। মিথ্যে হয়ে যায় পুণ্য। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য মন কেড়ে নেয়। কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাকে। এই স্থান নির্বাচন পাহাড়ে একটি বড় বিষয়। এই বিষয়টি বিরাটভাবে কাজ করেছিল রানী ভবানীর মধ্যে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। এখানে নদী একটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে। ওপারে আমবাগান। হঠাৎ করে মনে হতে পারে—ওটাই কি পলাশি প্রান্তর—ওখানেই কি ডুবেছিল স্বাধীনতার শেষ সূর্য। না। ওটি সাধকবাগ।

রানী ভবানী। নাটোরের বনলতা সেন আমাদের কাব্যের চৌহদ্দি পেরিয়ে বিশ্বকালীন হয়ে আছে রোমান্টিকতায়। নাটোরের রানী ভবানীও ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় জুড়ে আছে। অল্প বয়সে বিধবা রানী বিশাল রাজত্ব চালিয়েছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপে। এক মেয়ে তারাসুন্দরী। পালিত ছেলে রামকৃষ্ণ। রাজকীয়তার বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকেননি তিনি। ভাগীরথী তীরের এই বড়গরে তৈরি করেছিলেন পবিত্র পুণ্যভূমি। বিরাট এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছিল অসাধারণ কারুকার্যখচিত মন্দিররাজি। বারাণসী তুল্য এই মন্দির নগরী ছিল ভারতবিখ্যাত। শতাধিক শিবমন্দিরের চূড়া দূর-দূরান্ত থেকে দর্শককে টেনে আনত। মন্দিরে মন্দিরে যে পূজারতি চলত সেই কাঁসর-ঘণ্টা-ধ্বনি নদী পেরিয়ে নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তর—পল্লী-জনপদ পেরিয়ে মানুষের কানে পৌঁছত।

এখন সেই রাজা নেই। রানী নেই। নবাব-বাদশাহ্-র আমলও নেই। মনের টানে মানুষ এখন আসবে কোথায়। কোথায় পাবে দু-দণ্ড প্রাণের আরাম, মনের শান্তি। সেই মন্দিররাজি আর নেই। তবু যা আছে, যে কটি আছে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অত্যন্ত সযত্নে তা রক্ষা করছে। দেখে ভাল লাগে। নাটোরের

টেরাকোটা শিল্পীরা বিখ্যাত ছিল। তাদেরই শিল্পকর্মের নমুনা হয়তো এইসব মন্দিরের শিল্পকর্ম। আটচালা বা চারচালা ধাঁচের বাংলার পল্লীর কুটির সদৃশ মন্দিরগুলি এখনও দর্শনীয়।

ভবানীশ্বর শিবমন্দিরটি একটি বিশিষ্ট শিল্পকলার পরিচয় দেয়। চারদিকের বারান্দাপথে নিম্নগামী ছাদ। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত। ১৮ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দিরটি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব শৈলীতে নির্মিত। অষ্টকোণাকৃতি। উল্টানো পদ্মের মতো গম্বুজ বিশিষ্ট। শিরে ফোটা পদ্মের পাপড়ি আট দিকে বিকশিত। আটটি প্রবেশদ্বার। মন্দিরটির টেরাকোটা ও শঙ্খের কাজ দর্শনীয়।

রানী ভবানীর মেয়ে তারাসুন্দরী গোপাল মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি ভগ্নপ্রায়। পাশেই রাজবাড়িতে বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়েছে। লাগোয়া শিবমন্দিরগুলিও ভগ্নপ্রায়। যদিও শিবলিঙ্গ আছে এবং নিত্যপূজা হচ্ছে। রাজরাজেশ্বরী মন্দিরটি ভগ্নপ্রায়। ভেতরে গুদামঘরের মতো একটি ঘরে বেদীপুজো হচ্ছে। মূর্তিটি চুরি যায় কয়েক বছর আগে। পাওয়াও গেছে। জিয়াগঞ্জ থানা থেকে এনে পুজো করতে পারছে না রাজপরিবারের বর্তমান বংশধররা। কারণ নিরাপত্তার অভাব। অবহেলায় পড়ে আছে মূল্যবান কষ্টিপাথরের বরাহমূর্তি। নেই সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। নেই সেই মন্দির। তবে জোড় মন্দির বা চার বাংলা মন্দিররাজি এখনও আছে। আছে অতি সযতনে। সুরক্ষায়। রাজ্য সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষ নজরে এগুলি রক্ষিত হচ্ছে। বংশ পরম্পরায় এই সব মন্দিরের পুরোহিতকুল বা গুরুকুলের লোকেরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে এগুলির সঙ্গে যুক্ত। রানী ভবানীর পালিত ছেলে রাজা রামকৃষ্ণ রায় ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। নানা জায়গায় পঞ্চমুণ্ডির সাধনা করে শেষে এখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সময়ের সেই সিদ্ধ বেদী নানা অলৌকিকতার গল্প ছড়িয়ে বিরাজমান এবং বর্তমানে তা বেগুন খেতের মাঝে। এইভাবেই ধ্বংস পাচ্ছে একের পর এক মন্দির। দেবীমূর্তি, শিলাখণ্ড, তবু যা আছে তাও যে অমূল্য। নাটোরের রানীর ওই আধ্যাত্মিক বিলাস, মন্দিরগাত্রের ওই সূক্ষ্ম, অসাধারণ টেরাকোটার কাজের দু-একটা নমুনা দেখলেই বিস্মিত হতে হয়। এই শিল্প নিপুণতা কত উচ্চস্তরের তাই-ই অবাক হয়ে ভাবতে হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত চার বাংলা মন্দিররাজি হল চারদিকে চারটে মন্দির। রানী ভবানী নির্মিত চারটে মন্দিরের প্রতিটিতে তিনটে করে দরজা এবং তিনটে করে শিবলিঙ্গ। পৌরাণিক কাহিনী ঘিরে টেরাকোটার কাজ। পদ্মের কাজও অনন্যসুন্দর। রাজবাড়িটি আজও আছে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রানী এখানেই দেহত্যাগ করেন। গঙ্গেশ্বর, নাগেশ্বর নানান শিব মন্দির এখনও অক্ষত। ১। চারবাংলা মন্দিরের সামনেই বাঁধানো ঘাট। গঙ্গার অপর পারের অসাধারণ শোভা। সরকারি উদ্যোগে এখানে পর্যটন আবাস গড়া জরুরি। এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে পুণ্যতীর্থ সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া জরুরি। ভগ্ন মন্দির ছাড়াও আছে ভগ্ন প্রাসাদোপম অট্টালিকার অংশ। প্রাণের শান্তি, মনের আরাম, দু-দণ্ডের শান্তি হয়তো এখনও পাওয়া যাবে এই ন্যাটোরের রানীর মন্দিরপল্লীতে। আজিমগঞ্জ থেকে ভাগীরথী বরাবর পথটির সংস্কার দরকার। যানবাহন এবং কিছু প্রয়োজনীয় দোকানপসার প্রয়োজন। প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগ। প্রয়োজন সুশিক্ষিত ইতিহাস-সচেতন গাইড। তৈরি করা যায় রানী ভবানী মিউজিয়াম। রঙিন ফোল্ডার বা বই বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়। পর্যটকদের ইতিহাস সচেতন করার জন্য ইতিহাসের নির্ভুল তথ্যও তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। বাংলার গ্রামে গ্রামান্তে যে উজ্জ্বল ঐতিহ্যময় ইতিহাস একদিন তৈরি হয়েছিল, বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবার দায় কার ? পর্যটন শুধুমাত্র উপভোগের বিষয় নয়। কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টায় সত্যের কাছে পৌঁছতে হয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্যই তো পর্যটন। রানী ভবানী আরও নানা জায়গায় মন্দির স্থাপন করেছেন। কিন্তু বড়নগরের মন্দির তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। পর্যটনের নতুন আলো এবং উদ্যোগে বড়নগর যে অচিরেই আকর্ষণীয় একটি পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠবে সেই সদর্থক ভাবনা নিয়েই চললাম আজিমগঞ্জ হয়ে জিয়াগঞ্জ।

অচেনা মুর্শিদাবাদ

নবাবী মুর্শিদাবাদের বাইরেও পড়ে আছে আর এক মুর্শিদাবাদ। চেনা, অল্প চেনা মুর্শিদাবাদ নয়। একেবারে অচেনা, অজানা মুর্শিদাবাদ দিয়ে শুরু হয়, আমাদের মধ্যবাংলার ঐতিহ্য পর্যটন। ইতিহাসের ধূপছায়া রঙের বিচিত্র ছবি আঁকা হয়তো যায় কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে যে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, সেই পর্যটন মানচিত্রে কী জায়গা পেতে পারে এইসব অবহেলিত ভ্রমণবিন্দু তারই কিছুটা চাক্ষুষ করতে এই বেরিয়ে পড়া।

বহরমপুর থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু এই বেড়িয়ে পড়াটা সহজ হল না। বহরমপুর বা মুর্শিদাবাদে যে পর্যটকেরা আসেন তাঁরা দেখতে যান হাজারদুয়ারির মুর্শিদাবাদকে। বড়জোর তাঁরা যুক্ত করেন কর্ণসুবর্ণ, বড়নগর, আজিমগঞ্জ, কিরীটেশ্বরী ডাহাপাড়াধাম। ফলে অটো রিক্শা বাস বা ট্যাক্সি চালকরাও এইসব নামের সঙ্গে পরিচিত।

গণকর, মণিগ্রাম বা খেরুর—নামগুলো কেউ কেউ শুনেছেন। কেউ বা শোনেননি। কিন্তু সকলের কাছেই বড় বিস্ময় ঠেকে, যখন শোনে আমরা সেখানে বেড়াতে এসেছি। ঝাঁক বেঁধে ঘিরে ধরে অটোওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালারা। তাদের বোঝানই মুশকিল হয়ে যায় যে, আমরা ওসব জায়গায় ভ্রমণে যাব। তাঁদের চেনা মুর্শিদাবাদই আমাদের ঘোরাবেন তাঁরা। কিন্তু কোনভাবেই আমাদের নিবৃত্ত করতে পারেন না। আড়াইশ টাকায় সারাদিনের জন্য গাড়ি রাখা হয়। তেল খরচ আলাদা। ১০ কিমি পিছু ১ লিটার ডিজেল। উঠে তো বসা গেল। ভিড় থেকে গাড়ি বের করে রাস্তার পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়ি থামালেন ড্রাইভার।

এবার বলুন তো, কোথায় যাবেন আপনারা ? তাঁকে বোঝাতে থাকি উদ্দেশ্য। সে খুব যে একটা বুঝতে পেরেছে, তা মনে হয় না। তবু গাড়ি চালাতে থাকে গণকর, মণিগ্রামের দিকে। শেষমেশ শুরু করা গেল নতুন পর্যটন মানচিত্রের খোঁজে যাত্রা। ভাগীরথী ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম। মালদা ১৩৬ কিমি, ফারাক্কা ১০ কিমি দূরে। কিছুদূর যাবার পর ডানদিকে পলসন্ডার দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে গিয়ে ভাবনার জন্য দু-একটা মিনিট দাঁড়ালাম। সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কোনদিকে যাব। পলসন্ডার দিকে আছে কিরীটেশ্বরী মন্দির, আজিমগঞ্জ।

'না, চলুন গণকরের দিকে', দৃঢ়ভাবে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সে কথা জানিয়ে দিলাম।

প্রথমে যাব **সাগরদিঘি**। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে বাস ঢুকছে যে বহরমপুর-সাগরদিঘি-রঘুনাথগঞ্জের রাস্তায় আমরাও সে পথে যাব। জলখাবারের পর্বটা মেটাতে হবে। সাড়ে ৯টা বাজে। মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকান থেকে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। খাবার মতো তেমন কিছু নেই। মিষ্টি সিঙাড়া-নিমকি। গ্রামের দিকের মিষ্টি বড্ড চড়া হয়। খাওয়া যায় না। সিঙ্গারা আর মুড়ি নিয়ে নিলাম। গাড়িতে বসে খাব। বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে। কিছু খাবার কিনে আর কিছু খাবার খেয়ে আমাদের যাত্রা করা উচিত ছিল। গ্রামের ভেতরে কিছু পাওয়া মুশকিল। মুড়ির কেজি ৩০ টাকা। ভারতবর্ষের সর্বত্র কাঁদি কাঁদি কলা চোখে পড়ে। কিন্তু এইসব গ্রামে কোথাও কলা দেখতে পেলাম না। কলাগাছও তেমনভাবে নজরে পড়ে না। এসব গ্রামে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম। সরবরাহ স্বভাবতই কম। সাগরদিঘি গ্রামে ঢুকলাম। ডানে চলে গেছে একটা রাস্তা। চন্দনবাটি শিবমন্দির, বাঁয়ের রাস্তার ধারে সাগরদিঘি। আর একটু এগোলে সাগরদিঘি স্টেশন। জেলার বৃহত্তম এই দিঘিকে ঘিরে অনেক জনশ্রুতি আছে। সম্ভবত ৯৮৮-১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মহত্যার পাপস্খলনের জন্য পালবংশের রাজা প্রথম মহীপাল এই দিঘি খনন করান। দশ ঘাটওয়ালা এই দিঘির প্রতি ঘাটেই ছিল শিবমন্দির। জলের নিচেও আছে এক মন্দির। গরমকালে প্রখর তাপে যখন জল কিছুটা টেনে যায় তখন মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়।

এই বিশাল দিঘিকে ঘিরে অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় পর্যটন আবাস। পিকনিক স্পট, চিলড্রেন পার্ক। করা যায় নানা ধরনের জলক্রীড়ার ব্যবস্থা। শরতের তুঁতে আকাশ। সাদা মেঘের পাহাড়। বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়া প্রকৃতির অপরূপ সবুজ। কী আছে কী নেই-এর হিসাব ভুলিয়ে দেয়। শহরে নাগরিক সভ্যতায় পিষ্ট হওয়া কংক্রিট নগরীর মানুষেরা এসব জায়গায় এসে অনায়াসে দু-একটা দিন বিশ্রাম নিতে পারে। সাগরদিঘির পুব পাড়ে সন্তোষপুর। মুসলিম বসতি। আছে **বড়া পীর সাহেবের দরগা ও পীরতলা**। পীরতলা এখন উচ্চতায় আট-দশ ফুট।


গণকরের মুর্শিদ টিবি

ওপরের তেঁতুলগাছের শেকড়গুলো সাংঘাতিকভাবে বেরিয়ে পড়েছে। পবিত্র স্থান এই পীরতলায় উঠতে হয় জুতো খুলে। সকাল-সাঁঝে এখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়। গাঁয়ের লোকে যে কোনও শুভ কাজে এখানে সিন্নি চড়ায়। হিন্দুদের শুভ অনুষ্ঠানও পীরবাবার অনুমতি নিয়ে এখান থেকে শুরু হত। এখনও হিন্দুরা এখানে সিন্নি চড়ায়। কবে থেকে এই পীরতলা দেখছেন—গ্রামের প্রবীণ লোকদের জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া মুশকিল। 'এই ধরেন না কেন বাবার বয়স হল গিয়ে একশ, দাদার ষাট, আমার পঞ্চাশ ; তা আমার বাবার বাবাও এই পীরতলা দেখেছে—তা এবার হিসাব করেন।' অমন জটিল সিঁড়িভাঙা অঙ্ক কষতে শিখিনি। দেখে তো মনে হল, পঞ্চাশ কেন সত্তর পার হয়ে গেছে। হোসেন মিঞা বলে চলে, 'এক দৌড়ে এই পীরতলায় উঠতে পারতাম না। সে পীরতলাতো হারিয়ে গেছে। এই পীরতলা থেকে দেখা যেত লালবাগ বাজার, দেখা যেত নবাবের ঘড়ি।'

ক্রমশ বসে যাচ্ছে পীরতলার এই ছোট পাহাড়। ধসে যাচ্ছে মাটি। ডানহাতি রাস্তায় গাড়ি করে চন্দনবাটি যাওয়া যাবে না ভেবে এগিয়ে গেছিলাম। আবার ফিরে চললাম। পাল রাজার আমলে চন্দনবাটি শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশালকায় এই শিবকে ঘিরে শিবরাত্রিতে বিশাল উৎসব হয়। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে।

সাগরদিঘি-রঘুনাথগঞ্জের বাসরাস্তা ধরে **গণকরে** পৌঁছলাম। গণকর স্টেশন থেকেও এখানে আসা যায়। গণকর গ্রাম। কোনও কোনও বাজারি ভ্রমণ সংক্রান্ত বইতে, এই গণকর ও মণিগ্রামকে 'ম্যুজিয়ম নগরী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অযথা অতিরঞ্জন পর্যটককে বিপদে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

বাস রাস্তার পাশে বড় বেদী দেখে গাড়ি থামালাম। দুজন গ্রামবাসী গাছতলে বসে। ওটা কোনও পীরতলা নয়। কালীতলা, রক্ষাকালী পুজো হয়। রাস্তার বিপরীতে কিছু দূরে একটি নাতিউচ্চ ঢিবি দেখিয়ে বলল, ওটি একটি পাহাড় ছিল। ওখানে ছিল রাজবাড়ি। গ্রামে প্রবেশের বাঁদিকের এই ঢিবিটি মুর্শিদকুলি খাঁর ঢিবি বা 'মুসুরঢিবি' নামে খ্যাত। এ অঞ্চলে নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে। গ্রামের ভেতর দিকে আরও ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ কিছু ছিল। ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। 'ভীমের গদা'র জন্য বিখ্যাত অঞ্চল এখন ভিডিও হলের জন্য বিখ্যাত হচ্ছে। ইতিহাসমুখর গণকরে এখন ধ্বংসাবশেষও নিশ্চি

গণকরের গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরে আবার বাস রাস্তায় এসে পড়লাম। কিছু দূর গিয়ে মণিগ্রাম। পথের পাশেই গর্গ মুনির আশ্রম। একানা চাঁদপাড়ায় এখনও দেখা যায় হুসেন শাহের আমলের পাথর সজ্জিত আছে। বাস রাস্তা ধরে কিছুটা গেলাম। তারপর আবার বাঁদিকে ঢুকলাম। মণিগ্রাম একটি অপরূপ সুন্দরী গ্রাম। বহরমপুর থেকে ভাগীরথী ব্রিজ পেরোতেই চোখে পড়েছিল এই অঞ্চলের ভূমি অন্যরকমের। মাঝে মাঝেই উঁচু নিচু। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখতে গেলে মালভূমির শুরু হচ্ছে। সামান্য দূরে বীরভূম। প্রকৃতিও বীরভূমের মতো। চারচালা মাটির দোতলা বাড়ি। আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত। দূরে তালশ্রেণী। খেতে সাদা বক। লাল মোরামের রাস্তা। তুঁতে আকাশে সাদা মেঘের বাহার। বর্ষার জলে অপরূপা সবুজের রূপসী সমুদ্র।

ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষের খোঁজে গ্রাম-প্রান্তর ছুটে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, গ্রামের মানুষ ইতিহাস অচেতন। তাঁরা জানেই না যে, ইতিহাসটা জানতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে যখন সারা বিশ্বে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। তখনও এইসব গ্রামে আগের প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে তথ্যের আদানপ্রদানের সেই প্রথাও আর নেই। কি আছে তার গ্রামে সে নিজেও জানে না। শহুরে মানুষ দেখলেই দলবেঁধে এসে প্রশ্ন করে, 'বাড়ি কুথা', মুর্শিদাবাদের সেই চেনা সুরে। নিজের গ্রামের ইতিহাসটাই অজানা অচেনা।

কিছু দূরে দূরে পীরতলা। উঁচু ঢিপির ওপর তেঁতুলগাছ। এইসব পীরতলাকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প আছে। কোনওটা এক রাতে তৈরি। কোনওটা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা। মণিগ্রামেও এমন এক পীরতলায় কিছু সময় কাটালাম আমরা। পাশেই কয়েক ঘর মুসলিম বসতি। গ্রামে হাট-বাজার নেই। সাধারণ অসুখ-বিসুখে পীরতলাই ভরসা। সাগরদিঘি, নয় জঙ্গিপুর—বড় কোনও প্রয়োজনে। থাকার জমি দিয়েছে সরকার। কাজ কামও তেমন মেলে না।

সুন্দরী মণিগ্রামে অনায়াসেই বিশ্রামাগার তৈরি করা যায়। এ গ্রামের সৌন্দর্যই বিনিয়োগীকৃত হতে পারে। প্রকৃতির মাঝে একটু নিরিবিলিতে থাকার জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় পর্যটন কেন্দ্র। ধূসর ইতিহাসের



সুন্দরী মণিগ্রাম



পথের ধারে বন্যেশ্বর মন্দির



মোরগ্রামের পথের ধারে ছড়িয়ে আছে এ রকম অসংখ্য ভগ্ন দেব দেবীর মূর্তি

মুর্শিদাবাদ নিবন্ধের সমস্ত ছবি - কাজল বিশ্বাস

মায়াকুহকে আচ্ছন্ন করে রাখার দিন শেষ। এসব গ্রামকে নিয়ে যদি ভাবতেই হয় তবে অন্য ভাবেই ভাবা উচিত।

আমাদের গাড়ির চালক বারবার **মির্জাপুরের** কথা বলছিল। মণিগ্রাম ছেড়ে চললাম মির্জাপুর। ঘরে ঘরে সিল্কের শাড়ি বোনা হচ্ছে। বিখ্যাত মুর্শিদাবাদী সিল্কের জন্য বিখ্যাত এই গ্রাম। রেললাইন পেরোতেই চোখে পড়ল গ্রামের বড় পাকা দালান। দেখেই বোঝা যায় এখানে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত। কলকাতায় বড় বড় দোকানে সিল্ক-শাড়ি পাঠায় এরা। মির্জাপুর থেকে এবার আমাদের ফেরার পালা। বর্ষায় রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। সময় সংক্ষেপের জন্য ওই রাস্তাতেই যেতে হল। কিছু পরে পাকা রাস্তা পেলাম। এবারের গন্তব্য **খেরুর বা খেরুল।** সেখদিঘির ধারে দাঁড়ালাম। বিরাট দিঘি। এখানেও প্রকৃতি অসাধারণ। দিঘির পারে উঁচু নিচু জমি। কিছুটা প্রশস্ত জায়গা আছে। সেখানে গোর দেওয়া হয়। দিঘির পাড়ে বিস্তৃত অঞ্চল পীরতলা। ওপরে উঠতে যাব, একঝাঁক কচিকাঁচা চিৎকার করে উঠল, 'জুতো খুলে জুতো খুলে'।

খেরুরে আছে টেরাকোটার কাজ করা মসজিদ। রাস্তা খারাপ। বড় গাড়ি যাবে না। ভ্যান রিকশায় যাওয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টি নামায় যাওয়া গেল না। টেরাকোটার মসজিদ—আর কোথায় আছে জানি না। তবু মনে হল—খেরুরে আর একবার আসতে হবে, আবার এত পথ পাড়ি দিতে হবে টেরাকোটার মসজিদ দেখার জন্যই।

ফেরার পথে **মোরগ্রাম।** ডানদিকে কিছুদূর গাড়ি গেল। প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। টেরাকোটার কাজ করা দুটি শিবমন্দির। নীলকণ্ঠেশ্বর আর প্রাণেশ্বর। এখনও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট। তবে তেমন দ্রষ্টব্য কিছু নয়। এসব গ্রামে বর্গীর আক্রমণের চিহ্ন এখনও ছড়ানো। জোড়া শিবমন্দির সংলগ্ন চাতালে এবং আশেপাশে পথের ধারে এখনও নানা আকারের পাথর এবং খণ্ড খণ্ড দেব-দেবী মূর্তি নিয়মিত পূজিত হচ্ছেন। মন্দিরচাতালে একটি বেদীর ওপর এমন অনেক মূর্তি এবং একটি কারুকাজ করা বড় সাদা শঙ্খ সাজানো আছে। রোজ পূজিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে চুরি করে শঙ্খটি নিয়ে যায় একজন। কিন্তু ঘরে রাখতে পারে না।



মোরগ্রামের জগন্নাথ বিগ্রহ

ফিরিয়ে দিয়ে যায়। মূল্যবান পাথরের এই সব খণ্ডিত দেব-দেবী মূর্তি পুরনো ইতিহাসের দিকে আমাদের মন টানে। বর্গী হামলার স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে।

আছে **বনেশ্বর শিবমন্দির।** বনের মধ্যে এক গোয়ালা শিব আবিষ্কার করেন। এই শিব খুব জাগ্রত। শিবরাত্রিতে এখানে চার দিনের মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। সামনের দধি সাগরের চারপাশে বসে এই মেলা। মোরগ্রামের **জগন্নাথ আখড়া** প্রায় চারশ বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে বসে আছে। গ্রামের লোকেরাই ডেকে ডেকে দেখাতে নিয়ে গেল। পুরনো মন্দির বহুদিনই ভেঙে গেছে। পাশে ছোট-ইটের দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে, মাঝখানে নতুন মন্দির। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি বর্ণ বৈচিত্র্যে অভাবনীয় জগন্নাথ মূর্তি। ছোট্ট মন্দিরের দরজা খুললে যে অমন জিনিস দেখা যাবে তা ভাবিনি। এই মূর্তি নিয়ে নানান গল্প আছে। সীতারামদাস মোহান্ত একদিন পথের মধ্যে গোরুর গাড়ি বোঝাই এসব মূর্তি পান। পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে যাবার বাসনা পূর্ণ হয় না। জগন্নাথ স্বয়ং তাঁর কাছে এসে হাজির। সীতারামদাস মূর্তিগুলো নিয়ে এসে মন্দির গড়ে পুজো করতে থাকেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় প্রতিদিন অন্নভোগে মনের খুশি মতো পুজো দিতে পারে না। সীতারামদাস তখন সাহায্যের জন্য যান রানী.....কাছে। সীতারামদাস ছিলেন 'গুদরী সাধক' (ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে যাঁরা সাধনা করেন)। রানী অপমান করে মেরে ধরে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁর ছেঁড়া কাঁথাটা পড়ে থাকে। সেটা থেকে সাংঘাতিক দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। রানী সীতারামের খোঁজে লোক পাঠান। এই দুর্গন্ধযুক্ত কাঁথা কেউ তো সরাতে চায় না। অবশেষে সীতারামদাসকে ধরে আনা হয়। রানী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ঠাকুরের জন্য কি তাঁর চাই। সীতারামদাস বলেন, এই দুর্গন্ধযুক্ত কাঁথা যতটা জায়গা নেবে ততটা জমি চাই। কাঁথা জায়গা নেয় ৩৬৫ বিঘা। ততটা জমিই রানী সীতারামদাসকে দেন। প্রতিদিন ওই এক বিঘা জমিতে যা ধান ফলত তা দিয়ে ভোগ হত। সে জমি নেই। ধান নেই। বড় কায়ক্লেশে মূর্তিগুলোকে আগলে রেখেছেন মোহান্ত পরিবারের নবকুমার দাস ও তাঁর স্ত্রী অর্চনা দাস। নবকুমার দাসের বড় ভাই কর্মসূত্রে শিলিগুড়ি থাকেন। তাঁর হেফাজতেই আছে এই মন্দির সংক্রান্ত নানান দলিল এবং সীতারামদাস মোহান্তর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। মোহান্ত বংশের কেউ পুরী যেতে পারবেন না। এমনই নিষেধ আছে। নিষেধ অমান্য করে পুরী গিয়েছিলেন সীতারামদাস। ফিরে এসে এমনভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে নিজের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আর ঢুকতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওই বংশের কেউ পুরীর জগন্নাথ দর্শনে যাবার কথাও ভাবতে পারেন না। রথযাত্রায় এখানে বিরাট উৎসব হয়। দূর থেকে লোক আসে। কিন্তু আগের সেই বৈভব আর নেই। বড় বেশি ম্লান আলোকে পড়ে আছে মোরগ্রামের এই জগন্নাথ মন্দির।

ঐতিহ্যের আলোকে জৌগ্রাম ও কুলিনগ্রাম

রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

জৌগ্রাম

বর্ধমান জেলার অতীত ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। রাঢ় বঙ্গের ইতিহাস অসামান্যভাবে ধরা দিতে পারে যদি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের আলোকে তার সঠিক আলোচনা হয়। বর্ধমান জেলার প্রাচীনতম নগর সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ যে সমস্ত স্থানগুলি আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিলাভ করেছে তাদের মধ্যে জৌগ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। এখানকার অতীত দিনের মন্দির এবং মাজারগুলি আজও ইতিহাসের নিরিখে এক গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষর বহন করে চলছে। বর্ধমান স্টেশন থেকে কর্ড লাইনে জৌগ্রাম। আবার হাওড়া স্টেশন থেকে কর্ড লাইনে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে জৌগ্রাম স্টেশনে নেমে হাঁটা পথে দুই কিমি গেলেই জৌগ্রামের মধ্যে পৌঁছানো যাবে। শস্যশ্যামলা গ্রামটির শোভা অতীব সুন্দর। এই গ্রামটির নাম নিয়ে নানা প্রবাদ আছে, কেউ কেউ বলেন পূর্বে এই গ্রামে এক মস্ত সন্ন্যাসী বা যোগীর বাস ছিল, সেই থেকে এর নাম জৌগ্রাম আবার কেউ বলেন আগে নাকি নাম ছিল যোগগ্রাম। পরে অপভ্রংশে জৌগ্রাম হয়েছে। গ্রামের মধ্যে চাষাপাড়ায় বদর সাহেবের সমাধি মন্দির খুবই বিখ্যাত। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছেলেমেয়ের অসুখবিসুখে মানত করেন আবার মানত, শোধও করেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে। এটি একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র। অনেকে অনুমান করেন এই গ্রামের পাশ দিয়ে কোনও এক সময় এক প্রবল স্রোতা নদী প্রবাহিত ছিল কারণ ঝড় তুফানে নদীপথে যাতায়াতকারী মাঝি-মাল্লারা নৌকাডুবি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বদর সাহেবের শরণাপন্ন হতেন এবং মানসিক করতেন। বদর সাহেবের সমাধির আজ জীর্ণ শীর্ণ দশা কোনক্রমে শেষতম অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। খুব যত্ন করে খুঁজলে দক্ষিণমুখী এই গৃহের দেওয়ালে টেরাকোটার ফুল দেখা যায়। মনে হয় সারা গায়েই আগে পোড়ামাটির কাজ ছিল। সারা বৎসরই ভক্তজনের দেওয়া মানসিকের অসংখ্য মাটির ঘোড়া দেখা যাবে ভাঙা স্তূপে। এখানে গ্রামের কোনও গরু দুধ না দিলে বা ছোট ছেলেমেয়ের অসুখ নিরাময়ের জন্য মানসিক করা হয়।

জৌগ্রামের সব থেকে প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য মন্দির হল জলেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দিরের সুউচ্চ চূড়ো বহুদূর থেকেও দেখা যায় খ্রিস্টীয় দশম শতকের কোনও এক সময়ে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন মন্দিরের আমূল সংস্কার হয়েছিল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আগের মেঘ দেউল আকার থেকে বদলিয়ে জটা দেউলের আকার দেওয়া হয়। জনশ্রুতি আছে মন্দিরটি বনজঙ্গলে ঢাকা হয়ে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়েছিল। কামদেব ঠাকুর নামে এক বহিরাগত সংসারত্যাগী সাধক জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরটি আবিষ্কার করেন। একটি উঁচু ঢিবির উপর মন্দিরটি অবস্থিত। ফলে এর উচ্চতা আরও বেশি মনে হয়। চারপাশে সরু ইটে তৈরি সুবিশাল দরদালান হয়তো কোনও কালে ছিল। কারণ এখনও এর ভিতর গাঁথনি দেখা যায়। মন্দিরটি পুরোপুরি ইট ও সুরকির গাঁথনিতে তৈরি। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে উঁচু উঁচু ছয়টি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হয় মন্দিরে। মন্দিরের সামনে বারান্দা ও তিনদিকে খোলা রক আছে। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ। ইনিই জলেশ্বর শিব। জলেশ্বর শিবের মন্দির প্রাঙ্গণে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। শোনা যায় কিছু সাধক এই আসনে বসে ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রতিদিন শিবের পুজো হয় মহা আড়ম্বরে। সাধারণত সন্তান কামনায়, শিশুর উপর

বর্ধমান

জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন দামোদর নদের তীরের এই শহরে। তারই নামানুসারে স্থানের নাম বর্ধমান। একদিনের ভ্রমণে অনায়াসেই বেরিয়ে পড়া যায় বর্ধমানের উদ্দেশে। রাত্রে থাকার নানা ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বর্ধমানে ছিল জমিদারি প্রথা। রাজকীয় সেই জমিদারিত্বের নানান নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সারা জেলাতেই। বিজয়তোরণ পেরিয়ে রাজপ্রাসাদ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। পির বাহারামে আছে ফকির সাহেব এবং শের আফগানের সমাধি। কাঞ্চননগরের কঙ্কালীকালী, বোরহাটে কমলাকান্তের সাধনপীঠ, আলমগঞ্জে বর্ধমানেশ্বর শিব, নবাবহাটায় ১০৮ শিবমন্দির অবশ্যই দ্রষ্টব্য। এখানকার তারামণ্ডলটিও দেখার মতন। আছে বিজ্ঞান কেন্দ্র।

বর্ধমানের কালনা বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মে বিশ্বাসীদের তীর্থক্ষেত্র। এটি দেবী অম্বিকার নামে অম্বিকা কালনা নামে খ্যাত। একদিনের ভ্রমণে কালনা আকর্ষণীয় ভ্রমণবিন্দু।

নিজস্ব প্রতিবেদক

অপদেবতার ভর ও কিছু ব্যাধি নিরাময়ের জন্য জলেশ্বর শিবের কাছে পুজো দেওয়া হয়। দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বিশেষ পুজো হয়। এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ ও বরুণ মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা শিবলিঙ্গের উপর কলসি কলসি জল ঢালেন। দামোদরের ক্যানেলের জল প্রচুর পাওয়া যায় এবং চাষবাস করতে কোনও অসুবিধা বর্তমানে হয় না বলে জলেশ্বর শিবকে আর জল ঢেলে বিব্রত করা হয় না। তবে বিশ্বাস এখনও অটুট রয়েছে গ্রামে। কারণ প্রবল খরায় কয়েক বৎসর আগে চণ্ডীপাঠ ও জল ঢালা চলেছিল। ফাগুন মাসে শিবরাত্রির সময় এখানে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয় প্রতি বৎসর। শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরের উত্তর দিকে যে বিরাট দীঘিটি রয়েছে তার সামনের মাঠে মেলা বসে। মেলাটি সুপ্রাচীন। মেলায় প্রায় শ-খানেক দোকান বসে। কৃষিকাজের দ্রব্য থেকে মুখরোচক দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন প্রকারের গৃহ সাজানোর উপকরণ পাওয়া যায় এই মেলাটি থেকে। প্রায় দশ থেকে বারো হাজার মানুষের সমাগম হয় মেলায়। ষোড়শী যুবতীরা উপবাস করে একবস্ত্রে এখানে আসে মনস্কামনা পূরণের জন্যে আবার কেউ বা আসে শিবের মতো বর পাবার ইচ্ছায়।

জলেশ্বর শিব এতদাঞ্চলের জাগ্রত দেবতা। অতীত যুগ থেকে আজও পর্যন্ত খুবই নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসছে এই দেবতার সেবাকার্য। জৌগ্রামে জলেশ্বর শিব ছাড়াও আরও দশ থেকে বারোটি শিব মন্দির আছে। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে টেরাকোটার অপূর্ব কারুকার্য লক্ষ করা যায়। এ ছাড়াও রয়েছে গ্রামের মুক্তকেশী তলায় দুশ বছরের পুরনো মুক্তকেশী কালী। কুলীন-গ্রামের পাশে অবস্থিত জৌগ্রাম। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ও অন্যান্য গবেষকগণ এই জৌগ্রামকে জৈনধর্মের প্রবর্তক ভগবান মহাবীর বর্ধমানের সিদ্ধিলাভের স্থান বলে নির্দেশ করেছেন। এই গ্রামের পাশেই ঋজুকুলা নদী পরে নাম পরিবর্তন করে কংস নাম ধারণ করেছিল। সেই নদী বর্তমানে আর নেই। বিহারের বুদ্ধগয়ার মতো জৌগ্রামের এই মাহাত্ম্য অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এই অনাবিষ্কৃত ইতিহাসকে খুঁজে বের করার জন্য উক্ত গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আজ যা পুরনো ইতিহাস তাতে একদিন ছিল প্রাণ প্রাচুর্য, যৌবনের উদ্দামতা, শক্তির পরাকাষ্ঠা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নবিলাসের সীমাহীন উচ্ছ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়তো তার সামর্থ্য নেই। তাকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়াটাই সাধারণ মানুষের রীতি। চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে, কত শত বছরের ব্যবধানে জীর্ণ এই গ্রামের আজও কেমন করে তার হারানো অতীতের শেষ সামান্য স্মৃতিকে অনুসন্ধিৎসার চোখে অসামান্য করে রেখেছে।

কুলীনগ্রাম

অজানা অতীতকে জানার অদম্য ইচ্ছা প্রতিটি মানুষের চিরকালের। অজানা অতীত স্মৃতি আজ সরব হয়ে উঠেছে। বর্ধমান জেলায় অতীত স্মৃতি বহন করে চলেছে কুলীনগ্রাম। গ্রামটির ধুলো ছড়ানো পথে কত হাসিকান্নার স্মৃতি যে লুণ্ঠিত হয়ে কাঁদে কে তার খোঁজখবর রাখে। হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে মাত্র পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে জৌগ্রাম স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে কিংবা ভ্যান রিক্‌শা করে যাওয়া যায় কুলীনগ্রামে কিংবা হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনে মেমারি স্টেশনে নেমে বাসে করে যাওয়া যায় কুলীনগ্রামে। এই গ্রামটির নামের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই গ্রামে পূর্বে কুলীন সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সম্প্রদায়ের বসবাস বেশি ছিল তাই গ্রামের নাম রাখা হয় কুলীন গ্রাম। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্বে এই এলাকায় কুলের গাছ বেশি থাকায় নাম হয়েছিল কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রামের চতুর্দিকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, শুধু পুরাতাত্ত্বিক বস্তুই নয়—আর্যেতর সংস্কৃতি অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির কিছু উৎসব এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারা বর্তমান। এ বৈষ্ণব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল কয়েক শতাব্দী আগে। রাধাভাবে কৃষ্ণলীলার বিশ্বাসে গড়ে উঠেছিল এই আদি বৈষ্ণব সংস্কৃতি। এখানে রাধা হচ্ছেন ভক্তজন এবং তাঁদের প্রাণনাথ কৃষ্ণ। বিশ্বসংসারের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের গানে সম্পৃক্ত এই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির আঁধার খুঁজতে হলে আসতে হবে বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রামে। বর্ধমান জেলার চুয়াল্লিশটি বৈষ্ণব পাটের অন্যতম প্রধান পাট হল এই কুলীনগ্রাম। প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু কুলীনগ্রাম বহু পূর্ব থেকেই বৈষ্ণবচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এ ছাড়া কুলীনগ্রামে দৃশ্যমান প্রাচীন কীর্তির মধ্যে শিবানীদেবীর মন্দির, গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির, মদনগোপাল জীউর গোপীনাথ মন্দির ও হরিদাস ঠাকুরের মঠ সবিশেষ উল্লেখ করা যায়। বৈষ্ণব জগতে যবন হরিদাস নামে খ্যাত পরম ভক্ত হরিদাস ঠাকুর বহুদিন কুলীনগ্রামে সাধন ভজনে অতিবাহিত করেছিলেন। গ্রামের দক্ষিণাংশে যে নির্জন জায়গায় ঠাকুর হরিদাস সাধন ও চতুর্মাস্যা ব্রত করেছিলেন বর্তমানে সেখানেই হরিদাস ঠাকুরের পাট তৈরি হয়েছে। কুলীনগ্রামে যে বকুল গাছের তলায় হরিদাস জপ করতেন সেখানে চার চালা যুক্ত একটি ছোটো মন্দির রয়েছে। যার নাম এখন হরিদাস গৌড়ীয় মঠ। প্রতি বছর আশ্বিন মাসে একদিনের জন্য তাঁর তিরোধান দিবস পালন করা হয় এবং অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় মঠের বার্ষিক উৎসব হয়। সারাদিনব্যাপী সংকীর্তনে কলকাতা, কাটোয়া, নবদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থান থেকে বহু ভক্তজন অংশগ্রহণ করেন।

কুলীনগ্রামের হাটতলায় দেবী শিবানীর মূর্তিটি বহু প্রাচীন। হরিদাস ঠাকুরের মঠের পিছনে শিবা দীঘি নামে যে বিরাট পুকুরটি আছে, ওই পুকুর থেকেই নাকি আদ্যাশক্তি শিবানীর মূর্তিটি পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি দেখে জানা যায় যে, ৯৬৩ শকে অর্থাৎ ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা। এই মন্দিরটি কালের বিপর্যয়ে ভেঙে গেলে এক মাটির ঘরে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কুলীন গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচয়িতা মালাধর বসু। মালাধর বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা হল শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য যা ড. সুকুমার সেনের মতে ১৪৭৩ থেকে শুরু হয়ে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছিল। আঠারটি প্রধান পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণ একটি বিশিষ্ট পুরাণ। দ্বাদশ স্কন্ধ বা পর্ব, ৩৩২টি অধ্যায় ও ১৮,০০০ শ্লোক সমন্বিত এই ভাগবত পুরাণ (গবেষকদের

মতে যা রচিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে) এর দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাব্য ছন্দে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এ রচনার জন্য তৎকালীন গৌড়ের সুলতান রুকুনউদ্দিন বাবর শাহ মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক—গীতিকবিতার ভাবোচ্ছ্বাস এতে অনুপস্থিত। কিন্তু আন্তরিকতা ও ভক্তির ঐকান্তিকতায় কাব্যটি সাধারণ রচনার অনেক উপরে উঠেছিল।

রচনাটির খ্যাতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মালাধর বসুর সতেরটি পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত পরে সত্যরাজ খান নামে পরিচিত হন। কুলীনগ্রামে অনেক প্রাচীন মন্দির তাঁর স্থাপিত। কুলীনগ্রামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেবমন্দির হল শ্রীমদনগোপাল মন্দির। মন্দিরের ভিতরে প্রথমে শুধু ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো পাথরের মদনগোপালের বিগ্রহ ছিল। পরে এর দুধারে শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতার মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এটি বহু প্রাচীন মন্দির। শোনা যায় শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরে পদার্পণ করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে নাড়ুগোপাল, চণ্ডী, জগদ্ধাত্রী এবং অনেক শালগ্রাম আছে। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে ঝুলন, কার্তিক মাসে রাসোৎসব ও ফাল্গুনে দোল উৎসব তো হয়ই—এ ছাড়া মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথি থেকে সংক্রান্তি অবধি ২০ দিনের 'দর্শনের মেলা' নামে এক বিশেষ উৎসব ও মেলা বসে। এই মেলা উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। মদনগোপাল মন্দিরের সামনে পূর্বদিকে গোপাল দীঘি নামে একটি বিরাট পুকুর আছে। প্রতি বছর ১ মাঘ উত্তরায়ণ উপলক্ষে প্রায় দশ হাজার মানুষ এই দীঘিতে পূর্ণস্নান করেন এবং এই স্নান উপলক্ষে গোপাল দীঘির পাড়ে একদিনের জন্য বিরাট মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়ে থাকে এই মেলা উপলক্ষে। এই গ্রামের আর এক প্রাচীন মন্দির গোপেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে ১৬৬৬ শকে অর্থাৎ ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে কুলীন গ্রামের অন্তর্গত চৈত্যপুর নিবাসী নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কার করান। মন্দিরের মধ্যে প্রায় দেড় হাত লম্বা ও এক হাত উঁচু একটি বৃষ মূর্তি আছে। এই বৃষের গলকম্বলে খোদিত সংস্কৃত শ্লোক থেকে এটুকু বোঝা যায় মালাধর বসুর পুত্র লক্ষ্মীকান্ত এই বৃষের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি এখন জীর্ণ আটচালা-গায়ে পোড়ামাটির কিছু কাজ খুব নজর করলে দেখা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের পটভূমিকায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির আদর্শ রক্ষার প্রেরণায় অনুবাদ সাহিত্যের শুরু। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম নিবাসী দশরথ বসুর ঔরসে মাতা ইন্দুমতীর গর্ভে মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। মালাধর বসু তাঁর কবিত্ব প্রতিভার জন্য গৌড়ের সম্রাটের নিকট থেকে গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয় মালাধরের সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। এটা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মালাধর বসু শ্রীচৈতন্যর পূর্ববর্তী তার কারণ মহাপ্রভু এই কাব্যের রস আস্বাদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রেমধর্মের কাহিনী আজ সেই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রন্থটিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় বিশেষভাবে ভাগবতানুসারী হয়েছিল। অসুর বিজয়ী ও ঐশ্বর্যাভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণের বিজয় যাত্রা অর্থে বিজয় শব্দটি অধিক সঙ্গত। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে কৃষ্ণের বীর্যময় সত্তাই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। কৃষ্ণলীলার অন্যান্য দিকের বহু অংশ বাদ দিয়ে শক্তিময় প্রকট করার মূলে যুগগত প্রয়োজনের প্রতি কবির সজাগ দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। তুর্কী আক্রমণের পর শক্তিহীন ভীতগ্রস্ত জাতির জড়তার মধ্যে কবি কৃষ্ণের বীর্যময় সত্তার রূপ অঙ্কিত করে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, এইখানে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য। প্রবাদ আছে পুরীতে জগন্নাথদেবের রথের পুনর্যাত্রার সময় রথের একটি রজ্জু বা পটডোরী ছিঁড়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব পট্টডোরির ছেঁড়া অংশ রামানন্দ বসুর হাতে দিয়ে বলেন "এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতি বৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ।" সেই থেকে আজ অবধি কুলীনগ্রামের বসু বংশ শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের পট্টডোরি জোগান দিয়ে আসছেন। আজও কুলীন গ্রামের পট্টডোরি না পৌঁছানো অবধি জগন্নাথদেবের রথ টানা শুরু হয় না।

দক্ষিণ দিনাজপুর

ঐতিহাসিক পর্যটনে বানগড়

বালুরঘাট যাওয়ার পথে গঙ্গারামপুর। গঙ্গারামপুর থেকে বাঁদিকে কিছুটা গেলে বাণগড়। ঐতিহাসিক বাণগড়ে ছিল অসুর বংশীয় রাজা বাণের প্রাসাদ। পাশে বইছে পুনর্ভবা নদী। প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ কৌতূহল ও বিস্ময় জাগায়। এই ধ্বংসাবশেষের উপরের দিকে এখনও অবশিষ্ট আছে প্রায় হাজার বছরেরও বেশি পুরানো বৌদ্ধমঠের আকৃতি-বিশিষ্ট স্থাপত্য। এই ধ্বংসাবশেষের প্রাচীনতা নিরূপণে এটি সহায়ক হবে। বাঁধানো একটি স্নানাগারের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। সমতলক্ষেত্র থেকে প্রায় শতাধিক ফুট উচ্চতায় ওই বিশাল আয়তনের জলাধারে পর্যাপ্ত জল সারা বছর কীভাবে সঞ্চিত থাকত তা ভাবার বিষয়। এই অঞ্চলকে ঘিরে নানা লোকশ্রুতি আছে। বাণরাজ-কন্যা উষা এবং শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপাখ্যান আজও এ অঞ্চলের প্রিয় গল্পকথা। মূল ধ্বংসাবশেষের পিছনদিকের বিস্তীর্ণ অংশে অনেকগুলি পুকুর ও পরিখা দেখা যায়। চারটি সুদৃশ্য প্রস্তরস্তম্ভ আছে এক স্থানে। ২০ ফুটের মতো দীর্ঘ এই স্তম্ভগুলি নানা বর্ণের গ্রানাইট পাথরের। এগুলি সেই সময়ের উন্নত শিল্পকলার নিদর্শন। স্তম্ভগুলি অলংকৃতও ছিল। বাণরাজা অসুর বংশীয় ছিলেন। এই শিল্পনিদর্শনকে উন্নত আসুরিক সংস্কৃতিরই পরিচায়ক বলে মনে করেন কেউ কেউ। বাণগড়ের এই মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক নির্দশনটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পরিকাঠামোগত সুবিধার মাধ্যমে এই অঞ্চলটি পশ্চিম দিনাজপুরের অন্যতম ভ্রমণবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

কাটোয়া ঃ একটি সম্ভাবনাময় ভ্রমণকেন্দ্র

তপোময় ঘোষ

'কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত''

—জীবনানন্দ

মধ্যবঙ্গের ঐতিহাসিক শহর কাটোয়া ও তার আশপাশ নিজগুণেই পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন-মানচিত্রে স্থান করে নিতে চলেছে। কলকাতার ১৪৪ কিলোমিটার উত্তরে অজয়-ভাগীরথী-শিবাই নদীর মিলনস্থলে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভূমিতে অবস্থিত এই গ্রাম্য শহরের ঐতিহ্য ও ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ ও মনোগ্রাহী। এখানে পৌঁছতে হাওড়া থেকে ট্রেনে সময় লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা, নবদ্বীপ থেকে এক ঘণ্টা, বোলপুর ও বহরমপুর থেকে দুঘণ্টা করে।

পুবে অভয়ারণ্যের বেথুয়াডহরি, পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের বোলপুর, উত্তরে নবাবের মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুর এবং দক্ষিণে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ও বর্ধমান শহর দিয়ে ঘেরা পরিধির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাটোয়া শহরের অভ্যন্তরে আছে পৌরাণিক কাহিনীর ইন্দ্রাণীনগর, মুসলমান আমলের স্থাপত্য, কেশব ভারতীর কাছে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের স্মারক গৌরাঙ্গ বাড়ি। মাধাই-এর সমাধিক্ষেত্র 'মাধাইতলা' আর খ্রিস্টান মিশনারিদের সমাধি। আর তার আশপাশে বৃহত্তর কাটোয়ায় আছে অসংখ্য ঐতিহ্যপূর্ণ দর্শনীয় জনপদ। ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্বভেদে এবং আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। (১) ঐতিহ্য ও ইতিহাসসমৃদ্ধ স্থান, (২) বৈষ্ণব ধাম ও শাক্ত পীঠ, (৩) সাহিত্যিকদের জন্মস্থান এবং (৪) অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থান। আছে দার্জিলিং-এর টয়ট্রেনের মতো ঘণ্টায় ১৫/২০ কিলোমিটার গতিবেগের ছোটলাইনের ট্রেন; আছে কাঁসা, পিতল, শোলা, তাঁত শিল্পীদের শিল্পগ্রাম।

১ ইতিহাস জোরে জোরে কথা কয়......

"চোখে তার যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার" —জীবনানন্দ

।। মঙ্গলকোট ।।

কাটোয়ার পশ্চিমে ১ ঘণ্টার বাসপথ। অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে (২৩°-৩৬ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°-৫৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থিত এই স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ধমান জেলা তো বটেই, সারা রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নবিস্ময় লুকিয়ে আছে মঙ্গলকোটের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। গবেষকরা অনুমান করছেন মঙ্গলকোটই হল জাতক বর্ণিত 'জেতুত্তর নগরী'। এখানে মৌর্য যুগের পাঞ্চমার্ক মুদ্রাসহ শুঙ্গ ও কুষাণ আমলেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। অনুমান করা হয়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের রাঢ় অভিযানের সঙ্গে মঙ্গলকোটের ইতিহাস সম্পৃক্ত। এছাড়াও গৌড়ের অন্যতম সুলতান হুসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নতুনহাটের কাছে তার ভগ্ন অবস্থা দেখতে পাবেন।



চুপি চরে পরিযায়ী পাখী *ছবি ভি কে যাদব*

কী দেখবেন : সমগ্র জনপদটি অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর একটি অঙ্গ। সামান্য দূরে একেবারে জীবন্ত কবিতার মতো একটি নদী, 'কুনুর' অজয়ে এসে মিশেছে। সেখানে আছে মঙ্গলকাব্যের উজানি নগর, বৈষ্ণব পদকর্তা লোচনদাস এবং পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কোগ্রাম। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হবে। পুরনো হাটের সবটাই প্রত্নবস্তু। গোটা গ্রামটিই একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ। মাটির ও পাকা দেওয়াল, সবই তার সাক্ষী। একটি টিবির কাছে এখনও পাওয়া যায় 'পোড়া চাল'। এখানকার ধূলিকণায় মিশে আছে আক্ষরিক অর্থেই সোনার কুচি। বৃষ্টির পর এখনও গ্রামের বাচ্চারা বালির মধ্যে এই স্বর্ণকণিকা খোঁজার তোড়জোড় শুরু করে। আছে বারোজন মুসলমান সাধক বা আউলিয়ার কবর। সব মিলিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভ্যতার এক অপূর্ব ভগ্নস্তূপ এই রাঢ়ী জনপদটি।

কোথায় থাকবেন : খুব সম্প্রতি মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতি অজয় ও কুনুরের সঙ্গমস্থলে 'অজয়' নামে একটি অতিথি নিবাস নির্মাণ করেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী বংশগোপাল চৌধুরী এর দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। আপনিও স্বাগত।

"যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারী রৌদ্রের দিন" —জীবনানন্দ

।। শাঁখাই ।।

বলা যেতে পারে কাটোয়ারই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ এই গ্রামটি। শুধুমাত্র অজয় এবং শিবাই নদী দিয়ে ঘেরা এই

'পেনিনসুলার' গ্রামটির দৃশ্য অতি মনোরম। খেয়া পার হতে মিনিট পাঁচেক লাগে বড় জোর।

কী দেখবেন : পুরাণ কথিত শঙ্খেশ্বরী (দেবী দুর্গা)র এখানে একটি মন্দির আছে। কথিত আছে এখানে নাকি দেবী দুর্গা শাঁখা পরেছিলেন। এই নিয়ে লোককথাও প্রচলিত আছে। এছাড়াও এখানে বাংলার নবাবরা একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, যা এখনও শাঁখাই দুর্গ নামে পরিচিত। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীরকাশিম প্রমুখ একে ব্যবহার করেছিলেন। দুর্গের চিহ্ন এখন আর তত স্পষ্ট না হলেও 'বজরা ডাঙা' নামক স্থানটি 'বজরা নোঙর' করার চিহ্ন বহন করছে। এখানে এডিস সাহেবের নীলকুঠিও ছিল। বাংলার শ্রেষ্ঠ পাঁচালিকার দাশরথি রায় যৌবনে এই কুঠিতে চাকরি করতেন।

কাটোয়ার যুদ্ধ বলে ইতিহাসে যা প্রসিদ্ধ তা মূলত শাঁখাই-এর যুদ্ধ। বর্তমানে শিবলুনের 'দুলাল বাবা' একটি মনোরম আশ্রম, মন্দির ও সুন্দর অতিথি নিবাস নির্মাণ করেছেন। ইদানীং এই নিবাসটি ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালনা করছেন। এই অতিথি নিবাসের জানলা থেকে অজয় ও গঙ্গার অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখা যাবে। দেখা যাবে পূর্বপাড়ের বল্লভপাড়ার চরের কাশগুচ্ছের দোলন।

"বাণিজ্য বায়ুর হর্ষে কোন একদিন" —জীবনানন্দ

।। দাঁইহাট ।।

বলা যেতে পারে কাটোয়া দাঁইহাট যমজ শহর। বরং দাঁইহাট সপ্তাহখানেকের বড়। কাটোয়ার ইতিহাসই দাঁইহাটের ইতিহাস হলেও পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য কথিত ইন্দ্রাণী নগরীই আজকের দাঁইহাট। মঙ্গলকাব্য থেকে আমরা জানতে পারি এই অঞ্চল ছিল বিভিন্ন সওদাগরদের বাসস্থান তথা বাণিজ্য ঘাঁটি। এখানে বিভিন্ন বণিকের নামে ঘাট এবং হাট আছে। বলা হয়, 'বারো হাট আর তের ঘাট, এই নিয়েই দাঁইহাট'। পানুহাট, পাতাইহাট, আকাইহাট, মণ্ডলহাট, বিকিহাট প্রভৃতি নামাঙ্কিত ঘাটগুলি এখনও ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করছে।

কীভাবে যাবেন হাওড়া কাটোয়া রেলপথে কাটোয়ার আগের স্টেশন দাঁইহাট। কাটোয়ার দক্ষিণ-পূর্বে ১০ মিনিটের রেলপথ আর কুড়ি মিনিটের বাসপথ। কাটোয়ায় নৌকা বা ভাগীরথীর ধারে ধারে রিকশায় গেলেও আপনি দেখতে পাবেন এই সব ঘাট এবং হাটের স্মারকচিহ্ন। কাটোয়া মাটিয়ারী নৌপথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নৌকা ছাড়ে। ভাড়া মাত্র তিন টাকা।

কী দেখবেন দাঁইহাটে মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত তাঁবু খাটিয়েছিলেন। দুর্গাপুজোর মরসুমেই হয়েছিল আলিবর্দীর সঙ্গে তার যুদ্ধ। তার স্থাপিত দুর্গামন্দির এখনও আছে। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ দাঁইহাটে নিজের যে সমাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন তা আজও বিদ্যমান। এছাড়াও আছে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগপর্যায়ে নির্মিত শিবমন্দিরমালা। আছে রাসমেলার ঐতিহ্য।

"কোন এক নগরী ছিল একদিন,
কোন' এক প্রাসাদ ছিল—" —জীবনানন্দ

।। নৈহাটি ।।

প্রাচীন 'নবহট্ট' নামে পরিচিত গঙ্গাতীরবর্তী এই স্থানে সেন রাজাদের 'তাম্রশাসন' আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তাম্রশাসন অনুযায়ী বল্লাল সেনের মা বিলাসীদেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে তার কুলপুরোহিত বাসুদেব শর্মাকে 'বল্লহিট্ট' (বর্তমান বালুটিয়া) গ্রামটি প্রদান করেন। হুসেন শাহের হিন্দু কর্মচারী রূপ ও সনাতন গোস্বামী এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। নদীর অপর পাড়ে ছুটিপুর গ্রামটি ছুটি খাঁ-র নাম অনুসারে। এখানে 'কালারুদ্র' নামক শিবমন্দিরটিকে ঘিরে গাজন উৎসবে নানা অনুষ্ঠান হয়।

কীভাবে যাবেন : শাঁখাই ঘাট থেকে নৌকাপথে যাওয়া যায়, যাওয়া যায় রিকশাতেও। বাস সার্ভিসও আছে।

কী দেখবেন : নৈহাটির লাগোয়া উদ্ধারণপুর গ্রাম। এই গ্রামও বৈষ্ণব সাধক তথা গোপাল উদ্ধারণ দত্তের নামে। এখানে গৌরাঙ্গ বাড়িতে তার সমাধিও বর্তমান। উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত শ্মশানঘাটের পটভূমিকায় লেখা অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এখানে এনায়েতপুরে একটি পুরনো মসজিদ আর কালীমন্দির আছে।

কোথায় থাকবেন উদ্ধারণপুরে লুথেরান সংস্থা নির্মিত একটি বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্র আছে সীতাহাটি পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে। সেখানে থাকার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে। আর খাওয়ার জন্য এখানকার স্থানীয় মানুষ ব্যবস্থা করে দেন। শুকনো কঞ্চি/কাঠির জ্বালানি, থালা-গ্লাস, উনুন তারাই দিয়ে সাহায্য করবেন, আপনি শুধু রেঁধে নেবেন। ভাড়া নেবেন মাথাপিছু ৫ টাকা। পিকনিকের মেজাজে গঙ্গার ধারে রান্না-খাওয়া সেরে বিখ্যাত ঘাটের চাতালে বটবৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিন, কাটোয়ায় ফিরে আসুন।

"অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া" —জীবনানন্দ

।। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড ।।

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি চৈতন্যের চেয়ে বয়সে একটু বড় ছিলেন এবং নবদ্বীপে পড়াশোনা করতেন। তার ভাইপো রঘুনন্দন, বলরাম দাস সহ অন্তত দুশো জন পদকর্তা এই গ্রামে আবির্ভূত হয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য-আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই গ্রামের পূর্বনাম বৈদ্যখণ্ড। এখানে শৈবতীর্থও উল্লেখযোগ্য। 'ভূতনাথ' নামে এক বিখ্যাত শিবমন্দিরও আছে। পাশের গ্রাম জাজিগ্রামেও বৈষ্ণব আমলের নানান নিদর্শন আছে।

কীভাবে যাবেন : বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনের রেলপথে কাটোয়ার পরের স্টেশনই শ্রীখণ্ড। ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে এই রেল চলে। ফলে, একটা অন্যতর আমেজও আপনি উপভোগ করবেন। ঠাকুরবাড়িতে অল্প দক্ষিণায় খেতেও পাবেন।

কোথায় থাকবেন : পাঁচ মিনিট পর পর বাস আছে। কাটোয়া ফিরে আসতে সময় লাগবে দশ মিনিট। তবু যদি থেকে যেতে চান, একটি ডাকবাংলো আছে শ্রীখণ্ডে। পাশেই বনকাপাসি গ্রামে শোলাশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলুন।

"অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে" —জীবনানন্দ

।। কাসেমনগর ।।

হিন্দু-মুসলমানের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র কাটোয়া মহকুমার দূরতম গঞ্জটি। মুসলমান আমলে এ জনপদ বিকাশলাভ করেছিল।

এখানে ২০০ বছরের পুরনো 'বেরাগ্যচাঁদ মন্দির' বলে একটি মন্দির আছে। কাশিয়াড়ার মুসলমান শাসকেরা মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কথিত আছে শ্রীপঞ্চমীর পরের তিথিতে তুলসীদাস, গোপালদাস প্রমুখ তিন ভাই একসঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই কাসেমনগরের পাশেই সোনারবন্দে পুকুরপাড়ে একটি নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষও আছে। কাটোয়া থেকে অন্তত দেড় ঘণ্টার বাস রাস্তা। যদি শ্রীখণ্ড ডাকবাংলোয় রাত কাটান তো নতুনহাট বা গুসকরা লাইনের বাস ধরে নেবেন।

"সামান্য পাখি পাতা ও ফুল" —জীবনানন্দ

।। জ্ঞানদাস কান্দরা ।।

বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্মস্থান কান্দরা অধুনা জ্ঞানদাস কান্দরা নামেই খ্যাত। এই সাধক কবির জন্মস্থান 'সাজিতলা' নামে গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত।

কীভাবে যাবেন কাটোয়া থেকে ছোটলাইন ধরে একঘণ্টার পথ, কারণ গাড়ির গতি মাত্রই ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার। বাসে সময় লাগে চল্লিশ মিনিট।

কী দেখবেন এখানে জ্ঞানদাসের জন্মভিটা ছাড়া আর কিছু দেখার না থাকলেও একটু দক্ষিণে দধিয়া গ্রামে গোপালদাস নামে বৈষ্ণব সাধকের বিখ্যাত আখরা তথা মন্দির আছে। শ্রীপঞ্চমীর পরের সপ্তাহে বিখ্যাত মেলা তথা অন্নক্ষেত্র হয়। কান্দরা থেকে বোলপুর একঘণ্টার বাস দূরত্ব।

।। ঝামটপুর ।।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান শ্রীপাট ঝামটপুর কাটোয়ার ১৫/১৬ কিলোমিটার উত্তরে। এখানে যেতে গেলে কাটোয়া আজিমগঞ্জ সেকশনের রেলে চড়ে ঝামটপুর-বহরান স্টেশনে নেমে হেঁটে বা রিকশায় যেতে হবে। থাকার বা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে শ্রীপাটের সেবাইতদের পূজার প্রসাদ থেকেই। এখানকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে রঙ্গবঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পঞ্চানন্দ) পৈতৃক গ্রাম গঙ্গাটিকুরী গ্রাম।

।। উদ্ধারণপুর ।।

বৈষ্ণব ও শাক্ত তীর্থস্থান উদ্ধারণপুর সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

"গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে
শ্রুতি-বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভাঙে" —জীবনানন্দ

"মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে"
—জীবনানন্দ

।। উজানি-কোগ্রাম ।।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গ্রামটি অনুসন্ধান করতে এসেছিলেন তখন তাঁর 'গাইড' হয়েছিলেন তরুণ কুমুদ মল্লিক। রাখালদাসের অনুসন্ধানের কারণ চৈতন্যের পার্ষদ নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাসের জন্মস্থান এই গ্রামটি। শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যখ্যাত উজানি নগর মঙ্গলকোটের পাশেই। কুনুর আর অজয়ের সঙ্গমস্থলে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছবির মতো এই গ্রামটি। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেছেন, 'বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে/জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।' খুব সম্প্রতি এখানে 'অজয়' নামে একটি পর্যটক আবাস গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেকটা জায়গা আছে, মায়ের মন্দিরে বসুন...
(শাক্তপীঠগুলি দেখুন)
"অভিভূত নৃমুণ্ডের ভীড়" —জীবনানন্দ

।। কেতুগ্রাম-ওষ্ঠহাস ।।

কাটোয়ার ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কেতুগ্রাম একটি শাক্তপীঠ। কথিত আছে রাজা চন্দ্রকেতুর নামানুসারেই কেতুগ্রাম। মোগল আমলে এই পরগনার নাম হয়েছিল মনোহরশাহী পরগনা। এখানে বহুলা দেবী নামে শক্তি মন্দির আছে। গীতাভবন নামক একটি দেখবার জায়গা আছে। থানার পাশে বিরাট একটা পুকুরে নৌ-বাইচ করতে পারেন শৌখিন মানুষরা।

কেতুগ্রামের এক কিলোমিটার পশ্চিমে বিখ্যাত শাক্তপীঠ 'ওষ্ঠহাস' বা 'অট্টহাস' তলা। দেবীর ওষ্ঠ বা ঠোঁট এখানে পড়েছিল। সে তো পুরাণ কথা। বর্তমানে এখানে শিবাই নদীর তীরে একটি সুন্দর উপবন গড়ে উঠেছে। এখানকার নয়ন-মনোহর দৃশ্য যে কোন পর্যটককে আনন্দ দেবে।

কীভাবে যাবেন : কাটোয়া থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে বাসে। নিরোল নামক গ্রামের বাসস্টপে নেমে ভ্যানরিকশা ধরে অট্টহাস। ভাড়া ভ্যানে মাথাপিছু দশ টাকা। বর্তমানে নদীর ওপর একটি সেতু নির্মিত হওয়ায় সারা বছরই সেখানে যাওয়ার সুযোগ বেড়েছে।

কোথায় থাকবেন কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব আছে। কেতুগ্রামের পাশের গ্রাম পুরুলিয়ায় আছে নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের আশ্রয়স্থল। পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করলে থাকতে পারবেন।

" যে ভয়ে যাও মা তুমি
সে পথে যোগাদ্যা আমি।" —জীবনানন্দ

।। ক্ষীরগ্রাম ।।

ক্ষীরগ্রামের যোগ্যাদ্যা শক্তির আরেক নাম। যোগাদ্যার মন্দির বানিয়ে দিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজারা। এখানে কিংবদন্তীর নানা কাহিনী উপকাহিনী ছড়িয়ে আছে। সারা বৈশাখ মাস জুড়ে এখানে উৎসব অনুষ্ঠান হয়।

কীভাবে যাবেন : কাটোয়া-বর্ধমান ন্যারো গেজ রেলে চেপে কৈচর স্টেশনে নামুন। হাঁটাপথে বা ভ্যান রিকশায় চলে যান শক্তিপীঠে। কাটোয়া-বর্ধমান বাস রাস্তার ও কৈচর চটিতে নেমে যেতে পারেন।

মন্দির-মসজিদ-ভাস্কর্য

"অপূর্ব খিলান আর গম্বুজের বেদনাময় রেখা" —জীবনানন্দ

।। শ্রীবাটী ।।

বাংলা মহাভারতের বিখ্যাত কবি কাশীরাম দাসের সিঙ্গি গ্রামের পাশেই শ্রীবাটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির। এই শিবমন্দিরের প্রশংসা সকলকেই করতে হবে। সাক্ষরতা আন্দোলনের বহু পূর্বে (১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে) নির্মিত এই মন্দিরে টেরাকোটা শিল্পীরা খোদাই করে দিয়েছেন পুঁথি পাঠরত এক নারীমূর্তি। কাটোয়া-মন্তেশ্বর-মেমারী বাস রাস্তায় এই গ্রামটি কাটোয়া থেকে ১ ঘণ্টা বাস দূরত্বে।

"আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান" —জীবনানন্দ

।। বেড়া ।।

বেড়া গ্রামেই প্রাচীন ইন্দ্রাণী নগর ইতিহাস বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

সাহিত্যিকদের জন্মস্থান

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস ভনে, শুনে পুণ্যবান" —কাশীরাম দাস

।। সিঙ্গি ।।

মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদকার কাশীরাম দাস-এর পৈতৃক নিবাস। ১৬০২-৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই মহাভারত রচনা করেন। তাঁর বসতবাড়ি এখনও আছে। সিঙ্গি যাওয়ার বাস সরাসরি কাটোয়া থেকে পাওয়া যাবে।

"মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে" —জীবনানন্দ

।। করুই ।।

এই গ্রামে কবিশেখর কালিদাস রায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কাটোয়া থেকে করুই যাওয়ার বাস আছে। সময় লাগে ঘণ্টাখানেক।

"পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টাকা, কালি আর কলমের পর" —জীবনানন্দ

।। মাথরুণ ।।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখানকার হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন। পাশেই খুদরুণে এক বিখ্যাত শৈবতীর্থ বর্তমান। কাটোয়া-নতুনহাট-গুসকরা রুটে মাথরুণ কাটোয়া থেকে চল্লিশ মিনিটের পথ।

"তুল্য দিতে প্রমাণ, মান্ধাতার তুল্যমান শ্রীমান নিবাসী বর্ধমান ভূপতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বাঁধমুড়া, উক্ত ভূপের অধিকার স্থান।" —দাশরথি রায়

।। বাঁধমুড়া ।।

কাটোয়ার দক্ষিণে রিকশা দূরত্বে এই গ্রামে বিখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায় জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মভিটা, স্মৃতিস্তম্ভ এবং একটি মন্দির এখনও আছে। দাশরথি রায়ের নামাঙ্কিত একটি গ্রামীণ পাঠাগারও এখানে আছে। কাটোয়া-করুই বাসরুটে পঞ্চাননতলা স্টপে নামতে হবে। সময় লাগবে পনেরো মিনিট।

।। গঙ্গাটিকরী ।।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পঞ্চানন্দ ঠাকুর নাম নিয়ে 'মেঘনাদ বধ' 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতির প্যারডি 'ছুছুন্দরী বধ' লিখেছিলেন। রাঢ়ের মানুষের মানসিকতার রসে জাড়িয়ে তিনি পরিবেশন করেছিলেন, আরও অনেক ব্যঙ্গ রচনা। ইন্দ্রনাথের বসতবাড়িটি অপূর্ব শিল্প সুষমায় মণ্ডিত। কাটোয়া থেকে ১১ কিমি দূরে গঙ্গাটিকুরী স্টেশনে নেমে এখানে আসা যায়। সময় লাগে পনেরো মিনিট। শাঁখাই ঘাট থেকে বাসেও লাগে পনেরো মিনিট। উদ্ধারণপুর থেকে হাঁটাপথে আধ ঘণ্টা। ইন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এলে সাতমহলা 'ইন্দ্রালয়েই' জুটে যেতে পারে আপনার আবাস। অন্যথায় স্থান পঞ্চায়েত সমিতির অতিথি নিবাসে খোঁজ নেবেন। না হলে কাটোয়া।

"ছিপখান তিন দাঁড়, তিন জন মাল্লা
চৌপর দিন ভর দেয় দূর পাল্লা" —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

।। চুপী ।।

প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মস্থান পূর্বস্থলীর চুপী গ্রাম, কাটোয়া এবং নবদ্বীপের ঠিক মাঝখানে। এখানকার কাষ্ঠশালী গ্রামের গঙ্গার চরে শীতকালে অসংখ্য পাখি আসার কারণে জেলা প্রশাসন একটি পক্ষী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানকার গঙ্গার। এখানেই আছে 'নিদয়ার ঘাট', যেখানে নদিয়ার নিমাই গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ার পথ ধরেছিলেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

।। অজয়-ভাগীরথী-শিবাই-এর সঙ্গমস্থল, তেমুনি... ।।

অজয়-ভাগীরথী-শিবাই নদীর সঙ্গমস্থল এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাহার। শহর কাটোয়ার দুদিকে দুই নদী। 'শ্রাবণী' অতিথি নিবাসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আপনি দেখতে পাবেন এই মনোরম দৃশ্যাবলী।

"আবার বিকেলবেলা মিশে যায় নদীর খাড়িতে" —জীবনানন্দ

।। রঘুপুর-নারায়ণপুরের বিল ।।

ময়ূরাক্ষীর পরিবর্তিত রূপ বাবলা নদী যেখানে ভাগীরথীতে মিশেছে, সেই মৌগ্রামের কাছে এই রঘুপুর-নারায়ণপুরের চর দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ বিলে শীতের পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমায়। এখানে এলে আপনি থাকতে পারবেন 'ওলন্দাজ' বণিকদের 'কুঠির ঘাটে'। কল্যাণপুর গ্রামের মানুষদের আতিথেয়তা পাবেন পূর্ণমাত্রায়।

।। বেগুনকোলা উপদ্বীপ এবং... ।।

সঙ্গমস্থলের আধ কিলোমিটার আগে অজয় ঠিক অশ্বক্ষুরাকৃতির একটি উপদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এই উপদ্বীপেই অবস্থিত 'বেগুনকোলা' গ্রাম। গ্রামটির তিনদিকে অজয় নদী পাক দিয়েছে। এখানে গেলে আপনি আনন্দ পাবেন। দেখতে পাবেন প্রাচীন পিতল শিল্পের ঐতিহ্য। কাটোয়ার মহকুমা শাসকের বাংলোর ঠিক ওপারেই এই উপদ্বীপ। পারাপারে মাত্র পাঁচ মিনিট।

অন্যান্য আকর্ষণ

।। টয় ট্রেনের মতো ছোট লাইন ।।

বিগত শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১৭) চালু হওয়া কাটোয়া-বর্ধমান ও কাটোয়া-আহমদপুর ন্যারো গেজে গাড়ি এখনও ১ ঘণ্টায়

১৫/২০ কিলোমিটার বেগে চলে। এই ট্রেনে চড়ার আমেজই আলাদা। এই ট্রেনে চড়ে আপনি যেতে পারেন তারাশংকরের 'কালাপাহাড়' গল্পের অন্যতম পটভূমি পাঁচুন্দীর হাট ; 'না' এর পটভূমি কীর্ণাহার, জন্মভূমি লাভপুরের মতো স্থানগুলিতে এবং জ্ঞানদাসের কান্দরা। নরহরি কবিরাজের শ্রীখণ্ড।

ট্রেনের সময়সূচি কাটোয়া থেকে আমোদপুর যেতে ৭.১৫ ১১.১৫, ১৫.১৫।

কাটোয়া থেকে বর্ধমান যেতে ওই একই সময়। দু-দশ মিনিট এদিক-ওদিক।

।। কাটোয়ায় ট্যুরিস্ট লজ ।।

শ্রাবণী ভাগীরথী-অজয়-শিবার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাটোয়া পৌরসভা পরিচালিত এই অতিথি নিবাসে সুন্দর থাকার ব্যবস্থা আছে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট এই নিবাসের ভাড়া

সাধারণ দু শয্যাবিশিষ্ট ১০টি কক্ষ, ৪টির ভাড়া ৮০ টাকা
সাধারণ দু শয্যাবিশিষ্ট ১০টি কক্ষ, ৬টির ভাড়া ৬০ টাকা
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দু শয্যাবিশিষ্ট ১টি কক্ষ ভাড়া ৩০০ টাকা
সাধারণ এক শয্যাবিশিষ্ট ১টি কক্ষ ভাড়া ৫৫ টাকা
ডরমিটরি নিচের ও উপরের ১০টি এবং ৭টি ভাড়া ১৫ টাকা, ২০ টাকা।
ফোন নম্বর—(০৩৪৫৩) ৫৫১৩৫

।। কাটোয়া ভ্রমণকে মসৃণ করতে কয়েকটি প্রস্তাব ।।

জলপথ পরিবহণ (সুসজ্জিত নৌকার মাধ্যমে, নিম্নরূপ পথে)

কাটোয়া ↓ বৈষ্ণবতীর্থ, ইতিহাস →	দাঁইহাট ↓ সমাজবাড়ি →	অগ্রদ্বীপ ↓ গোপীনাথ →	পাটুলি ↓ তাঁত
পূর্বস্থলি ↓ চুপী →	নবদ্বীপ ↓ বৈষ্ণবধাম →	কালনা ↓ মন্দিরমালা →	বেথুয়া ↓ অভয়ারণ্য
কাটোয়া ↓ প্রাকৃতিক দৃশ্য →	শাঁখাই ↓ দুর্গ →	উদ্ধারণপুর ↓ মন্দির →	নৈহাটি ↓ প্রত্নবস্তু
নারায়ণপুরের চর ↓ পাখি →	পলাশী ↓ যুদ্ধক্ষেত্র →	মুর্শিদাবাদ ↓ নবাবী ইতিহাস →	

সুন্দরবনের ধাঁচে এইভাবে লঞ্চসার্ভিস চালু করলে পর্যটকরা আকৃষ্ট হবেন।

।। লজ অশোক ।।

কাটোয়ার মধ্যস্থল সার্কাস ময়দানে 'লজ অশোক'-এও আপনি পাবেন আধুনিক পরিষেবা।

সাধারণ ১ শয্যাবিশিষ্ট ভাড়া ১২৫ টাকা
সাধারণ ২ শয্যাবিশিষ্ট ভাড়া ১৫০/২০০ টাকা
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভাড়া ৪৫০ টাকা
ডরমিটরি ভাড়া ৪০ টাকা (প্রতি শয্যা)
ফোন নম্বর—(০৩৪৫৩) ৫৮২৭৮/৫৬৮২৩

।। অন্যান্য পরিষেবা ।।

কাটোয়ার সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও আছে পাঁচটি নার্সিংহোম আছে রেল, টেলিফোন, ফ্যাক্স সহ অন্যান্য পরিষেবার সুযোগ।

।। স্থলপথ পরিবহণ ।। (প্যাকেজ ট্যুর করার জন্য বাস সার্ভিস)

কাটোয়া ↓ ভ্রমণ কেন্দ্র →	বাঁধমুড়া ↓ দাশু রায় →	করুই ↓ কালিদাস রায় →	সিঙ্গি ↓ কাশীরাম দাস
শ্রীবাটী ↓ টেরাকোটা →	মাথরুণ ↓ নজরুল কুমুদরঞ্জন →	মঙ্গলকোট ↓ ইতিহাস প্রত্ন বিস্ময় →	গঙ্গাটিকুরী ↓ সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ
কেতুগ্রাম ↓ শাক্তপীঠ →	জাজিগ্রাম ↓ বৈষ্ণবতীর্থ →	শ্রীখণ্ড ↓ বৈষ্ণবতীর্থ শৈবতীর্থ →	কাসেমনগর ↓ মন্দির-মসজিদ
উজানি-কোগ্রাম ↓ লোচন দাস কুমুদরঞ্জন			

প্রস্তাবিত এই পথে সরকারি/বেসরকারি ট্যুরিস্ট বাস চালালে পর্যটকরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

।। বেগুনকোলা গ্রামটিকে সরিয়ে পর্যটন কেন্দ্র ।।

বেগুনকোলার অধিকাংশ মানুষই গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন। যে কজন আছেন তাঁদের উপযুক্ত পুনর্বাসন দিয়ে গ্রামটির উত্তরে মাত্র ৫০০ মিটার কেটে নদীটিকে সোজা করে দিয়ে একটি ভ্রমণ দ্বীপ হিসাবে বেগুনকোলাকে গড়ে তোলা যেতে পারে।

।। ছোট লাইনের ধারে ধারে ।।

ছোট লাইনের ধারে ধারে কতকগুলি জায়গাকে যেমন, পাঁচুন্দীর আমবাগান, কান্দরার খেলার মাঠ, লাভপুর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতিকে বেছে নিয়ে উদ্যান উপবন ইত্যাদি সৃষ্টি করা। সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

কাটোয়া থেকে বিভিন্ন রুটের বাসের সময়সূচি

অগ্রদ্বীপ
৮.০০, ১২.০০, ১৭.০০

আগরডাঙ্গা
১৪.০৫, ১৪.৪০

আসানসোল
৭.৪০, ১০.০০ (নতুনহাট হয়ে) ১২.০০, ১৩.১০

কুলি / পাঁচথুপি
৫.২৫, ৬.৩৫, ৮.৪০, ৯.২০, ১০.২০, ১০.৫০, ১১.৪০, ১২.১০, ১৩.২০ ১৩.৫৫, ১৪.৩৫, ১৫.০০, ১৫.৩০, ১৬.২০, ১৭.৪০

করুই
৪.৫০, ৫.১০, ৫.৪০, ৬.০০, ৬.৩০, ৬.৫০ ৭.০৫, ৭.৫৫, ৮.৩০, ৮.৪০, ৯.১০, ১০.০০, ১০.২৫, ১০.৪৫, ১১.১০, ১১.৩০, ১২.০০, ১২.৪০, ১৩.১০, ১৩.৪০, ১৪.১০, ১৪.৩৫, ১৫.২৫, ১৫.৪০, ১৭.০০, ১৯.০০

কৃষ্ণনগর / নবদ্বীপ
৬.৩০, ৭.১০, ৭.৩৫, ৭.৫০, ৮.০০, ৮.৩৫, ৯.৪০, ১০.০৫, ১০.২০, ১৩.২০, ১৪.২৫, ১৫.২৫, ১৫.৩৫, ১৫.৪৫, ১৬.৫০, ১৮.০০

কালনা
৮.৪৫

রাণাঘাট
৫.১০, ১২.০৫

নাদনঘাট
১১.২০

সিঙ্গি / গৌড়ডাঙ্গা
৪.৪০, ৬.১০, ৭.২০, ৯.৩০, ১১.১০, ১১.৫০, ১৪.০০, ১৬.৩০, ১৮.৪০

চাকটা
৬.২৫, ৭.১০, ৮.০০, ৯.২০, ১০.৪০, ১১.২৫, ১২.৪০, ১৩.১০, ১৪.১০, ১৫.০৫, ১৫.৫০, ১৭.১০

তারকেশ্বর
৪.৫৫, ১৩.২৫

গুসকরা / নতুনহাট
১৬.২০, ১৬.৫০, ১৮.০০, ৫.৫০, ৬.৩০, ৭.৩০, ৮.২০, ৮.৫০, ৯.২০, ৯.৫০, ১০.২৫, ১০.৫০, ১১.২৫, ১১.৪০, ১২.৩০, ১৩.১০, ১৩.৩০, ১৪.১০, ১৪.৪০, ১৫.০০, ১৫.২০, ১৫.৫০, ১৬.০৫

পাটুলি
১৩.১০, ১৭.৪৫

পালিটা / বাকলসা
৫.৫০, ৭.০০, ৮.৫০, ৯.৫০, ১১.০৫, ১২.০০, ১২.৩০, ১৩.০০, ১৪.৫০, ১৭.০০, ১৮.০০

মালডাঙ্গা
৭.৩০, ১০.১০, ১১.৩৫, ২০.০০

মেমারী
৬.০৫, ৭.০০, ১০.৫০, ১২.৪৫, ১৩.৫০, ১৪.৪৫

সাঁইথিয়া
৬.১০, ১৩.৫০

সিউড়ি
৬.৫০, ১১.৫০, ১২.৫০

বরাকর
৪.৪০, ১১.১০

বোলপুর / কেতুগ্রাম
৭.২০, ৭.৫৫, ৮.২০, ৯.১০, ৯.৪০, ১০.০০, ১২.২০, ১৩.৩০, ১৪.২৫, ১৫.২০, ১৫.৪০

বহরমপুর / কেতুগ্রাম
৬.৫০, ৭.২৫, ৭.৪০, ৮.২০, ৮.৪০, ৯.০৫, ৯.২৫, ৯.৪০, ১০২০, ১১.২০, ১২.২৫, ১৩.২০, ১৫.০০, ১৫.৩০, ১৫.৫০, ১৬.২০, ১৮.০০

বেনাচিতি
৬.৩৫, ১২.৪০, ১৩.৩৫, ১৪.০৫, ১৪.৪০

বর্ধমান-বর্ধমান
৪.২০, ৪.৪০, ৫.০০, ৫.২৫, ৫.৪০, ৬.০০, ৬.২৫, ৬.৩৫, ৬.৪০, ৬.৪৫, ৬.৫৫, ৭.০৫, ৭.১৫, ৭.২০, ৭.২৫, ৭.৩০, ৭.৪০, ৭.৫০, ৭.৫৫, ৮.০৫, ৮.১৫, ৮.২৫, ৮.৩৫, ৮.৪৫, ৮.৫০, ৮.৫৫, ৯.০৫, ৯.১০, ৯.২০, ৯.৩০, ৯.৪০, ৯.৫০, ১০.০০, ১০.০৫, ১০.১৫, ১০.৩৫, ১০.৪০, ১০.৫০, ১১.০০, ১১.০৫, ১১.২০, ১১.৪০, ১১.৫০, ১১.৫৫, ১২.১০, ১২.২৫, ১২.৩৫, ১২.৪৫, ১২.৫৫, ১৩.১০, ১৩.২০, ১৩.৩০, ১৩.৪০, ১৩.৫৫, ১৪.০৫, ১৪.১৫, ১৪.৩৫, ১৪.৪০, ১৪.৪৫, ১৫.০০, ১৫.১৫, ১৫.২৫, ১৫.৪০, ১৫.৫০, ১৬.০০, ১৬.১০, ১৬.২০, ১৬.৩০, ১৬.৪০, ১৬.৫০, ১৭.০৫, ১৭.৪০, ১৮.১০

সরকারি বাসসমূহ :

বর্ধমান : ১৪.২০, ১৫.১৫ দুর্গাপুর / বোলপুর ৭.০০
বারাসত : ১২.০০, মারুট : ৮.০০
মালদা : ১১.৫০, আসানসোল ৫.২০, ৬.১০

বীরভূম

রাঙামাটির পথে পথে



ছোটনাগপুর মালভূমি এসে মিশেছে বীরভূমে। প্রকৃতি তাই এখানে অন্যরকম। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—সব ধর্মই এখানে যেন শিকড় গেড়েছে। নানা ধর্ম, নানা মন্দির, পাঁচ সতীপিঠ—এ জেলাকে একটা অন্য চরিত্র দিয়েছে।

ললাটেশ্বরী মন্দির

রামপুরহাট থেকে বাসে নলহাটি। মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ হয়েও ট্রেন যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ-মোরগ্রাম হয়ে বাসও যাচ্ছে। রামপুরহাট থেকে বাসে ১৬ কিমি দূরে নলহাটি সাঁওতাল পরগনার লাগোয়া। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। অনায়াসেই দু-একটা দিন এসে থাকা যায় এখানে। স্টেশনের পাশে পূর্ত দপ্তরের বাংলো, ললাটেশ্বরী পাহাড়ে স্থানীয় উন্নয়ন দপ্তরের বাংলো, আছে মন্দিরের যাত্রিনিবাস এবং বিভিন্ন .হোটেল।

রেল স্টেশন থেকে যেতে হবে আরও ১ কিমি। ছোট টিলার ঢালে মন্দির। একান্ন পীঠের এক পীঠ। কেউ বলেন, এখানে পড়েছিল সতীর নলা (কনুইয়ের নিম্নভাগ), কেউ বলেন ললাট। তাই মন্দিরটি নলাটেশ্বরী বা ললাটেশ্বরী নামে পরিচিত। আদতে দেবী হচ্ছেন পার্বতী। এক বৃহৎ পাথরখণ্ডই দেবী হিসাবে পূজিতা হচ্ছে। নানা অলংকারে সেই পাথরখণ্ড সজ্জিত।

মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দেবী আবিষ্কার নিয়েও নানা মত। মন্দির প্রতিষ্ঠার আগেও এই পাথরখণ্ড গাছতলায় পূজিতা হতেন। এক মতে, রানী ভবানী মন্দিরটি তৈরি করেন। অন্য মতে, সওদাগরেরা। চারচালা মন্দির। প্রস্রবণ বা গড় কিছুই আর নেই। মন্দিরের বাইরে পঞ্চমুণ্ডির আসন। ঈশান কোণে দেবীর ভৈরব যোগেশ্বর শিবের মন্দির।

টিলার ওপরে শহিদ মাজার শরিফ। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন পীর কেবল আশা। তাঁরই স্মৃতিতে এটি তৈরি। টিলা থেকে দেখা যায় উদয়নালার সেই যুদ্ধ প্রান্তর। মীরকাশিমের সঙ্গে যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশদের।

একই টিলার ওপরে মাজার, মাঝে মন্দির—এও যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র এর মাঝের এক নিমগাছ। মন্দিরমুখী পাতা তেতো আর মাজারমুখী পাতায় সেই তেতো ভাব ততটা নয়।

১৯৬৪ সালে খননকাজের ফলে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন, মধ্য ও প্রস্তরযুগের নানান অস্ত্রশস্ত্র। টিলার পশ্চিমদিকে এগুলি পাওয়া গেছে। কলকাতার যাদুঘরে এগুলি রক্ষিত হচ্ছে।

দিনে দিনে দেখেও ফিরে যাওয়া যায় রামপুরহাট। তবে থাকতে মন্দ লাগবে না।

ভদ্রপুর-আকালিপুর

নলহাটি থেকে নগরার মোড়ে নেমে রিকশা করে কিমি তিনেক গেলেই ভদ্রপুর। এখানেই ছিল মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদবাড়ি। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িতেই

তিনি জন্মান। দেওয়ানখানা ও অন্দরমহলের কিছু অংশ অবশিষ্ট। অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে জরাজীর্ণ প্রাসাদবাড়ি। ব্রাহ্মণী নদীর-তীরে আছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশমকুঠি। বাসস্ট্যান্ডের কাছে ভদ্রকালীর মন্দির। নানান গল্প থাকলেও, সম্ভবত রানী ভবানীই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত। বর্গীর আক্রমণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা যায়। খণ্ডিতা দেবীই পূজিতা হচ্ছেন। ভদ্রকালীর নামেই ভদ্রপুর।

আকালিপুর দেবী আকালির মন্দিরটিও দ্রষ্টব্য। মহারাজ নন্দকুমার স্বপ্নে যে মূর্তি দেখেন, সেই মূর্তিই রূপ পেয়েছে। এই জগন্মাতা শ্রীশ্রীগুহ্যকালিকার মূর্তি খুব বৈচিত্র্যময়। সাপের ওপর দেবী অধিষ্ঠাত্রী, সর্পাভরণা দ্বিভুজা এই কালীমূর্তি বরাভয়দায়িনী। শ্মশানবাসিনী দেবী মন্দিরে থাকতে চান না। তাই আবার স্বপ্ন দেখান। মন্দির নির্মাণ স্থগিত হয়ে যায়। নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাস বাবার নির্দেশে তান্ত্রিক মতে দেবী প্রতিষ্ঠা করে মন্দির তৈরি করছিলেন। অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরটি অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। এর দেওয়াল নির্মাণের সময়ই ফেটে যায়। কেউ কেউ বলেন, নন্দকুমারকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়, সেই সময় দেওয়ালটি ফেটে যায় প্রতিবাদস্বরূপ। একই গল্প বলা হয় কিরীটেশ্বরীর মন্দির চত্বরে নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ভাঙা দেওয়াল দেখিয়ে। দক্ষিণে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। আছে মহাশ্মশান। গ্রামের উত্তরে ষষ্ঠীতলা। এখানে আছে কিছু প্রাচীন মূর্তি। ভদ্রপুর-আকালিপুর থেকে ১৬ কিমি গিয়ে রামপুরহাট পৌঁছে চলে যাওয়া যায় তারাপীঠ বা বক্রেশ্বর অথবা মল্লারপুর-সাঁইথিয়া।

মল্লারপুর

রামপুরহাট-সাঁইথিয়া পথের মাঝে মল্লারপুর। তারাপীঠ থেকেও বাসে যাওয়া যায় মল্লারপুর। মল্লারপুর অতীতে যে কত সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিবগঞ্জে এর মন্দির পল্লী দেখে। মল্লেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করে চারচালা মন্দির। ২৫টি মন্দিরের এই দর্শনীয় পল্লী তৈরি হয় আনুমানিক ১২-১৩ শতকে। পুবে শিবপাহাড়ি পাহাড়। পুবের মন্দিরগুলির কারুকার্য এখনও দেখার। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে।

মল্লারপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে অতীতের নন্দীপুর, বর্তমানের সাঁইথিয়া। এখানে সতীর কণ্ঠনালী বা কণ্ঠহার পড়েছিল বলে কথিত। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তৈরি হয় নন্দকেশ্বরী মন্দির। ত্রিকোণ শিলাখণ্ডই দেবী হিসাবে পূজিতা হন। এছাড়া অনেক দেবদেবী মূর্তি আছে। দেবীর ভৈরবি নন্দীকেশ্বর গাছের কোটরে শিবজ্ঞানে পূজিত হন। বিজয়া দশমীতে বড় উৎসব হয়। পূর্ত দপ্তরের বাংলো, প্রাইভেট হোটেল ছাড়াও আছে নন্দীকেশ্বরী তীর্থাশ্রম।

তারাপীঠ

রামপুরহাট থেকে বাসে তারাপীঠ। দূরত্ব ১৯ কিমি। কলকাতা থেকেও বাস যাচ্ছে ২৯৪ কিমি। রামপুরহাটে জেলা পরিষদ ও সেচ দপ্তরের বাংলো আছে। আছে নানান হোটেল। তারাপীঠেও আছে নানা হোটেল, ধরমশালা।

তারামায়ের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। ১২২৫ বঙ্গাব্দে নতুন মন্দিরটি তৈরি হয়। উঁচু ভিতের ওপর টেরাকোটার আধচালা মন্দির। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী যেমন টেরাকোটায় মূর্ত, তেমনিই সপরিবারে মহিষাসুরমর্দিনী হাজির। আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী। অষ্টকোণাকৃতি চণ্ডীমণ্ডপ। এখানকার কালী 'তারা মা' নামে খ্যাত। দেবীর মুখমণ্ডলটিই দেখা যায়। কষ্টিপাথরের মহাকালীর স্তন্যপানরত মহাকাল মূর্তি রাত্রিবেলা বিশেষ ব্যবস্থায় দর্শন মেলে।

জীয়ৎকুণ্ড নামে পবিত্র দিঘিটি তারামন্দিরের উত্তরদিকে। এখানকার মহাশ্মশানটি এখনও বিখ্যাত। সারা শ্মশান জুড়ে উঁচু উঁচু ঢিবি। ওইসব ঢিবির তলায় মৃতদেহ আছে। তান্ত্রিকসাধনার এই পীঠস্থান সাধারণ পর্যটকদের কাছে সন্ধ্যের পর কিছুটা অন্যরকম হয়ে পড়ে। ২ শ্রাবণ প্রতি বছর বামাক্ষ্যাপার তিরোধান উৎসব হয়। আশ্বিন মাসের কোজাগরি পূর্ণিমায় তারামায়ের বার্ষিক উৎসব ও চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে উৎসব হয়।

বশিষ্ঠ এবং বামাক্ষ্যাপার এই সিদ্ধপীঠ সতীপীঠও। সতীর উর্ধ্বনেত্রমণি এখানে পড়েছিল বলে কথিত। নানা সাধক এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখনও অনেকে সে প্রচেষ্টায় এখানে আসেন।

একচক্রাগ্রাম

রামায়ণ-মহাভারতের গল্পের সঙ্গে জুড়ে আছে বাংলার অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল। এমনই অনেক গল্প জড়িয়ে আছে তারাপীঠের কিমি সাতেক দূরে একচক্রাগ্রামকে কেন্দ্র করে। বকরাক্ষসের রাজত্ব ছিল এই গ্রামে। পাণ্ডবতলা জায়গটিকে দেখিয়ে বলা হয়— অজ্ঞাতবাসের কালে পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণ সেজে এখানে ছিল। পাশেই অসুরালয় গ্রাম। এই গ্রামেই নাকি হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন ভীম। রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেবও এসেছিলেন এ গ্রামে। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান বীরচন্দ্রপুরের কাছে গর্ভাবাস। পুত্র বীরভদ্র পিতার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জন্য মন্দির তৈরি করেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা বলরাম আমাদের পরিচিত। কথিত আছে, এই বলরামের অবতার হিসেবে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নানা তীর্থে ঘুরে নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। এই গর্ভাবাস বৈষ্ণবদের কাছে এক পরমতীর্থ। শ্রীকৃষ্ণের দুপাশে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের মাতা বসুধা এবং বিমাতা জাহ্নবীও শ্রীরাধিকাজ্ঞানে পূজা পাচ্ছেন। নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই পণ্ডিত। তার কুলদেবতা দশভুজা মহিষমর্দিনীও আছে মন্দিরে। বীরভদ্রের নামানুসারে এখন বীরচন্দ্রপুর নাম হয়েছে। বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভাবাসে নানান মন্দিরের জন্য বৈষ্ণবদের কাছে চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। নিত্যানন্দের জন্মতিথিতে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে দোল এবং রাসে বড়ো উৎসব হয়।

ডাবুক

বৈষ্ণব তীর্থ ছাড়িয়ে ৩ কিমি যেতেই শৈবতীর্থ ডাবুক। প্রাচীন মন্দির ভেঙে গেলে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ৮০ ফুট উঁচু অনাদি শিবলিঙ্গের মন্দিরটি তৈরি করেন ভৈলামানন্দ স্বামী। কোন রাজা বা রানির দানে নয়, ভিক্ষালব্ধ অর্থে এটি তৈরি। এখানে থাকারও ব্যবস্থা আছে। শিবরাত্রিতে মেলা বসে। নানা দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে লোক আসে দলবেঁধে।

কোটাপুর

কথিত আছে, এই কোটাপুরেই অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবেরা বাস

করেছিলেন। উঁচু ঢিবির ওপর মদনেশ্বর শিবমন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদীপের আকারে বিরাট পাথরখণ্ড। এটিকে বলা হয় কুন্তীর প্রদীপ। মহাভারতের নানাকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে নানা স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে এ সব গ্রামে। আছে বকাসুরের মালাইচাকি, ৭ কিমি দূরের অসুরালয়ে অসুরডাঙ্গায় রাক্ষসদের বাস ছিল সেকালে। অতীতের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে এসব গ্রামে।

নানুর

বোলপুর বা শান্তিনিকেতন থেকে যাওয়া যায় বৈষ্ণব কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের নানুর। নানোর থেকে আজ চণ্ডীদাস-নানুর নামে পরিচিত। স্থানীয় লোক শুধু নানুরই বলে। গবেষকরা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হিসেবে নানুরকে স্বীকৃতি দিতে নানা মতের উতোর-চাপান চালিয়েছেন, কিন্তু এর আকাশে-বাতাসে জনশ্রুতিতে চণ্ডীদাস—রজকিনীর সঙ্গে তাঁর রোম্যান্টিক প্রেম, সাধন-ভজন, তার মৃত্যু কিংবদন্তীর মায়াকুহক আবিষ্ট করে তোলে পর্যটককেও। ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব জনসাধারণের ওপর বর্তায় না। ফলে তৈরি হয় জনশ্রুতি। এই জনশ্রুতিই কথিত ইতিহাস হয়ে যায় যুগে যুগে। চতুর্দশ শতকের কবি চণ্ডীদাস প্রথমে শক্তির উপাসক ছিলেন। পরে বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে বিখ্যাত হন পদাবলীকার হিসেবে। কীর্ণাহারের পাঠান নবাব কিলঘিস খাঁ কবিকে হত্যা করেন এবং চণ্ডীদাসের তৈরি মন্দিরও ধ্বংস করেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে স্থানীয় তিলি সম্প্রদায় ধ্বংসস্তূপ থেকে দেব-দেবী আবিষ্কার করে মন্দির নির্মাণ করেন। কবির আরাধ্যা দেবী বীণা, বই আর অক্ষমাল হাতে। চারচালা মন্দিরটি অতি সাধারণ। এর সংলগ্ন ১৪টি চারচালা শিবমন্দির কারুকার্যময়। আছে রামী ধোপানীর ঘাট ও নানা মন্দির। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। খননকার্যের ফলে নানা নিদর্শনও মিলেছে।

লাভপুর

সতীপীঠ লাভপুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বলে আধুনিকজনের কাছে বেশি পরিচিত হলেও ফুল্লরা দেবীর মন্দিরের জন্য এর বিশেষ খ্যাতি। ১৩০২ বঙ্গাব্দে মন্দির তৈরি হয়। অতি সাধারণ মন্দিরে কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডই দেবী ফুল্লরা। আছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। মন্দিরের কাছে একটি মজে যাওয়া দিঘি আছে। দেবীদহ নামে পরিচিত এই দিঘিটাকে ঘিরে জনশ্রুতি—শ্রীরামের অকাল বোধনের সময় ১০৮টি নীলপদ্ম নাকি এই দহ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। দেবীর অন্নভোগ শিয়ালকে খাওয়ানোর প্রথা ছিল। শিবাভোগ বেদিটি এখনও আছে। শনি-মঙ্গলবারে মন্দিরে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন। মাঘী পূর্ণিমায় বিরাট মেলা বসে। উৎসব চলে ১০ দিন ধরে। বোলপুর থেকে লাভপুর যাওয়াই সহজ। কাটোয়া থেকেও যাওয়া যায় আহমদপুর-কাটোয়া শাখার ছোট ট্রেনে। আহমদপুর থেকে আধ ঘণ্টার পথ।

বোলপুর-শান্তিনিকেতন

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী মহারাজ সুরথ হৃত সম্পদ ফিরে পাবার জন্য চণ্ডী (কালী)-কে সন্তুষ্ট করতে লক্ষ বলি দেন। তার থেকে এই জায়গার নাম হয় বলিপুর। সুরথের প্রতিষ্ঠিত সুরথেশ্বর শিবমন্দির, গড়ের বাগান ও কোটের ডাঙায় প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই বলিপুর জনগণেশের মুখে মুখে হয়ে যায় বোলপুর। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে।

লক্ষ বলি দেওয়া হয়েছিল যেখানে কালক্রমে শান্তি খুঁজতে এসে আর এক মনীষী সেখানেই তৈরি করলেন শান্তিনিকেতন। হয়ে উঠল বিশ্ববরেণ্য স্থান। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ২০ বিঘা জমি কেনেন। পরের বছর তৈরি করেন নীড়—শান্তির নীড়। শান্তিনিকেতন, ১৮৭৩-এ এলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ সালে ৫ জন ছাত্র নিয়ে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তোলেন ১৯২১-এ, সেখানে বিশ্বভারতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, বিনয়ভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন, কেন্দ্রীয় পাঠাগার ভবন আর সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন—এই নিয়ে বিশ্বভারতীর বিন্যাস চত্বর। গাছতলায় শিক্ষার সেই রেওয়াজ আজও চলছে।

আছে উত্তরায়ণ। এখানে আছে রবীন্দ্র মিউজিয়াম। উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচি—নানা নামের বাড়িগুলি সত্যিই দর্শনীয় এবং রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য। উপাসনা মন্দির, চীনভবন, কালোবাড়ি, নবনন্দন মিউজিয়াম—কতই না বাড়ি, শিল্প-কলার অসামান্য নমুনা, স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতনে।

কঙ্কালীপীঠ

বোলপুর থেকে যাওয়া যায়। প্রান্তিক স্টেশন থেকে সোজা পথ কঙ্কালীতলা। ছোট্ট অগভীর কুণ্ডের জলে দেবীর অবস্থান। সতীর কোমড়ের অংশ এখানে পড়েছে বলে কথিত। কুণ্ডের পাড়ে দেবীর মন্দির। চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনদিন ধরে উৎসব চলে। এখানে একটি শ্মশান আছে কোপাইয়ের তীরে। দেবীকে ঘিরে নানান কাহিনী আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসে অমোঘ বিশ্বাসে। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই।

প্রয়োজনীয় তথ্য

শান্তিনিকেতন—উৎসবের সময় সব দপ্তর বন্ধ।

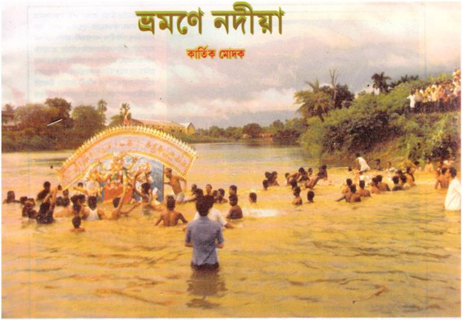
দেখার সময়—বৃহস্পতি থেকে সোম—সকাল ১০.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০। মঙ্গলবার ১২.৩০ পর্যন্ত। বুধবার বন্ধ। শনি, রবি খোলা। গরমের ছুটিতে ৭টা থেকে ১১টা।

কিভাবে যাবেন—হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে বোলপুর। বোলপুর থেকে দু কিমি দূরে চলুন রিক্শায়।

কোথায় থাকবেন—পূর্বপল্লীতে ট্যুরিস্ট লজ, (WBTDC) পূর্বপল্লী ও রতনকুঠিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গেস্ট হাউস, অনেক বেসরকারি হোটেল আছে। উৎসবের অনেক আগে থেকে বুকিং না করলে পাওয়া যায় না।

ভ্রমণে নদীয়া

কার্তিক মোদক



কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির রাজরাজেশ্বরী দুর্গামূর্তি বিসর্জনের দৃশ্য। *ছবি কাজল বিশ্বাস*

জেলার নাম 'নদিয়া' কেন হল সে বিষয়ে কেউ কেউ বলেন নয়টি দ্বীপের সমষ্টি নবদ্বীপ বা নতুন (নব) দ্বীপ অর্থাৎ নবদ্বীপ থেকে নদিয়া নামের উৎপত্তি। আবার কারও মতে 'নয়টি দিয়া' অর্থাৎ নয়টি 'প্রদীপ' থেকে নবদ্বীপ বা নদিয়া নামের উৎপত্তি। যাই হোক নদিয়া নামের সঙ্গেই নবদ্বীপ নামটি জড়িয়ে আছে। এবং জ্ঞানচর্চা ও ধর্মালোচনাই নদিয়ার বিশেষত্ব। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্য-সংস্কৃতির মনন ও চর্যাকেন্দ্র ছিল গঙ্গা-তীরবর্তী নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর। প্রমথ চৌধুরী তাঁর লেখায় বলেছেন—'আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনগরের ভাষা আমার মুখের ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগরের তুল্য ভাষা বাংলায় আর কোথাও নেই।' নদিয়ার ভাষাই আজকের সাহিত্যের ভাষা। সেন যুগ থেকে শুরু করে এই নদিয়ার মাটিতে প্রখ্যাত পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকদের জন্ম হয়েছে। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের (দ্বাদশ শতাব্দী) রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী এবং গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি এবং 'কবিক্ষ্মাপতি' উপাধিপ্রাপ্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এই ধোয়ী ছিলেন নবদ্বীপের বাসিন্দা। বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তক বাসুদেব সার্বভৌম জন্মেছিলেন নবদ্বীপে। চৈতন্য যুগে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বাংলা ও বহির্বাংলা থেকে বহু ছাত্র আসতেন। নবদ্বীপে যে অজস্র পুঁথি উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে বাংলা হরফের সংস্কৃত পুঁথিও অজস্র আছে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, 'ভৌবনী পত্রিকা'র ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, সাপ্তাহিক 'বিশ্বদূত' পত্রিকার সম্পাদক অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, 'নবদ্বীপ বঙ্গবিধুধজননী সভা'র সম্পাদক সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, চিরঞ্জীব শর্মা—এঁরা সকলেই নবদ্বীপের মানুষ ছিলেন।

কৃষ্ণনগর

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী ছিল। এখনও কলকাতার পরে কৃষ্ণনগর সমৃদ্ধশালী ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত প্রধান নগরের মধ্যে একটি বলে গণ্য হয়। কলকাতাতে যা কিছু নতুন আলোচনা ওঠে যা কিছু চিন্তা বা ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয় তা'র আন্দোলন কৃষ্ণনগরে ছড়িয়ে পড়ে। এইজন্য কলকাতার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে। রামতনু লাহিড়ী

> **কলকাতার অভ্যুদয়ের পূর্বে নবদ্বীপ রাজাদিগের রাজধানী কৃষ্ণনগরই বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান স্থান ছিল, এবং নদিয়া জেলা সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এই সকল সভ্যতা ও শিল্পাচারের উৎসস্বরূপ ছিলেন।**

মহাশয় বঙ্গদেশের যে নবযুগের সূচনা ও বিকাশ ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রের সমগ্র ভাব হৃদয়ে ধারণ করতে হলে কলকাতা ও কৃষ্ণনগরের সামাজিক জীবনকে একসঙ্গে দেখা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে মহাকীর্তি লাভ করেছিলেন। বস্তুত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা না থাকলে যেমন আমরা কালিদাসের অপূর্ব কীর্তি পেতাম না, তেমনি গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা না থাকলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পেতাম না।

কলকাতার অভ্যুদয়ের পূর্বে নবদ্বীপ রাজাদিগের রাজধানী কৃষ্ণনগরই বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান স্থান ছিল, এবং নদিয়া জেলা সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এই সকল সভ্যতা ও শিল্পাচারের উৎসস্বরূপ ছিলেন। যেমন একদিকে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ জ্ঞানপ্রভা দ্বারা দেশকে সমুজ্জ্বল করেছেন এবং নবদ্বীপের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তেমনি নদিয়া জেলার লোকের সভ্যতা, শিষ্টাচার, সুরসিকতা, শিল্প-কুশলতা, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতির খ্যাতি সর্বত্র প্রচার হয়েছিল। যে রাজবংশের আশ্রয়ে নদিয়ার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি হয়েছিল, সেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকর্তার নাম ভবানন্দ মজুমদার। পূর্বে মাটিয়ারি নামক স্থানে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্তু ভবানন্দের পৌত্র রাঘব বর্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী পত্তন করেন। তখন ওই স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ওই গ্রামে বহু সংখ্যক গোপজাতীয় লোকের বাস ছিল। ওই সকল গোপ-মহা সমারোহে কৃষ্ণের পূজা করতেন বলে রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রেখেছিলেন। কেবল মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করে ছয় ক্রোশ দূরে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে শিবনিবাস নগর স্থাপন করেছিলেন। এর এক ক্রোশ পূর্বে উত্তরে ইছামতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপন করেন এবং তার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যকালে নবাব আলিবর্দি খাঁ পরলোকগমন করেন এবং তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন। সিরাজদ্দৌলা সুখপ্রিয় অস্থির চিত্ত লোক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বিবিধ অত্যাচারে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। জনশ্রুতি যে, রাজা মহেন্দ্র রাজারাম নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি প্রথমে এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। কোনও কোনও ইতিহাস লেখক এই কথার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন এই মন্ত্রণাসভার সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত লেখক বলেছেন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে এ প্রবাদ চলিত আছে, নদিয়ার পলাশিতে যুদ্ধের পর ক্লাইভ সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ তাঁকে পাঁচটি কামান উপহার দিয়েছিলেন। সে পাঁচটি কামান এখনও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে বিদ্যমান।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়। ইংরেজরা তখন নবলব্ধ রাজ্যকে নানাভাবে বিভক্ত করে জমিদারদের সঙ্গে নতুন মেয়াদি বন্দোবস্ত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের অদূরে অলকানন্দা তীরে ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে মহারাজ তাঁর সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে নতুন প্রথানুযায়ী 'অভিলষিত ব্যবস্থাপত্র' দ্বারা উত্তরাধিকারি মনোনীত করেন (১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে)। মৃত্যুর পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির বিধিব্যবস্থা করার 'উইলপত্র' এই প্রথম সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে এ দেশে ইংরেজ শাসন শুরু হয় ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য কালেক্টরি পদ সৃষ্টি করে ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। নদিয়াতেই সর্বপ্রথম জেলা স্থাপিত হয় কালেক্টরের অধীনে।

বিচারের সুবিধার জন্য প্রতি জেলায় এক-একটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয় স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়কে (গোয়াড়ি) নদিয়ার আদালত স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের পর 'নদিয়া বিভাগ' গঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ বাদে পরবর্তী প্রেসিডেন্সি বিভাগের সব ভূভাগই নদিয়া বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কমিশনার কৃষ্ণনগরে থাকতে না চাওয়ায় নদিয়া বিভাগের প্রধান কার্যালয় আলিপুরে স্থানান্তরিত হয়।

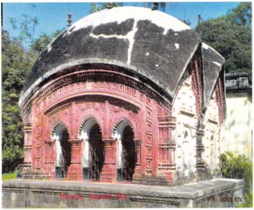
স্বাধীনতা সংগ্রামে নদিয়ার অবদানও কম নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নদিয়ায় নীলচাষ হত। ১৮৫৯—৬১ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ায় নীলচাষের হাঙ্গামা ও

গোলযোগ দেখা দেয়। ইংরেজরা একদিকে শাসকগোষ্ঠী ও অন্যদিকে নীলকর ভূস্বামী হওয়ায় নীলচাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছিল। ফলে, নীলচাষীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণনগরের অদূরে আশাননগর গ্রাম সেই নীল বিদ্রোহীদের একটি ঘটনাস্থল। নীল বিদ্রোহী মেঘাই সর্দার এখানে লড়াইকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশ্বনাথকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই স্থান ফাঁসিতলা বলে খ্যাত। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব- দেন। কৃষ্ণনগর শহরে জেলা জজ সাহেবের যে বাংলোটি বিদ্যমান সেটি নীলকর সাহেবদের নীলকুঠি নামে পরিচিত ছিল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে গরবিনী কটেজে প্রথম জাতীয় আন্দোলনের গোপন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। শিক্ষায়তনে ধর্মঘট পালন, মদের দোকানে পিকেটিং, বিলাতি জিনিস ও কাপড় বিক্রি বন্ধের অভিযান এখান থেকে সংগঠিত হত। ১৯২৬-এ সারা বাংলা যুব ও ছাত্র সমাবেশ হয় কৃষ্ণনগরে। তুলসী গোস্বামী ও সরোজিনী নাইডু যথাক্রমে এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭-এ 'রেড সার্ট' আন্দোলন হয় নদিয়ায়। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ডঃ আনে এফ কে নরীমান প্রমুখ নেতা কৃষ্ণনগর টাউনহল ময়দানে বক্তৃতা করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায়। কিন্তু এই স্বাধীনতা অখণ্ড আসেনি। বঙ্গ বিভক্ত হল। তার সঙ্গে নদিয়া জেলা বিভক্ত হয়, কিন্তু স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের রায় পরিষ্কার বোঝা না যাওয়ায় ১৫ আগস্ট তারিখে নদিয়া ভারতভুক্ত হয়নি। তিন দিনের জন্য পাকিস্তানভুক্ত ছিল। তার পর ১৮ আগস্ট তারিখে নদিয়া ভারতভুক্ত হয়।

শান্তিপুরের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এই তিনদিকে গঙ্গা প্রবাহিত। উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্বে ঘোড়ালিয়া হতে বাবলা পর্যন্ত গঙ্গার ধারা এখনও বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ স্বনামখ্যাত শ্রীঅদ্বৈতের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র এই শান্তিপুর গ্রামে বসবাস করেন। অনেকে বলেন বর্তমান শান্তিপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে 'নিস্করের' সন্নিকটবর্তী বাবলা



নামক স্থানে পূর্বে শান্ত নামে একজন বেদাচার্য বস করতেন। তাঁর চলতি নাম শান্ত মুনি। এই শান্ত মুনি হতে শান্তিপুর নামের উৎপত্তি। আবার কেউ বলেন যে, পূর্বে এই স্থানে হিন্দুরা তাঁদের মৃতপ্রায় পিতামাতাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করে এখানে আনতেন। যাঁরা এখানে এসে রোগ মুক্ত হতেন তাঁরা পুনরায় সংসারে গেলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ করে এই ভয়ে তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে, সংসারের সুখ-দুঃখ হতে নিরপেক্ষভাবে এখানে জীবনের অবশিষ্টকাল শান্তিতে অতিবাহিত করতেন বলে এবং এইরূপ সংসার বিরাগী শান্তি অভিলাষী লোক নিয়ে গ্রাম গঠিত হওয়ায় এই স্থান শান্তিপুর নামে খ্যাত।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি শান্তিপুরে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। এখানকার দ্রষ্টব্যস্থানাদির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, রাজা রামকৃষ্ণের মাতার ১৭৪০ অব্দে স্থাপিত গোকুল চাঁদের মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতের পাঠ, তোপখানা, পাড়ার প্রাচীন মসজিদ যা বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময় ১১১৫ হিজরিতে ইয়র মহম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ও রিভার টমসন হল, বন্ধুসভা, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির ছাড়াও উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে বেলগড়ে, গড়, হরিনদী ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, বাগআঁচড়া, ফুলিয়া গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য। এখানকার জগদ্বিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র, পিতল-কাঁসার সামগ্রী এবং শান্তিপুরের টাঙাইল শাড়ি উল্লেখযোগ্য।

সুবর্ণ বিহার নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত গোদ্রুম দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত এই সুবর্ণ বিহার প্রাচীনকালে সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। এখানের প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপ সম্পর্কে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় তাঁর নবদ্বীপ মহিমায় (১২৯৮ সালে প্রকাশিত) বলেছেন, ইহা একটি ধ্বংসাভূত স্তূপ। এই স্তূপ প্রায় ২ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং উচ্চতায় ১০ হাত। এটা ইস্টক ও প্রস্তর খণ্ডময়। ইহার উত্তর দিকের ভূমি বহু দূর পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই স্তূপের মধ্যস্থানে পুষ্করিণীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। তার পরিমাণ প্রায় ৩ কাঠা হবে ও গভীরতা ৮/৯ হাত।

পানশিলা : পানশিলা ও ভালুকা : শহর নবদ্বীপ থেকে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ভালুকা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের উত্তরাংশে পানশিলা। একটি বিরাট বিলের ধারে এই দুটি গ্রাম। 'ভালুকা' নামটি 'ধর্ম মঙ্গলে' উল্লিখিত বল্লুকার রূপান্তর কিনা ভেবে দেখার বিষয়। এই বল্লুকা নদীর তীর থেকে ধর্মপূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। বল্লুকা নদী

সম্ভবত বর্তমান ভাল্যকার বিলেরই পরিবর্তিত রূপ বলে অনেকে একটি নদী ছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার মানচিত্রে গাদিগাছা, মাজিদহ থেকে আরম্ভ করে পানশিলা, ভালুকার ভেতর দিয়ে একটি নদী সাতকুলিয়ার দক্ষিণে গঙ্গায় এসে মিশেছে।

দিগনগর : কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত এই গ্রামটির প্রাচীন নাম দীঘিকানগর। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাঘব মাটিয়ারি থেকে রেউইয়ে (বর্তমান নাম কৃষ্ণনগর) রাজধানী স্থাপন করার পর এই অঞ্চলের পথঘাট, জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তিনিই কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরের সড়ক তৈরি করেছিলেন। এই সড়কের ধারে একটি বিশাল দীঘি কাটিয়েছিলেন। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি সেই সময় কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে দীঘি কাটিয়েছিলেন। এই দীঘিটি লম্বা ১,৪৫২ হাত, চওড়া ৪২০ হাত। রাজা রাঘব এই দীঘির পূর্বদিকে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করে কাছাকাছি দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দির দেবতা রাঘবেশ্বর নামে পরিচিত।

ফুলিয়া শান্তিপুর থানা ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে কৃত্তিবাস তোড়ন। এখানে আদি কবি কৃত্তিবাস ওঝা, যিনি সংস্কৃত রামায়ণের মূল রসধারাকে বাংলা কাব্য ছন্দে লিখেছিলেন। প্রতি বছর মাসের শেষ রবিবার কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব হয়। স্মারক কৃত্তিবাস স্মৃতি স্তম্ভ, কৃত্তিবাস কূপ এবং কৃত্তিবাস সংগ্রহশালা রামায়ণপ্রেমী মানুষের কাছে চিরন্তণ আকর্ষণ। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ সংগৃহীত। মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা রামায়ণের ঘটনাবলীভিত্তিক ৩৬টি দৃশ্যে স্থায়ী তৈলচিত্রের প্রদর্শনী। পাশে যবন হরিদাস ঠাকুরের 'ভজন গোফা'। একটু দূরে ভাগীরথী গঙ্গা।

আনুলিয়া :. রানাঘাট থানার অন্তর্গত রানাঘাট ১ নং ব্লকের অন্তর্গত একটি পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ গ্রাম। চূর্ণি পাশ দিয়ে প্রবাহিত। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের একটি তাম্র শাসন এই গ্রাম থেকে আবিষ্কার হয়েছে ইংরেজি ১৯৯৮ সালে। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী রচিত 'চিন্ময় বঙ্গ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই তাম্র শাসনে জনৈক বিপ্রদাসের প্রপৌত্র শঙ্করের পৌত্র ও দেবীদাসের পুত্র যজুর্বেদীয় কান্বশখাধ্যায়ী রঘুদেব দেবশর্মাকে ভূমিদান করেছিলেন। এই তাম্র শাসনটি বর্তমান কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তাম্র শাসনটির প্রথম বাক্যটি হল, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'। আর একটি পুরাবস্তু পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির উচ্চতা ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪½ ফিট ও ২৩½ ফিট চতুর্ভুজ মূর্তিটির দুই বাম হাতে শঙ্খ ও চক্র এবং দুই ডান হাতে গদা ও পদ্ম। মস্তকের দুপাশে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্বের ক্ষুদ্র মূর্তি। পাদদেশের দুপাশে চামর-ব্যজনরত দুটি নারী-মূর্তি। চৈত্র সংক্রান্তির সময় এর গাজন হয় প্রতি বছর।

রানাঘাট নদিয়া কাহিনীর লেখক কুমুদনাথ মল্লিকের মতে রানাঘাট নামকরণ রানা ডাকাতের নামেই হয়েছে। এই ডাকাতরা সেই সময় জঙ্গলাকীর্ণ বটবৃক্ষের তলায় ছিল রানা ডাকাতের ঘাঁটি। ডাকাত হলেও রানা ছিল অত্যন্ত কালীভক্ত। এই ডাকাত তৎকালীন 'ডরঙ্গনতলায়' কালী মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই পরবর্তী সময়ে 'সিদ্ধেশ্বরী দেবী' নামে পরিচিত। অন্য একটি সূত্রে জানা যায় যে, মুঘল সুলতান মহামতি আকবরের রাজস্ব সচিব রানা। টোডরমল্ল, 'ব্রহ্মডাঙ্গা', নামে এই স্থানটি জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। রানার নামানুযায়ী এই জনপদটির নাম হয় 'রানাঘাট'। আবার কারও কারও মতে, নদিয়ার মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষী রানাঘাটের সন্নিকটস্থ 'নোকাড়ি' ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন, সেহেতু এই স্থানটির নাম হয়েছিল 'রানীঘাট'। রানীঘাট থেকে রানাঘাট। রানাঘাটের প্রধান জমিদার বংশগুলি পালচৌধুরী বংশ, দে চৌধুরী বংশ ও মল্লিক বংশ প্রভৃতি।

আড়ংঘাটা কলকাতা থেকে ৫৬ মাইল দূরে চূর্ণি নদীর তীরবর্তী আড়ংঘাটা একটি স্টেশন। এখানে যুগলকিশোর দেবের একটি দালান মন্দির বর্তমান। যুগলকিশোরের একটি প্রাচীন মন্দির ছিল বলে জানা যায়। সেই মন্দিরটি ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। শ্রীকৃষ্ণের একটি কিশোর মূর্তি প্রথমে গঙ্গারাম দাস নামে এক ব্যক্তি নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন, পরে তিনি সেখান থেকে আড়ংঘাটায় এসে মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্তিকা গর্ভ থেকে একটি রাধিকা মূর্তি পেয়ে সেই রাধিকাকে ওই কিশোরের সঙ্গে মিলিত করেন। সেই থেকে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। যুগলকিশোরের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে গোপীনাথ নামে একটি প্রাচীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। চূর্ণি নদীর উপর একটি ব্রিজ হওয়ার ফলে বীরনগর থেকেও এখানে আসা যায়।

দেবগ্রাম রানাঘাট ২ নং ব্লকের অন্তর্গত (ধানতলা থানা) রানাঘাট স্টেশন থেকে গাংনাপুর ট্রেনে অথবা চাকদহ থেকে বাসে গাংনাপুর যাওয়া যায়। দেবপাল নামক কুম্ভকার জাতীয় এক রাজার স্মৃতি বিজড়িত রানাঘাট থেকে পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত এই দেবগ্রামে একদা সুবিখ্যাত প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষের তেমন কোন চিহ্ন আজ আর চোখে পড়বে না। 'নদিয়া কাহিনী' ও অন্যান্য গ্রন্থে গড়ের রাজা দেবপালেরই উল্লেখ আছে। ভারত চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' বলা হয়েছে যে, দেবী অন্নপূর্ণার রোষে দেবপালের পতন হয়। কিংবদন্তী আছে এই রাজা দেবপাল এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মূল্যবান স্পর্শমণি অপহরণ করে রাজ্য সম্পদ লাভ করেছিলেন। এবং সেই সন্ন্যাসীর অভিশাপই তাঁর পতনের মূল। অপর একটি কিংবদন্তীতে একটি রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে। রাজা দেবপাল কোনও এক সময় এক যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে একটি পায়রাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাবার সময় তিনি রানীদের বলে যান, যদি তাঁর যুদ্ধে জয়লাভ না হয়, তাহলে পায়রাটি রাজধানীতে ফিরে আসবে এবং অন্তঃপুরের রানীরা যেন সম্মান রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন দেন। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত পায়রাটি হারালেন। পায়রাটি পূর্ব শিক্ষামত ফিরে এলে রাজার মৃত্যু বুঝতে পেরে রানীরা পিছনের খিড়কি পুকুরে আত্মবিসর্জন দিলেন। এদিকে রাজা যথারীতি ফিরে এসে এই মর্মান্তিক সংবাদ জানতে পেরে নিজেও এই খিড়কি পুকুরের জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। দেবগ্রামের গড়ের বাইরে যে কতগুলি প্রাচীন বৃহৎ মন্দিরে ভগ্নাবশেষ ছিল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত '21st of Ancient Monuments in Bengal'-এ

কৃষ্ণনগর রাজ বাড়ি



তার উল্লেখ আছে।

বেলপুকুর : শ্রীধাম বিল্ব পুষ্করিণী অধুনা বেলপুকুর নাকাশিপাড়া ব্লকের অন্তর্গত। সুবে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্বে থেকেই সম্রাট আলমগীর দিল্লির মসনদে সমাসীন। ঠিক সেই সময় ১৬৮৫—১৬৯০ এর মধ্যে নদিয়ার মহারাজা শ্রীরুদ্র রায় মহাশয় ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে এক মহাশক্তিধর কালীসাধকের সন্ধান পেয়ে পত্র-মিত্র সমভিব্যহারে সেখানে গেলেন এবং তাঁর অলৌকিকত্বে এবং সাধনার ধারা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ৫০০ বিঘা জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেন। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই বেলপুকুর গ্রাম। উক্ত সাধকের নাম শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর বা সাধক শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য।

নবদ্বীপের 'পোড়ামা'তলায় প্রাচীন বটবৃক্ষতলে স্থাপিতা 'পোড়ামা' এক জাগ্রত লোকায়ত দেবী। 'পোড়ামা'কে ঘিরে অনেক লোককাহিনী শোনা যায়। যেমন বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি নবদ্বীপে কামধ্যে জগম্মাতার ঘট স্থাপন করেছিলেন। পরে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বৃক্ষতলে ঘটটি পুনঃস্থাপন করে সেখানে এক চতুষ্পাঠি প্রতিষ্ঠা করেন। একদা আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে বৃক্ষটি পুড়ে গেলে, দেবী 'পোড়া-মা' নামে পরিচিতা হন।

> সাহিত্যচর্চায় নদিয়ার বিশেষ গর্ব কবি-নাট্যকার ও হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদিয়ার নবদ্বীপে (মতান্তরে মায়াপুরে) মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব শুধু বাঙালি জীবনকেই নয়, ধন্য করেছে গোটা পৃথিবীর মানুষকে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধককুলের অন্যতম বিজয়কৃষ্ণের জন্মও এই জেলার শিকাপুর গ্রামে। আধ্যাত্মিক জগতের আরও এক সুসন্তান অন্যতম ভারত-সাধক যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি কৃষ্ণনগর ঘূর্ণিতে জন্মেছেন। গার্হস্থ্য জীবনকে অব্যাহত রেখে গোপনভাবে যোগ সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছেন তিনি। সাহিত্যচর্চায় নদিয়ার বিশেষ গর্ব কবি-নাট্যকার ও হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন শান্তিপুরে। 'ঝরাফুল' 'শান্তি জল' কাব্য-গ্রন্থ তাঁর। 'আইড়ি ক্ষেতের আড়ে' মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই'-এর বিখ্যাত পল্লীকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী করিমপুর পার্শ্বস্থ যমশেরপুর গ্রামে জন্মেছেন। 'পরশুরাম' ছদ্মনামের আড়ালে থাকা সেই বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর আদি বাড়ি বীরনগরের উলা গ্রামে। সাহিত্যসাধনায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি জগত্তারিণী সরোজিনী পদ্মভূষণ, রবীন্দ্র পুরস্কার আকাদেমি পুরস্কার পান। চলন্তিকা (অভিধান) ও রামায়ণ-মহাভারত সংক্ষেপে প্রকাশ করেন তিনি। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতাটি দীর্ঘকাল শিশুমনে রেখাপাত করে আসছে। সেই কবি শিক্ষাবিদ-পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন নাকাশিপাড়ায় বিল্বগ্রামে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রবাদপুরুষ অমিয়নাথ স্যানাল, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্র

দিলীপকুমার রায় কৃষ্ণনগরের সন্তান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষাগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তী থাকতেন আনুলিয়ায়। ধুয়োজারি লোকগানের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী চায়েন উদ্দিনের বাড়ি ডোমপুকুর গ্রামে। এছাড়াও টপ্পাগানে রানাঘাটের শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার ও চরিত্রাভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরি জন্মগ্রহণ করেন বাগআঁচড়া গ্রামে। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল তারকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজের শহর কৃষ্ণনগর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎশিল্পীরা তো আছেন কৃষ্ণনগর ঘূর্ণিতে। গৌতম পাল ভাস্কর্য শিল্পেও আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন।

ভ্রমণে নদিয়াকে জানতে নাকাশিপাড়া ব্লকে বেথুয়া ফরেস্ট বেড়াতে আসুন। প্রকৃতির সবুজ সম্ভার। সেইসঙ্গে গভীর মেহগনি-শাল বনের হাতছানি। হরিণ শাবকদের হুটোপাটি। শীতে এলে এখানেই থাকার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া বেথুয়া রেগুলেটেড মার্কেটে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

কল্যাণী

পশ্চিমবাংলার অন্যতম রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা কল্যাণী শিল্পনগরী। ১৯৫৪ সালে কংগ্রেসের ৫৯তম কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কল্যাণীর প্রতিষ্ঠা দ্রুততর হয়েছে। বর্তমান মহকুমাসহ জওহরলাল স্মৃতি হাসপাতাল, মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি হাসপাতাল, ই এস আই হাসপাতাল ও নেতাজি সুভাষ স্যানেটরিয়াম নামে কয়েকটি হাসপাতাল এখানে অবস্থিত। কল্যাণীতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। একটি বিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয়। অন্যটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। মৎস্য চাষ গবেষণা কেন্দ্র ও সরকারি অফিস এবং শিল্পনগরী নামে খ্যাত।

তাহেরপুর

তাহের আলি নামে জনৈক মুসলমান আপন শক্তিতে তৎকালীন শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে বর্তমান তাহেরপুর এবং সংলগ্ন ভূখণ্ডের অধিকার পান এবং বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের একমাত্র অধিকারী তিনিই ছিলেন। প্রভাব প্রতিপত্তিতে তাহের আলি সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এসব কারণে তাহের আলির বাসভূমি ও সংলগ্ন এলাকা 'তাহেরপুর' নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এতদাঞ্চলের মুসলমান পরিবারবর্গ তাদের সম্পত্তি পূর্ব পাকিস্তানি হিন্দুদের সঙ্গে বিনিময় করে পাকিস্তানে চলে যায়। পূর্ব ভাদুরিতে এখনো পাতকুয়ার প্রাচীরে লেখার মধ্যে মুসলমান বসবাসের পরিচয় লেখা আছে। ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়তে মহিষডাঙা, ভাদুরি, বারাসত ও তাহেরপুর মৌজার অধিকাংশ অনাবাদী জমি তৎকালীন সরকার গ্রহণ করেন।

ধুবুলিয়া, কুপার্স এবং চাঁদমারী

কোতয়ালি থানার অন্তর্গত ধুবুলিয়া এবং রানাঘাট থানার অন্তর্গত কুপার্স এবং প্রাক্তন চাকদহ থানা ও বর্তমান কল্যাণী থানার অন্তর্গত চাঁদমারী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ইংরাজ এবং আমেরিকা যৌথভাবে যখন জাপান-জার্মনীর সঙ্গে যুদ্ধরত তখন সামরিক প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তিনটি স্থানে ইংরাজ এবং আমেরিকা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। এই তিনটি ঘাঁটির নাম ছিল যথাক্রমে ধুবুলিয়া ক্যাম্প, কুপার্স ক্যাম্প এবং চাঁদমারী ক্যাম্প। চাঁদমারী ক্যাম্পে প্রধানত সৈন্যবাহিনীর গোলাগুলি চালনা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ভারত স্বাধীন হয়ে গেলে সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে দেশ বিভাগের অভিশাপরূপে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকেন। ভারত সরকার ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের এইসব পরিত্যক্ত ক্যাম্পে অস্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেয়।

কলাইঘাটা

রানাঘাট থানা থেকে ৪ মাইল দূরে চূর্ণি নদীতীরে কলাইঘাটা। লর্ড ক্লাইভ এই ঘাট দিয়ে তাঁর বাহিনী পারাপার করেছিলেন। সেই সময় তৎকালীন খেয়ার পাটনিকে তিনি একটি পাঞ্জা বা ফরমান দিয়ে যান পারিশ্রমিক হিসাবে। এই পাঞ্জাতে লেখা ছিল এই পাটনি ও বংশধরেরা এই ঘাট বরাবরের জন্য নিষ্কর ভোগ করবে। উমেশ পাটনির আমলে এই পাঞ্জাটি নষ্ট হয়ে যায়। উমেশ পাটনির পুত্র হাজারি পাটনির স্ত্রী ছিল কুলটা। যেদিন তাঁর উপপতির সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে, সেই রাত্রে তার শ্বশুর গৃহে অগ্নিসংযোগ করে পালিয়ে যায়। চালের বাতায় বাঁশের চোঙার মধ্যে ছিল সেই ক্লাইভের দেওয়া ফরমান। পাঁচটি চালাঘর সমেত ফরমানটি পুড়ে যায়। ১৯৬২ সালে সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে। খেয়াঘাট সরকার অধিগ্রহণ করে।

কলাইঘাটা খেয়াঘাটের পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃদ্ধ বটবৃক্ষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর সঙ্গে রানী রাসমণির জমিদারিতে আসেন। এখানে নীলচাষ হত। তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে পুরানো ইটের স্তূপে। আদিবাসী অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে মথুরবাবুকে খাজনা আদায় করতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বলেন, 'হ্যাঁরে এদের খাজনা মকুব করে দে, পেটভরে খেতে দে, মাথায় তেল দে।' একথা শুনে মথুরবাবু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ঠাকুরের কথা মেনে নেন। 'জীবসেবা' ব্রত শ্রীরামকৃষ্ণের এখান থেকে শুরু।

ঋণসূত্র :

১। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক
২। Census Hand Book Nadia
৩। Editor District Gazetter, Govt. of West Bengal
৪। নদীয়া—স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ
৫। নদীয়া পরিচিতি—নরেশ চাকী
৬। বঙ্গলোক, ১৯৯৭
৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
৮। আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী
৯। কল্যাণী সেকাল ও একাল—নিতাই ঘোষ
১০। রশ্মি : নবদ্বীপ সংখ্যা
১১। বেলপুকুরের মদনগোপাল—নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১২। কৃষ্ণনগর সহায়িকা—সজিত দত্ত ও গৌতম ধনী
১৩। তাহেরপুরের ইতিবৃত্তান্ত—ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৪। মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়—উৎসবভূমি, ২০০০
১৫। শান্তিপুর প্রসঙ্গ—কল্যাণী নাগ
১৬। শান্তিপুর পরিচয়—পৌরসভা, শান্তিপুর

নদিয়ার পর্যটন মানচিত্রে নতুন আকর্ষণ

নদিয়া' বাংলার ইতিহাসে একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত নাম। নদিয়া জেলা সদর কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতিও জগৎজোড়া। চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি-বিজড়িত নবদ্বীপ। মায়াপুর কিংবা বেথুয়াডহরির অভয়ারণ্যের চঞ্চল হরিণ ভ্রমণপিপাসু মানুষকে বারে বারে আকর্ষণ করেছে। এই জেলাতেই ছড়িয়ে রয়েছে পুরাকীর্তির নানা স্মারক সৌধ, টেরাকোটার অপূর্ব চিত্রসংবলিত নানা মন্দির। মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে বেশ কিছু মসজিদ আর ইউরোপীয় স্থাপত্যশিল্পের ঐতিহ্য হিসাবে গির্জাগুলির সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষকে আজও টেনে আনে এই নদিয়ার মাটিতে। তবুও নদিয়ার পর্যটন মানচিত্রে নতুনভাবে নতুন কিছু আকর্ষণীয় স্থান যুক্ত করার জন্যই নদিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগ সত্যিই উল্লেখের দাবি রাখে।

১। **দিগ্‌নগরের রাঘবেশ্বর মন্দির** কৃষ্ণনগরের কোতয়ালি থানার অন্তর্গত। কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ১১ কিমি দক্ষিণে ৩৪নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন দিগ্‌নগরেই আছে পুরাকীর্তির অমূল্য নিদর্শন রাঘবেশ্বর মন্দির। টেরাকোটার অপূর্ব কারুকার্যখচিত চারচালা শিবমন্দিরটি রাজা রাঘব রায় নির্মাণ করেন।

রাজা রাঘব কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর্ কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এক সড়ক তৈরি করেন। জনসাধারণের জলকষ্ট দূর করার জন্য পথের ধারে বিশাল দিঘি খনন করেন। উল্লেখ্য দীঘিকানগর থেকেই 'দিগ্‌নগর' এসেছে।

মন্দির গাত্রে টেরাকোটার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য আর মন্দিরের অদূরে স্বচ্ছ জলের দিঘির শান্ত পরিবেশ দিগ্‌নগরকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

২। **শিবনিবাস** চূর্ণী নদীর তীরে শিবনিবাস অবস্থিত। কৃষ্ণনগর মাজদিয়া বাসপথে ১৬ মাইল্ এসে মন্দিরঘাটে নেমে ও শিবনিবাস মন্দিরে যেতে খেয়া নৌকায় চূর্ণী পার হতে হবে। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনিবাস ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন জনপদ। এছাড়া পুরাতত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে এখানকার মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতিতে।

এখানকার সবচেয়ে উঁচু রাজরাজেশ্বর শিবমন্দিরটি বুড়োশিবের মন্দির বলেই পরিচিত। এই মন্দিরে কালো কষ্টিপাথরে গড়া শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘতম শিবলিঙ্গ। এছাড়া বুড়োশিবের মন্দিরের অদূরে চারচালা রাজ্ঞীশ্বর শিব মন্দির এবং এই মন্দিরের সামনেই রামসীতার মন্দির সত্যিই দর্শনীয়।

কাশীতুল্য এই শিবনিবাস হিন্দুদের কাছে একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই মন্দির স্থাপত্যরীতিতে অপরূপ; গথিক রীতির মিশ্রণ আর নির্জন প্রান্তরে সীমাহীন দিগন্তরেখা ভুলিয়ে দেবে শহর জীবনের ক্লান্তি। প্রতি বছর ভীম একাদশীতে মেলা বসে।

৩। **কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলা** লৌকিক বিশ্বাস ও জনশ্রুতি, স্থান-মাহাত্ম্য সৃষ্টিতে যে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে, তার দৃষ্টান্ত কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় গেলে বোঝা যায়। মানুষের কৌতূহলস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলে বহু মানুষকে আকর্ষণ করে। আর ভ্রমণবিলাসী মানুষও চলে আসে দলে দলে সতীমার পবিত্র স্থানের মনোরম পরিবেশে।

কল্যাণী থানার অন্তর্গত কল্যাণী রেল স্টেশনের ৪ কিমি পশ্চিমে ঘোষপাড়ায় আসতে হলে সংযোগকারী পিচের রাস্তা ধরে সাইকেল-রিকশায় ও মেলার সময় বাসে আসা যায়।

এই ঘোষপাড়া বৈষ্ণব ধর্মের উপশাখা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র তথা পীঠস্থান। এখানে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের প্রথম ও প্রধান শিষ্য রামশরণ পালের বাস্তুভিটায় এক ডালিম গাছের নিচে রামশরণের ধর্মপ্রাণা স্ত্রী সিদ্ধিলাভ করেন বলে জনশ্রুতি। তিনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কাছে সতীমা নামেই পরিচিতা। ডালিম গাছটি আকারে ছোট হলেও বর্তমান গাছটি সতীমার সমকালীন। সতীমার সমাধি মন্দিরের অদূরে হিমসাগর দিঘির জলকে পবিত্র ও সর্বরোগহর হিসাবে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন।

এখানকার বিশাল আমবাগানে দোলপূর্ণিমার দিন থেকে মেলা বসে। সপ্তাহব্যাপী এই মেলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়। এছাড়া রথের সময় মহোৎসব হয়। এমন কি সারা বছর এখানে উৎসাহী দর্শকের ভিড় লেগে থাকে।

এই স্থানটিতে যাতে পর্যটকরা সহজে যেতে পারেন, তাই ঘোষপাড়ার কাছাকাছি কাঁঠালিতলায় একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

৪। **মঙ্গলদ্বীপ** গঙ্গানদীর বুকে নতুন করে জেগে উঠা চর মঙ্গলদ্বীপ নামে পরিচিত। চারিদিকে জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের মনোরম পরিবেশ পর্যটকদের আনন্দ দেয়। শহরের কোলাহল ছেড়ে কিছুটা সময় নিজেকে উপলব্ধি করতে হলে আসতেই হবে মঙ্গলদ্বীপে। শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর রেলপথের মাঝে পায়রাডাঙা রেলস্টেশনে নেমে সড়ক পথে ভ্যান রিকশায় আসা যায় মঙ্গলদ্বীপে।

তবে এই ৫ কিমি রাস্তাকে নতুনভাবে তৈরি করে পর্যটকদের সময় বাঁচানো ও নানা সুবিধা প্রদানের জন্য জেলা পরিষদ থেকে ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৫। **বাহাদুর পুর অরণ্য :** ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর কৃষ্ণনগরের মাত্র ৪ কিমি উত্তরে আছে বাহাদুরপুর অরণ্য। কংক্রিটের জঙ্গলে থাকা একঘেয়ে ক্লান্তিকর শহরে জীবন থেকে কিছুটা মুক্তির স্বাদ পেতে আসা যায় এই অরণ্যে। অর্জুন, সেগুনে ঘেরা জঙ্গলে পাখিদের কলতানে নির্জন ছায়ায় কিছুটা সময় কাটানোর জন্য তপোবনের আদলে একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বনদপ্তর এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ করছে।

কলকাতা

- কলকাতা
- হাওড়া
- হুগলি
- উত্তর ২৪ পরগণা
- মেদিনীপুর



কলকাতা আছে কলকাতাতেই

সেরিনা জাহান



প্রাণের শহর, গানের শহর-ভালোবাসার শহর কলকাতা। মিছিলের শহর-আড্ডার শহর কলকাতা বাংলার রাজধানী ১৪৯৫ বঙ্গাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে প্রথম উল্লেখ মেলে কলকাতার। তবে সে-এ শহর নয়, সে কলকাতা নামে কোনও এক নিরালা গ্রামের কথা। এমনকি, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিও বলেছে কলকাতা· নামে এক জনবসতির কথা। কিন্তু, রাজধানী কলকাতার সূচনা—শহর কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত রচিত হয়েছে বিদেশি বণিকদেরই হাতে। 'ভিড়ল তরী সওদাগরি কইলকাতার ঘাটে'—জন্ম নিল কলকাতা শহর। ১৬৯০ খৃস্টাব্দের ২৪· আগস্ট কলকাতায় এলেন ইংরেজ বণিক জোব চার্নক। এখানেই নগর কলকাতার শুরুর।

কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল

রাজধানী কলকাতা, পাশের হাওড়া, হুগলি, বসিরহাট সাব-ডিভিশন ছাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা—এই নিয়েই গড়ে উঠেছে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের পর্যটন বৃত্ত। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বৃত্তের মধ্যমণি—ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী নামে খ্যাত কলকাতা অবশ্যই যে কোনও পর্যটকের আকর্ষণের বস্তু। কী নেই কলকাতায়—রাইটার্স বিল্ডিং থেকে যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে সায়েন্স সিটি, নিক্কো পার্ক থেকে নন্দন—জোড়াসাঁকো, মিলেনিয়াম পার্ক থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ট্রাম থেকে মেট্রো—এই বিচিত্র আনন্দসম্ভার নিয়েই কলকাতা।

রেল-বিমান বা বাস সমস্ত দিক থেকেই কলকাতা পূর্ব ভারতের সংযোগবিন্দু। এয়ারপোর্টে অথবা হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে অথবা এসপ্ল্যানেডের বাসগুমটি থেকেই সরাসরি চলে আসুন কলকাতায়। নানা দামের নানা মাপের অজস্র হোটেল, গেস্টহাউস, বোর্ডিং আছে কলকাতার নানা প্রান্তে। শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে বিধাননগরে আছে পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশনের ট্যুরিস্ট লজ উদয়াচল। এসি/নন-এসি ঘরের সঙ্গে দুটি কনফারেন্স হল আর লনও আছে এদের। আর আছেন সদাপ্রস্তুত কর্মিবাহিনী। এই

পথেই বেরিয়ে পড়া যাক শহর পরিক্রমায়, পরিকল্পিত আধুনিক নগরী বিধাননগরে দেখে নিন বনবিতান, ছোটদের জন্য ডিজনিল্যান্ডের অনুকরণে তৈরি নিক্কো পার্ক, উঁকি দিতে পারেন নতুন প্রযুক্তির এলাকা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে, দেখে নিতে পারেন বিরাট স্টেডিয়াম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। শহরের ভিড় এড়াতে তৈরি হয়েছে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস, সে পথেই পৌঁছানো যেতে পারে সায়েন্স সিটিতে। ছোট-বড় অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম, বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা—অনুভব করার সুযোগ প্রায় দুর্লভ। আশ মিটিয়ে দেখে নিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির জগতকে। জুরাসিক অরণ্যে ডায়নোসর, সেরেঙ্গেটির নিবিড় অরণ্যের জীববৈচিত্র্য, মহাশূন্যে প্রাণের সন্ধান, টাইম মেশিনে মহাকাশ অভিযান, চোরাবালির গোলোকধাঁধা, গুহামানবের সঙ্গে পৌঁছে যান সৌরজগতে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত আটটা অবধি খোলা বিজ্ঞান নগরী। প্রবেশমূল্য ১৫ টাকা, স্পেস থিয়েটার ৩০ টাকা, টাইম মেশিন ১০ টাকা।

এরই বিপরীতে 'এনার্জি এডুকেশন পার্ক'। সারা পৃথিবীজোড়া জ্বালানির বিভিন্ন উৎসের সরল ভাষ্য। এখানে পরিচয় ঘটবে নানা বিকল্প শক্তির উৎসের সঙ্গে। প্রবেশমূল্য ২০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস সংস্থা পরিচালিত এই পার্কে রয়েছে ভারতের একমাত্র বিকল্প শক্তিতে পরিচালিত 'হাউস'। যাতে ১ ঘণ্টা কাটানোর মূল্য মাত্র ১০০ টাকা।

পার্ক স্ট্রিট ধরে চলে আসুন কলকাতার ফুসফুস ময়দানের আশেপাশে—দেখে নিন নেহরুর স্বপ্নে গড়া জওহর শিশু ভবন, পায়ে পায়ে চলে আসুন সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নন্দন চত্বরে। সারা বছরই এখানে উৎসব। নন্দনের সিনেমা, রবীন্দ্রসদন-শিশিরমঞ্চের গান-আবৃত্তি, আকাদেমির নাটক, বাংলা আকাদেমিতে আলোচনা সাহিত্য-সংস্কৃতির। এছাড়াও আছে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলা আকাদেমি বা তথ্যকেন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডার আর গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালা।

রাস্তা পার হলেই কলকাতার ইতিহাসের অন্দরমহল—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। অসাধারণ দুর্লভ সংগ্রহ আর সবুজের মাঝে শ্বেতমর্মরের আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইংলন্ড তথা ভারতেশ্বরীর স্মৃতি। ব্রিটিশ কলকাতার ইতিকথা। ঘোড়ায় টানা শখের ফিটন গাড়ি চড়ার আরাম এখানে দুর্লভ নয়।

আর একটু এগোলেই আরও ইতিহাস—ভারতীয় যাদুঘর। চৌরঙ্গির মোড়ে এই যাদুঘর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু বিচিত্র সংগ্রহে সমৃদ্ধ। এখানে আছে মানুষের চলমান জীবনবৃত্তান্ত আর চলতে চলতেই নিজেকে পিছন ফিরে দেখা বারবার। ১৮১৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে ইতালীয় স্থাপত্যরীতির অট্টালিকায় এর স্থায়ী ঠিকানা। কলকাতার যাদুঘরের ৩৬টি গ্যালারিতে আছে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপর্যায়। চার হাজার বছরের মিশরীয় মমি, ৪১৪টি উল্কাপিণ্ডের সংগ্রহ, ৫০,০০০ মুদ্রার সংগ্রহ, মূল্যবান মণিরত্ন, ১২ ফুট লম্বা কাঁকড়ার ফসিল, শাজাহানের পান্নার পেয়ালা, বুদ্ধের অস্থির আধার—অন্যদিকে আছে নানা ধর্মের নানা যুগের বিচিত্র শিল্পসংগ্রহ। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা, দর্শনী ৫ টাকা, কেবল শুক্রবার কোনও দর্শনী লাগে না।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পথেই দেখে নিতে পারেন বিড়লা তারামণ্ডল আর সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল। শহরের অন্যতম আকর্ষণ ক্যাথিড্রাল রোডের এই ক্যাথলিক উপাসনাগৃহটি ১৮৪৭ সালে বিশপ উইলসনের আগ্রহে শুরু হয়েছিল। ইন্দো-গথিক শৈলীতে ২৪৭ × ৮১ × ২০১ ফুট গীর্জাটি তৈরি করেছিলেন স্থপতি মেজর ডব্লিউ এন ফোবর্স, ব্যয় হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা।

চৌরঙ্গি ও সেক্সপীয়ার সরণির সংযোগস্থলে অবস্থিত বিড়লা তারামণ্ডলের যাত্রা শুরু করেছে ১৯৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। এই তারামণ্ডলটি ছত্রাকারে ছাদে নামিয়ে নিয়ে আসে সারা পৃথিবী। প্রতিদিনই বেলা ১২টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট অবধি চলে প্রদর্শনী, দর্শনী ১৮ টাকা।

এরপর চলে যেতে পারেন কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ আলিপুর চিড়িয়াখানায়। এর জন্ম ১৮৭৬ সাল। ৪৫ একর এলাকা নিয়ে রাজকীয় মহিমায় বিস্তৃত এই সংগ্রহটি। সরীসৃপের ঘর, বাঘ, সিংহ, জিরাফ, লিটিগন, টাইগন, শীতপাখিরা আসর জমিয়ে বসেছে এখানে। বৃহস্পতি ছাড়া অন্য দিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে, দর্শনী—৫ টাকা।

চিড়িয়াখানার পাশেই বিরাট প্রাঙ্গণ আর অসাধারণ স্থাপত্য নিয়ে অপেক্ষা করছে জাতীয় গ্রন্থাগার। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের পৌত্র মৃগয়াভবন গড়ে তুলেছিলেন বেলভেডিয়ারে। এটি পরবর্তীকালে ছিল ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বাসস্থান। ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এ রূপান্তরিত হয়। ১৭ লক্ষ বই এবং ৫ লক্ষ নথিপত্র আছে এর সংগ্রহে। প্রতিদিন প্রায় সহস্র মানুষ আসেন এই পাঠভবনে। সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৮টা অবধি খোলা থাকে এর দরজা।

জাতীয় গ্রন্থাগার রোডে আছে হরটিকালচারাল সোসাইটি। উদ্যানবিদ্যার এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করেছিলেন ১৮২০ সালে মিশনারী উইলিয়ম কারে। ৩৩ বিঘা নিয়ে গড়ে ওঠা এই মরূদ্যান বিচিত্র ফল, ফুল, অর্কিডের আয়োজনে সমৃদ্ধ। এখানে উদ্যানবিদ্যা শেখার কোর্সও চালু আছে, চালু আছে ফ্লোরিস্ট ও ফল-ফুলের চারার বিপণি। সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি এদের সম্পদ। সভ্য ছাড়া এখানে প্রবেশ নিষেধ হয়েছে সম্প্রতি, প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতির চেষ্টা করা যেতে পারে।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তের ঢাকুরিয়া লেক, তৎসংলগ্ন স্টেডিয়াম এক রমনীয় ভ্রমণবিন্দু। লেকের দক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট দ্বীপ, লেকের রোয়িং ক্লাব, মূল লেকের দক্ষিণতটে জাপানি বৌদ্ধ মন্দির, শিশুচিত্ত বিনোদনের শিশু উদ্যান ও টয় ট্রেন। সব মিলিয়ে সাঁঝ-বিহানে এর আকর্ষণ এড়িয়ে চলা ভার।

এই কলকাতায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুর পরিবারের বাসভবন ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়িটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি নামেই খ্যাত। এই বাড়িটি এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। মিউজিয়ম আছে রবীন্দ্র-স্মারক নিয়ে। কবিগুরুর জন্ম ও মৃত্যু এই বাড়িতেই। এখানেই আছে বহু রবীন্দ্র-রচনার স্মৃতির সম্ভার। প্রতিষ্ঠানটি সোম থেকে শুক্রবার



সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা, শনিবার সকাল ১০ থেকে ১টা এবং রবিবার ও ছুটির দিন সকাল ১১ থেকে ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। '১৯ শতকের নবজাগরণ ও ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা' প্রতিদিন প্রদর্শিত হচ্ছে ৪০ মিনিটের লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে। দর্শনী ১০ টাকা।

গুরুসদয় দত্ত রোডের মোড়ে আছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মিউজিয়ামটি বিজ্ঞানের নানা কৃৎকৌশল মডেলের মাধ্যমে সাজিয়েছে। বিজ্ঞানকে সহজ ও জনচিত্তজয়ী বিস্ময় হিসেবে উপস্থাপিত করেছে সংস্থাটি। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট অবধি খোলা, দর্শনী ৭ টাকা।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৪০০ একর জমি নিয়ে হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে গড়ের মাঠ। এখানে বিস্তৃত মাঠ ছাড়াও আছে বিভিন্ন ক্লাবের প্র্যাকটিস এরিয়া, গ্যালারি, রঞ্জি স্টেডিয়াম, পৃথিবীখ্যাত ক্রিকেট মাঠ ইডেন উদ্যান, এমনকি ইন্ডোর গেমস-এর জন্য তৈরি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামও। এককথায় বলা যায়, কলকাতা খেলার দুনিয়া গড়ে উঠেছে ময়দানেরই ঠিকানায়।

গড়ের মাঠে বা ময়দানেই ফোর্ট উইলিয়ম। ১৭৮১ খিস্টাব্দে ২ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে ময়দানের নীচে গড়ে ওঠে এই অনন্য গড় বা ফোর্ট। ইংলন্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে এর নাম হয় ফোর্ট উইলিয়াম। ৭টি প্রবেশপথ আছে ৫৩২ বিঘা জুড়ে গড়ে ওঠা বর্তমান ইস্টার্ন কমান্ডের এই সদর দপ্তরের। এখানে ১০,০০০ সেনানীর বসবাসের ব্যবস্থা ছাড়াও আছে প্রমোদ ভবন, সিনেমা হল, সেন্ট্রাল স্কুল, বাজার-হাট, ব্যাঙ্ক এমনকি চার্চও আছে নগরীতে। ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে প্রবেশাধিকার মেলে, বিশেষ বিশেষ কিছু দিনেও এর দরজা সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

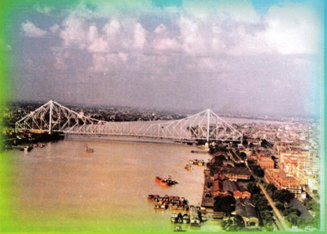
১৮২৮ সালে নেপাল জয়ের স্মারক হিসেবে ইংরেজ গড়ে তুলেছিল অক্টারলোনি মনুমেন্ট। ২১৮টি সিঁড়ি নিয়ে গড়া মিনারটির স্থাপত্য সিরিয়ান, ইজিপ্সিয়ান ও তুর্কি নির্মাণরীতির এক অনবদ্য মিশ্রণ। এই মিনারের চূড়া থেকে সারা কলকাতা দেখা যায় ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের অনুমতি পেলে। ৫২ মিটার উচ্চতার এই মিনারটি এখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিতে 'শহিদ মিনার' নামে অভিহিত। প্রতি সন্ধ্যায় আলোকসজ্জায় সজ্জিত শহিদ মিনার শহরের গর্ব।

ময়দানের অন্য প্রান্তে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর একটি দর্শনীয় সৌধ। ১৯০৬-এ শুরু হয়ে স্যার উইলিয়াম এমার্সনের হাতে গড়া প্রাসাদটি শেষ হয়েছিল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। লর্ড কার্জনের উদ্যোগে রাজা-মহারাজাদের দানে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬ হেক্টর জমি জুড়ে শ্বেতমর্মরে ২০০ ফুট উচ্চতার এ সৌধ গড়ে উঠেছে। এর অন্দরে-বাহিরে আছে পুরনো ভারতবর্ষ, এমনকি কলকাতারও নানা বিচিত্র স্মৃতিচিত্র, মাথার উপরে আছে ভিকট্রি অর্থাৎ জয়ের প্রতীক ৩ টনের ব্রোঞ্জের কালো পরী। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে প্রদর্শনী, দর্শনী ২ টাকা।

এখানেই শীত-গ্রীষ্মে সন্ধ্যায় এক ঘন্টার জন্য চলে কলকাতার ইতিহাস নিয়ে প্রদর্শনী। জোব চার্নকের ভারতে আগমন থেকে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ইতিহাসের বর্ণনা আছে এই প্রদর্শনীতে। দর্শনী ৫ ও ১০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটনের দুটি কনডাকটেড ট্যুর আছে কলকাতা দেখার। প্রথম ট্যুরটি প্রতিদিন বি-বা-দী বাগ থেকে রওনা হয়ে ইডেন গার্ডেন, দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ, বেলুড় মঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, জওহর শিশু ভবন, চিড়িয়াখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার, গঙ্গা দেখিয়ে এসপ্ল্যানেড ফেরে বিকাল পাঁচটায়। দ্বিতীয় ট্যুরটি সকাল ৮-৩০টায় রওনা হয়ে ইডেন গার্ডেনস। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, জৈন মন্দির, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নিক্কো পার্ক, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, বটানিক্যাল গার্ডেন, বিদ্যাসাগর সেতু দেখিয়ে কলকাতা ফেরে বিকেল ৫-৩০টায়। দুটিরই ভ্রমণ-মূল্য—১০০ টাকা। আসন সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ট্যুরিজম সেন্টার, ৩/২ বি-বা-দী বাগ (ইস্ট) অথবা হাওড়া রেল স্টেশনে পর্যটন দপ্তরের বুথে। এছাড়াও ছুটির দিনে সুযোগ মেলে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের।

শিল্পনগরী হাওড়া



হাওড়া ব্রিজ

ছবি অরিজিৎ ভট্টাচার্য

খুব অল্পের জন্য **উলুবেড়িয়ার** 'কলকাতা' হওয়া হয়ে উঠল না। সঠিকভাবে বলতে গেলে বাংলার হৃৎপিণ্ড হওয়া হল না। সেই ১৬৮৮ সালের কথা। উলুবেড়িয়াকে ডক তৈরি ও জাহাজ মেরামতের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জোব চার্ণককে একটি নির্দেশ পাঠায়। তাতে বলা হয়, মোগল দরবার থেকে প্রয়োজনীয় ফরমান জোগাড় করা গেলে ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি উলুবেড়িয়াতেই করা উচিত। কিন্তু জোব চার্ণক উলুবেড়িয়ার তুলনায় সুতানুটিকেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে যোগ্যতর বিবেচনা করলেন। তারপর ১৬৯০-এর ২৪ আগস্ট চার্ণক সুতানুটিতে পৌঁছলেন। তারপর তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে সেদিনের সুতানুটি আজকের কলকাতা হল। তবে সে ভিন্ন কাহিনী। এখানে আমরা একবিংশ শতকের হাওড়ার মহকুমা শহর উলুবেড়িয়া ও আশপাশের আরও কিছু জায়গার কথা বলব।

প্রাচীন শহর উলুবেড়িয়া। বাণিজ্য কেন্দ্র উলুবেড়িয়া। হাওড়া স্টেশন থেকে সকালের দিকে খান-দুয়েক উলুবেড়িয়া লোকাল ছাড়া আরও বহু ট্রেন উলুবেড়িয়া ছুঁয়ে চলে যায় তাদের গন্তব্যে। শুধু সপ্তাহান্তেই নয়, যে কোনও মন-খারাপ-করা মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতিতেও হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে একঘণ্টার দূরত্বে উলুবেড়ে স্টেশনে নেমে পড়ুন। ওভারব্রিজ পেরিয়ে চলে আসুন রিকশাস্ট্যান্ডের দিকে। রিকশার লম্বা লাইনের ওপাশে পরপর অনেকগুলো মিষ্টির দোকান। হাওড়ার বিখ্যাত মাখা সন্দেশ, মিল্ক কেক, আর রকমারি মিষ্টির পশরা সাজিয়ে তারা অপেক্ষারত। হাসপাতালের পাশের রাস্তা দিয়ে বাঁদিকে ঘুরে সোজা খানিকটা গেলে কোর্ট চত্বর। আদালত প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর এই সড়কের পোশাকি নাম ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড (ডাকনাম কটক রোড)। প্রায় ১৭২ বছর বয়সী এই প্রাচীন পথটি শুধু যে পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের সোজা পথে যাতায়াতের কথা ভেবেই তৈরি হয়েছিল, তা নয়। আসল কারণ ছিল রাজনৈতিক। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ওড়িশার বিভিন্ন করদ রাজারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী



বেলুড়ের মন্দির

ছবি পঃ বঃ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

হয়ে উঠেছিলেন। ভাল সড়ক যোগাযোগ না থাকায় সে বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ ফৌজ পাঠানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। ঠিক এরকম সময়ে কলকাতার পোস্তা রাজবাড়ির ধনকুবের মহারাজা সুখময় রায়বাহাদুর পায়ে হাঁটা পথে পুরী যাতায়াতের কথা ভেবে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পথ নির্মাণের প্রস্তাব করায় ইংরেজ শাসকদের সামনে সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮১১ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে ইংরেজ সরকার স্পষ্টই জানায়, 'It is however still more requisite in a military point of view'। সুখময় রায় প্রদত্ত দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে উলুবেড়িয়া থেকে পুরী পর্যন্ত প্রায় ২৮০ মাইল দীর্ঘ পথটির নির্মাণকাজ ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে ১৮২৯-এ শেষ হয়। সেদিনের সেই পথচারী তীর্থযাত্রীদের একটু ছায়া একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য পথের ধারে বেড়ে ওঠা বৃক্ষরাজির কিছু যে আজও দাঁড়িয়ে আছে একথা হলফ করে বলা যায়।

যাই হোক, আদালত চত্বরকে উলুবেড়িয়া শহরের কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে। আর কয়েক পা এগোলেই ভাগীরথী। ওপারে বজবজের কারখানার চিমনি দেখা যায়। চওড়া নদীবক্ষে নৌকো পারাপার এক রমণীয় অভিজ্ঞতা। কলকাতা বন্দরগামী দু-একটা বিদেশি জাহাজ বড় বড় ঢেউ তুলে কখনও সখনও চলে যায়। নদীর পাড় ধরে একটা চক্কর দিয়ে পথ একসময় গিয়ে ঠেকে একটা গোল পার্কে। সেখানে কতকগুলো বেঞ্চি ফেলা। সেই বেঞ্চিতে বসে নদীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে বুঝতে পারবেন আপনি আর ঘড়ির শাসনাধীনে নেই। নদীর গন্ধ আর শব্দ অন্তরাত্মায় মেখে নিয়ে ধীর পায়ে আবার আদালত চত্বরে। এখান থেকে ট্রেকার, বাস বা অটোতে চড়ে যাওয়া যায় গড়চুমুক। সাইকেল রিকশাতে এলোমেলো হাওয়ায় পৌঁছে যাওয়া যায় ফুলেশ্বরে। আর ওদিকের বাসে উঠে বসলে সোজা গাদিয়াড়া। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে ইদানীং গাদিয়াড়া একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। ভাগীরথীর সঙ্গে রূপনারায়ণের দেখা হয়েছে এখানে। বড় মনোরম প্রকৃতি—স্বচ্ছ নীলে নীল আকাশ, সবুজ গাছের সারি, জলের ছলাৎ ছলাৎ ছন্দ, চারপাশে একটা নোনা গন্ধ—দূষণমুক্ত চরাচর যেন নিজের সৌন্দর্যে কেমন বুঁদ হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ' আছে এখানে। বনভোজনের জন্য ছাউনির ব্যবস্থাও আছে। বোটিং-এর ব্যবস্থাও আছে।

উলুবেড়িয়া কোর্ট থেকে ৭০ নম্বর বাসে চড়ে যাওয়া যায় গড়চুমুক। পুবে হুগলি নদী, পশ্চিমে দামোদর নদ। ৫৮টি স্লুইস গেট আছে বলে স্থানীয় লোকের মুখে ৫৮ গেট নামটাই বেশি ঘোরফেরা করে। এখানেও বোটিং-এর ব্যবস্থা আছে। আর আছে খালের পাড় ধরে ৩ হেক্টর জুড়ে সংরক্ষিত বন, ডিয়ার পার্ক। হাওড়া জেলা পরিষদের ৩ ঘরের একটি হলিডে হোম আছে। রাত্রিবাসের উপযুক্ত। তাছাড়া সেচ দপ্তরের একটি বাংলোও আছে।

হুগলি



হংসেশ্বরী মন্দির

ছবি উদয়ন মজুমদার

কলকাতার পাশেই হুগলি। এই জেলার ভ্রমণ মানচিত্রে **ব্যান্ডেল চার্চ** একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৫৭৯-তে হুগলি নদীতটে বন্দরের পত্তন করে পর্তুগিজরা। ১৫৯৯-তে গড়ে ওঠে ব্যান্ডেল চার্চ। কুমারী মাতা মেরিই ব্যান্ডেল চার্চের মূল উপাস্য। গ্রিসের ডোরিক স্থাপত্যে গড়া চার্চটি পর্যটকদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষক। ফরাসি রাজত্বের সাক্ষ্য বহন করছে **চন্দননগরও**। গঙ্গাতীরের ব্যান্ডস্ট্যান্ড মনোরম। হাওড়া থেকে বর্ধমান বা ব্যান্ডেল লোকালে সহজেই পৌঁছানো যায়। ব্যান্ডেল চার্চ থেকে ২ কিমি দূরে **ইমামবাড়া**। ১৮৬১-র এই মসজিদটি স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। ব্যান্ডেল থেকে চার কিলোমিটার দূরে **বাঁশবেড়িয়া**। এখানকার **হংসেশ্বরীর মন্দির** গঠন ও স্থাপত্যে অনন্য।

দেবানন্দপুরে আছে আর এক স্মৃতিমন্দির। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমিকে তৈরি হয়েছে মিউজিয়াম। এছাড়া আছে **পাণ্ডুয়ার** ইতিহাসের আরও কিছু গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ। এখানেই বসে পেড়োর মেলা।

ধর্মতলা থেকে সি এস টি সি-র বাস যাচ্ছে ৪৭ কিলোমিটার দূরে **আঁটপুরে**। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের পথ। আটটি গ্রাম নিয়ে আঁটপুর। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজার আট সেনাপতির বাসস্থান আটগ্রাম নিয়ে আঁটপুর। কিন্তু আঁটপুরের প্রসিদ্ধি তার নটি মন্দিরের জন্য। ১৭৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে পোড়ামাটি কাজের এই মন্দিরগুলি তৈরি করেছিলেন বর্ধমান রাজের দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্র। মূল মন্দির আটচালা শৈলীতে তৈরি। প্যানেলের ভাস্কর্য ও বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে সে যুগের সমাজচিত্রও আছে এইসব প্যানেলে। এই মন্দির-মসজিদ-গির্জা আর প্রকৃতি—এই নিয়েই হুগলি জেলার পর্যটন সমৃদ্ধি।

উত্তর ২৪ পরগনা

ব্যারাকপুর

কলকাতা থেকে সামান্য দূরত্বে ব্যারাকপুর। এখানে ব্রিটিশ আমল থেকে আছে সেনানিবাস। লাটবাগানে লর্ড কার্জনসহ ব্রিটিশ শাসকের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। আছে লেডি কার্জনের সমাধি। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনায় মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসিও হয়েছিল এখানে। ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে আছে গান্ধী স্মারক মিউজিয়াম। ধীরপ্রবাহিনী গঙ্গা এই ইতিহাসের নিয়ত সাক্ষ্য বহন করছে। গঙ্গাতীরেই আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পর্যটন আবাস **'মালঞ্চ'**। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে আসুন ব্যারাকপুর অথবা ধর্মতলা থেকে বাসে।

চন্দ্রকেতুগড়

কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে টাকি রোডে বারাসত-বসিরহাটের মাঝামাঝি বেড়াচাঁপা। বাস থেকে নেমে ভ্যানে হাড়োয়ার দিকে গেলে পথে পড়বে চন্দ্রকেতুগড়। দেবালয়, হাজিপুর, শানপুকুর। ঝিকড়ার ৩ বিগকিমি জুড়ে ২৫ ফুট উঁচু মাটির ঢিপি। এখানেই পাওয়া গেছে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, সেন ও পালযুগের নিদর্শন। এখানেই মিলেছে এই ঢিবির নিচে এমন কি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের খরোষ্ঠী লিপিরও সন্ধান মিলেছে এখানে। শোনা যাচ্ছে, টলেমি বর্ণিত গঙ্গারিডি নাকি এখানেই। ধর্মতলা থেকে হাসনাবাদ-ন্যাজাট-বসিরহাটের বাসে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে যেতে পারেন বেড়াচাঁপা। থাকার ব্যবস্থা নেই চন্দ্রকেতুগড়ে। তবে দিনে দিনে অনায়াসে দেখে আসা যায় প্রাচীন সভ্যতার এই ধ্বংসাবশেষ।

টাকি

ইছামতীর তীরে টাকি বর্ধিষ্ণু শহর। জমিদার রায়চৌধুরীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের স্বপ্ন এখানে অনেকখানি সার্থক। ইছামতীর নদীপথে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই **টাকি-হাসনাবাদ**। নদীর অপরপারে বাংলাদেশ ছবির মতো। নদীতীরে টাকি মিউনিসিপ্যালিটির গেস্ট হাউস—নৃপেন্দ্র অতিথিশালা। (বুকিং, চেয়ারম্যান, টাকি পৌরসভা, দূরভাষ—০৩২১৭ ৪৭৩২৮) সপ্তাহান্তিক বিশ্রাম অথবা পিকনিকে পৌঁছে যেতে পারেন অনায়াসে। শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদ লাইনের ট্রেনে অথবা ধর্মতলা থেকে হাসনাবাদ-টাকি বাসে অনায়াসেই চলে যেতে পারেন।

রাজহাটের ময়ূর

অংশুভূষণ ঘোষ

হুগলি জেলার রাজহাট একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অনেক গ্রামের মতোই বাড়ি, বাগান, পুকুর, ছায়ায় ঘেরা পথ, পাখির ডাক সবই বর্তমান এখানে। কিন্তু অন্যান্য গ্রামের থেকে ব্যতিক্রম এই যে, রাজহাট গ্রামে দলে দলে চরে বেড়ায় ময়ূর।

ব্যান্ডেল স্টেশনের খুবই কাছে এন এইচ ২-এর লাগোয়া পোলবা ব্লকের রাজহাট গ্রামে। জাতীয় সড়ক ফেলে গ্রামের পথে হাঁটতে শুরু করলেই দেখা যাবে বিশাল বাঁশবন, আমবাগান। আশেপাশেই মানুষের বসতি। আর ওই বাঁশবনে, আমবাগানে বা বাগান সন্নিহিত খোলামাঠে দেখা যায় ময়ূর।

মূলত কৃষিপ্রধান রাজহাট গ্রামের মানুষেরা গ্রামের এই ময়ূর সম্পর্কে খুবই গর্বিত। নবাগত কোনও ব্যক্তিকে বাঁশবাগান বা আমবাগান অঞ্চলে ঘুরতে দেখলেই নিজের থেকেই এগিয়ে আসেন, ময়ূর সম্পর্কে তথ্যাদি জানান এবং অনেক সময়ই নিজের কাজ ফেলে রেখেও সঙ্গে এসে দর্শকদের ময়ূর দেখতে সাহায্য করেন। স্থানীয় মানুষের কথাবার্তায় বোঝা যায় যে, এই গ্রামের গর্ব ময়ূরকে তাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রার শরিক বলেই মনে করেন এবং ময়ূরদের প্রতি তাঁরা যথেষ্ট মমতাশীল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ময়ূরেরা যদিও ধানক্ষেতে চলে আসে এবং প্রায়শই ধান খেয়ে যায়, তাতে কৃষকের খাদ্যের ভাগে হয়তো টান পড়ে কিন্তু তার জন্য ময়ূরদের প্রতি কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা বিরূপ মন্তব্যের কথা শোনা যায় না। গ্রামস্থ লোকজনের সঙ্গে ময়ূরদের সহাবস্থান সহজেই বোঝা যায়। মাঠে যখন লাঙল দেওয়া হয় এই ময়ূরেরা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে অবাধে। লাঙলের ফলার টানে যে সমস্ত পোকা, কেঁচো ইত্যাদি উঠে আসে তা ময়ূরের অন্যতম খাদ্য। একাধিকবার রাজহাট ঘুরে এসে এবং একাধিক স্থানীয় লোকের কাছে শুনে একথা মনে হয়েছে যে বহিরাগত, বিশেষত প্যান্টশার্ট ইত্যাদি পোশাক পরা দর্শকদের কাছাকাছি হতে এই ময়ূরেরা বিশেষ ভয় পায়। হতে পারে সেটা তাদের পুরুষানুক্রমে এই ধরনের লোকজন না দেখার অভ্যাস থেকে গড়ে উঠেছে। ময়ূরকে যাতে কেউ তাড়া না করে বা ভীতি প্রদর্শন না করে এ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা সচেতন। এ ছাড়াও ময়ূরের বাচ্চা বা ডিম নষ্ট না করা বা ময়ূরের প্রজনন সময়ে তাদের বসবাস এলাকায় গিয়ে বিরক্ত না করা ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁদের অনেককেই বেশ সচেতন বলে মনে হয়। তবে একটি বিষয়ে সবাই বেশ চিন্তিত বলে বোঝা গেল। ময়ূরদের পূর্বতন বিচরণক্ষেত্র যা রাজহাট উত্তরপাড়া এলাকাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, তা আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে ময়ূরের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে রাজহাট দক্ষিণপাড়া গান্ধীগ্রাম জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন এলাকায় দিল্লি রোড অতিক্রম করে বারাকপুরের বাঁশবন এলাকায় ও আশপাশের অন্যান্য গ্রামে যথা আমপালা, আলিয়াসপুর ইত্যাদিতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। কারণ হিসাবে একথা মনে করা হচ্ছে যে, লোকবসতি ক্রমশ বাড়ার ফলে বড় বড় গাছ ও ঘন বাগান ও জঙ্গলের পরিমাপ কমে আসা এবং ময়ূরদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় একটি নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ এলাকায় খাদ্যের অভাব ঘটা।

উল্লেখ্য, বনবিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কোনদিন্ন ময়ূর শুমারি হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে রাজহাট এলাকায় বর্তমানে ময়ূরের সংখ্যা শতাধিক। সংখ্যাটি নিতান্তই আনুমানিক। বিশেষত ময়ূরের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ার ফলে তাদের মোট সংখ্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া সাধারণ গ্রামবাসীদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। ধীরগতিতে হলেও ময়ূরের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধমান। যদিও একথা ঠিক যে শরৎকালের মাঝামাঝি ময়ূরীরা যত ডিম পাড়ে তার কিছু অংশ কুকুর, ভোঁদড়, গোসাপ ইত্যাদি প্রাণীর দ্বারা বিনষ্ট হয়। কদাচিৎ সামান্য সংখ্যক ডিম নিয়ে আসেন, যাঁরা জঙ্গলে কাঠ ইত্যাদির সন্ধানে যান এবং সেই ডিম মুরগির সাহায্যে তা দিয়ে ফোটাবার চেষ্টা করেন। এ ছাড়াও ডিম পাড়ার উপযুক্ত নিচু এবং গোপন ঝোপঝাড়ের অভাবে ময়ূরীরা রাজহাট এলাকার বাইরে ডিম পেড়ে আসে যার হিসাব রাখা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। মৃত্যুর হার আজ পর্যন্ত কোনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছায়নি। কোনওভাবে বিষাক্ত খাবার খেয়ে বা জাতীয় সড়কে বড় গাড়ি ইত্যাদির ধাক্কায় ময়ূর কখনও মারা গেলেও সে সংখ্যা খুবই নগণ্য।

বারাকপুরের জঙ্গল থেকে শুরু করে রাজহাট উত্তর ও রাজহাট দক্ষিণ গান্ধীগ্রাম হয়ে উত্তরদিকে বাড়ল, তারাবিহারী ইত্যাদি গ্রামে ঘুরে এই এলাকার যে জৈব বৈচিত্র্যের (Biodiversity) পরিচয় পেয়েছি তা সত্যই অপূর্ব। ময়ূর ছাড়াও নানাধরনের পাখি যেমন বুলবুল, দুর্গাটুনটুনি, বেনেবৌ, টিয়া, ঘুঘু, হাঁড়িচাচা, কুবো, ফিঙে, মাছরাঙা, ডাহুক, পানকৌড়ি ইত্যাদির সমাবেশ একটু নির্জন জায়গা হলেই চোখে পড়ে। বিশেষত খুব সকালে বা পড়ন্ত বিকালে বারাকপুরে, গান্ধীগ্রামে এবং কুন্তী নদীর আশেপাশে দেখা যায় এই সব পাখিদের। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বেজী, ভাম, শেয়াল নানা ধরনের সাপ, গোসাপ, গিরগিটি ইত্যাদির দেখা মেলে। প্রাণীজগৎ ছাড়াও উদ্ভিদ এবং বৃক্ষকূলের বৈচিত্র্যের এক সমন্বয় দেখা যায় এই অঞ্চলে।

যে সমস্যাগুলি আপাতত ময়ূরদের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রথমত তাদের বাসস্থান জনিত সমস্যা। যখন গৃহনির্মাণ কল্পে বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোনও বড় গাছ কাটা হয় তাতে কিছু পরিমাণ হলেও ময়ূরদের বাসস্থানের অভাব ঘটে। রাজহাট



রাজহাটের ময়ূর

ছবি সৌজন্য বনবীথি

উত্তরপাড়ায় ময়ূরদের মূল বিচরণক্ষেত্র থেকে তাদের ক্রমশ দূরে চলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ময়ূরদের জন্য একটি স্থায়ী আশ্রয় প্রকল্প গড়ে তোলা এলাকার ময়ূরপ্রেমী মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি। কয়েকবছর আগে এই দাবি নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কিছু লেখালেখি হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা একেবারেই ফলপ্রসূ হয়নি। বর্তমানে World of Animals and Verdant Environment (W. A. V. E.) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ময়ূর সংরক্ষণ ও আশ্রয় প্রকল্প গঠন কাজে এগিয়ে এসেছে এবং কাজকর্ম শুরু করেছে।

দ্বিতীয়ত এই অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু ইটভাঁটা, যারা চড়া দামে উঁচু জমির মাটি এক বা দেড়ফুট গভীর করে কেটে কাঁচামাল হিসাবে কিনে নেয়। জমির মালিক উচ্চমূল্য পেয়ে নির্বিচারে বিক্রি করে মাটি। আর এই মাটি কেটে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাটা পড়ছে গাছ এবং বিশেষ করে সাফ হয়ে যাচ্ছে ছোটখাটো ঝোপঝাড় এবং ঘাস জঙ্গল।

তৃতীয়ত ময়ূরেরা প্রায় সবরকম ফল, শস্য, পোকামাকড়, সাপ, কেঁচো ইত্যাদি সবই খায় এবং বনে বাগানে চড়ে এরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্যসংস্থান করে থাকে। সমস্যা দেখা দেয় বর্ষাকালের তিন মাস। বৃষ্টি চলাকালীন ময়ূরেরা গাছে বসেই সময় কাটায়। (বর্ষা আসার আনন্দে ময়ূর নাচে বটে কিন্তু ময়ূরেরা সাধারণত ভিজতে ভালোবাসে না।) এ ছাড়াও বর্ষাকালে সাধারণত পোকামাকড় ইত্যাদি অপ্রতুল থাকে বলে ময়ূরেরা খাদ্যাভাবে পড়ে। এ সময় কিছু দানাশস্য জাতীয় জিনিস যথা গম বা ধান ইত্যাদি সরবরাহ করা ও দৈনিক বন্টন করা গেলে এই খাদ্য সমস্যা অনেকটাই মেটে।

এলাকাটি যখন বনদপ্তর, বর্ধমান বিভাগের অধীন ছিল, তখন সরকারিভাবে ময়ূর সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, কিছু নিষেধাজ্ঞা এবং ময়ূর সম্পর্কে সাবধানতা সম্বলিত টিনের বোর্ড টাঙানো হয়েছিল। কালের প্রভাবে সেগুলি জীর্ণ এবং বিবর্ণ। যতদূর জানা যায় এককালীন কিছু অর্থও মঞ্জুর হয়েছিল সংরক্ষণ বাবদ যদিও কাজের কাজ কিছু হয়েছিল বলে ধারণা হয় না। পরবর্তীকালে বর্ধমান বিভাগ থেকে এলাকাটি হাওড়া বিভাগের হাতে আসে। ময়ূর সংরক্ষণ বিষয়ে উৎসাহী স্থানীয় ব্যক্তিগণের থেকে জানা যায় যে হাওড়া বিভাগে স্থানান্তরিত হবার পর থেকে কোনদিন সরকারি পর্যায়ে এ ব্যাপারে আর কোনও কাজকর্ম হয়নি। স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন উঠে আসে, যে সরকারি বদান্যতায় গড়ে উঠেছে পারমাদান বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য বা বেথুয়াডহরির অরণ্য বা সাম্প্রতিক কালে রাজপুর নরেন্দ্রপুর অঞ্চলে মৃগদাব। উক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বন্যপ্রাণী যথা হরিণ ইত্যাদি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে গিয়ে তাদের পালন, পোষণ করা হচ্ছে। অথচ রাজহাটের মতো এলাকায় যেখানে ময়ূর স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির কোলে বিচরণশীল এবং আশেপাশে বিশেষ করে কুন্তী নদীর তীরবর্তী এলাকায় সংরক্ষণজনিত প্রয়োজনে ময়ূর অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উপযুক্ত বাতাবরণ রয়েছে সে ক্ষেত্রে রাজহাট বঞ্চিত কেন ? মাননীয় সরকারের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান এলাকার মানুষজন।

রাজহাট থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ময়ূরমহল উৎসাহী ভ্রমণার্থী তথা বনভোজন পিয়াসী জনগণের কাছে একটি পরিচিত নাম। বিশেষ করে শীতের দিনে ময়ূরমহলের দুটি বাগানের পিকনিক স্পটগুলি ভরা থাকে মানুষের ভিড়ে। ওই ময়ূরমহল থেকে রাজহাট হাইস্কুল পর্যন্ত গ্রামের মধ্যে রাস্তা বরাবর উৎসাহী দর্শকদের ময়ূর দেখানোর ব্যবস্থা করা হলে একটি সম্পূর্ণ পরিবেশ সহায়ক পর্যটন প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত নজরদারির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাতে অত্যুৎসাহী দর্শকের হাতে ময়ূর উৎপীড়িত না হয়। দরকারে এ জন্য দর্শনার্থীদের থেকে প্রবেশমূল্য নেওয়া যেতে পারে এবং সংগৃহীত অর্থ ময়ূর কল্যাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ভাতা বাবদ ব্যয় করা যেতে পারে।

স্থানীয় মানুষেরা উদ্যমী, উৎসাহী— ময়ূরদের তাঁরা আপনজন বলে ভাবেন। সেই ময়ূরদের একটি সুষ্ঠু স্বাভাবিক এবং স্থায়ী আশ্রয় যদি সরকারি সহৃদয়তায় গড়ে ওঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়, সাধারণ মানুষেরা সহযোগিতায় কার্পণ্য করবেন না। ময়ূর সংরক্ষণ তথা পরিবেশ সহায়ক একটি পর্যটন প্রকল্প যদি সত্যিই রূপায়িত হয় তবে এলাকার জনসাধারণের দীর্ঘদিনের এক প্রত্যাশা পূরণ হবে।

ধান্যকুড়িয়া

লেখা ও ছবি - পি অধিকারি



ধান্যকুড়িয়ার ঐতিহ্যশালী সিংহদরজা

'ধান্যকুড়িয়া' নামটিতেই এক গ্রাম্য সুন্দর, স্নিগ্ধ ছোঁয়া আছে যেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা ছোট্ট গ্রাম ধান্যকুড়িয়া। বারাসাত থেকে বসিরহাটের দিকে মাত্র ২০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রামটি। বারাসাত-বসিরহাট সংযোগ রাস্তার উপর বিশাল সিংহ দরজাটা জানিয়ে দেবে আপনি পৌঁছে গেছেন ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামটিতে। আপাতত রাস্তার ধারের এই বিশাল প্রাসাদটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনাথ আশ্রম। গ্রামের ভিতরে আরও পাঁচটা রাজবাড়ি বা জমিদারি বাড়ি ও কিছু পুরনো মন্দির আছে। এই বাড়িগুলির কোনটা গায়েনবাড়ি, কোনটা বল্লভবাড়ি বা কোনটা সেনবাড়ি নামে সাধারণের কাছে পরিচিত। প্রতিটা মূল বাড়ির আবার একটা করে বাগানবাড়ি বর্তমান—যার মধ্যে বহু বিঘে জমি, বেশ বড় বড় পুকুর ও নানারকম ফল-ফুলের গাছে ভরা। এর অনেকটাই ভগ্নদশায় পরিণত। বাড়িগুলোর নির্মাণশৈলী মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। প্রতিটি বাড়ির নির্মাণকৌশল প্রায় এক রকম অনেকটা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বা শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো। মূলত প্রতিটা বাড়িই তৈরি হয়েছে একটা নাটমন্দিরকে কেন্দ্র করে। মন্দির দালানের সামনেই একটা বড় সুসজ্জিত চাতাল এবং ওই চাতালকে কেন্দ্র করে চারিদিকে দ্বিতলের ও একতলার ঘরগুলো তৈরি হয়েছে। যে কোনও ঘর থেকেই নাটমন্দিরকে দেখা যাবে। বল্লভ বাড়িটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যাম বল্লভ। প্রায় ২৫০—৩০০ বছর আগে (আনুমানিক) বাড়িগুলো তৈরি হয়। এই শ্যামবল্লভ মহাশয়ের নামেই বর্তমানে কলকাতার শ্যামবাজার নামকরণ হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের জীবিকা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল। প্রতিটা বাগানবাড়িকে ঘিরে রয়েছে একাধিক বড় বড় পুকুর—তাতে সুন্দর ঘাট বাঁধানো। শোনা যায় এই ঘাটগুলির দুপাশে সুন্দর কারুকৃতির স্তম্ভ এবং স্তম্ভের উপর অপূর্ব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্তু আজ তার কিছুই চোখে পড়বে না। ঘাটগুলিও প্রায় ধ্বংস হয়েছে। এখানকার বয়স্কদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় পুরনো দিনের নানা চাঞ্চল্যকর গল্প।

এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামটির খ্যাতি এখনও টিকে আছে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। প্রায় প্রতিটি বড় বাড়িতেই দুর্গাপূজা হয়। সারা গ্রাম রাজকীয় বৈভবে জেগে ওঠে। দুর্গাপূজা দেখতে, বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে পূজার একটি দিন একটু অন্য রকমভাবে কাটানো যেতে পারে।



গায়েন বাড়ির নজরমিনার এখনও বর্তমান

মেদিনীপুরের নানা মন্দির

পাথরা ও জিনশহর

ঋগ্বেদে যে নদীর নাম ছিল কপিশা, এখন তার আটপৌড়ে নাম কাঁসাই। মেদিনীপুর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এর নমনীয় ধারা। কাঁসাই-এর উত্তর তীরে আছে ভাঙা দেউলের এক ঐতিহাসিক গ্রাম। আট-নশো বছরের ধূসর ইতিহাস সারা গ্রাম জুড়ে। একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতক, এই গ্রাম ছিল হিন্দুধর্মের এক উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। সেই সময়ের ৩২টি মন্দিরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কিছু ভেঙেছে। কিছু ভাঙছে, কিছু বা জরাজীর্ণ, মূলত মন্দিরগুলো কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও শিবকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছিল।

ভাঙা দেব-দেউলের এই গাঁয়ের নামটাও ভারী মিষ্টি। পাথরা। মেদিনীপুর শহরের প্রান্তে কাঁসাই-এর ওপর সুদীর্ঘ বীরেন্দ্রসেতু। এরই উত্তর দিকে আট কিমি দূরে পাথরা। নদীর তীর বরাবর রাস্তা চলে গেছে। একমাত্র বাহন রিকশা, সময় লাগবে প্রায় ঘণ্টাখানেক। হাতিহোলকায় পীরবাবার সমাধিস্থল দেখে এগিয়ে যেতে হবে পাথরার দিকে।

একসঙ্গে যেন জোট বেঁধেছে মন্দির, ৫০ ফুটের মন্দির যেমন আছে, আছে তেমন ১৫ বা বিশ ফুটেরও। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগে এসব মন্দির দেখতে।

পাথরা থেকে যাওয়া যায় জিনশহরে। জিনশহর কোনও শহর নয় গ্রাম। অতীতে কোনও এক সময়, সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন মুনিরা এখানে বসতি স্থাপন করে। বীরেন্দ্রসেতু পেরিয়ে চলে যেতে হবে আরও ৪ কিমি পুবদিকে। নামতে হবে জাতীয় সড়কের আগে। তারপর উত্তরদিকে মাইলখানেক হেঁটে কাঁসাই-এর তীরে এই জিনশহর। ল্যাটেরাইট পাথরের এক জৈন মন্দিরের কাছেই শিব আর বিষ্ণুর দুটি মন্দির।

কর্ণগড়

মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় কিমি দশেক দূরে কর্ণগড়। একদা সিংহ রাজাদের রাজধানী। মেদিনীপুর শহর থেকে নানাদিকে নানা বাস গেছে। লালগড়, হুমগড় বা আমলাসুলির বাসে চড়ে বসতে হবে। ভাদুতলার মোড়ে নেমে কিমি তিনেক রিকশায় বা হেঁটে কর্ণগড়। রাজা কর্ণকেশরী সিংহের নামে কর্ণগড় নামকরণ। তিনি দুটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। দণ্ডেশ্বর শিব মন্দির এবং মহামায়া মন্দির। এই মন্দির থেকে দেড় কিমি দূরে আছে এক ভগ্ন দুর্গ। এক বিরাট সরোবর এবং পাথরের প্রাসাদ এখনও স্মৃতির মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই অঞ্চলকে। দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে আছে খড়্গেশ্বর শিবমন্দির। পাশে আছে শিবায়ন কাব্যের কবি বিখ্যাত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের আসন। মহামায়া মন্দিরের পিছনে আছে পবিত্র কুণ্ড। দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের প্রবেশপথে ত্রিতলবিশিষ্ট তোরণদ্বার। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায়। মন্দিরের পিছনের নহবতখানাটিও দর্শনীয়। পৌষ সংক্রান্তির মেলায় জমজমাট হয়ে ওঠে কর্ণগড়।

সেকালের ভানদেশ একালের চন্দ্রকোণা

চন্দ্রকোণা প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো শহর চন্দ্রকোণা। কোনও এক সময় এর নাম ছিল ভানদেশ। মেদিনীপুর শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরের এই শহরে যাবার জন্য সারাদিনই নানা বাস যাচ্ছে। খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথে চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনে নেমেও যাওয়া যায়। ১৮ কিমি দূরে চন্দ্রকোণা।

তিনটি দুর্গ

দ্বাদশদ্বারী বা বারদুয়ারী দুর্গ—কথিত আছে, চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদ নাকি এখানেই ছিল এবং গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল।

চৌহান বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে 'রামগড়' ও 'লালগড়' দুর্গ দুটি নির্মিত হয়। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে। রাধানাথজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় রামগড় দুর্গে। 'দ্বাদশদ্বারী দুর্গ' বা 'বারদুয়ারী দুর্গ'-এর ধ্বংসাবশেষ এখানে-ওখানে দেখা যায়। মল্লেশ্বর মহাদেব, উজন্নাথ মহাদেব, শান্তিনাথ মহাদেব, লালজীউ মন্দির, রঘুনাথ জীউ মন্দির, লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দিরগুলি দ্রষ্টব্য।

শহরের দক্ষিণ দিকে এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ঘিরে এখনও অনেক জনশ্রুতি আছে। এটিকেই রাজা চন্দ্রকেতুর রাজপ্রসাদ বলে দাবি করা হয়। দুর্গটি সুগভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। কিছু পাথর এখনও অবশিষ্ট। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে রামগড় দুর্গে রঘুনাথজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুর্গ ধ্বংস হলে রঘুনাথজীউর মূর্তি লালগড় দুর্গে নতুন নবরত্ন মন্দিরে আনা হয় যেখানে আগে গিরিধারীজীউ ছিল। নবরত্ন মন্দির ভেঙে গেলে লালগড় থেকে মূর্তিটি নতুন মন্দিরে গিরিধারীজীউ লালজীউ নতুন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিধারীজীউ-লালজীউর নতুন মন্দিরের প্রস্তর ফলক থেকে জানা যায় যে ১৬৫৫ খ্রিঃ-এ রাজা হরিনারায়ণের পত্নী রানী লক্ষ্মণাবতী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি বিষ্ণুপুর ঘরানার বঙ্গীয় শিল্পরীতিতে নির্মিত।

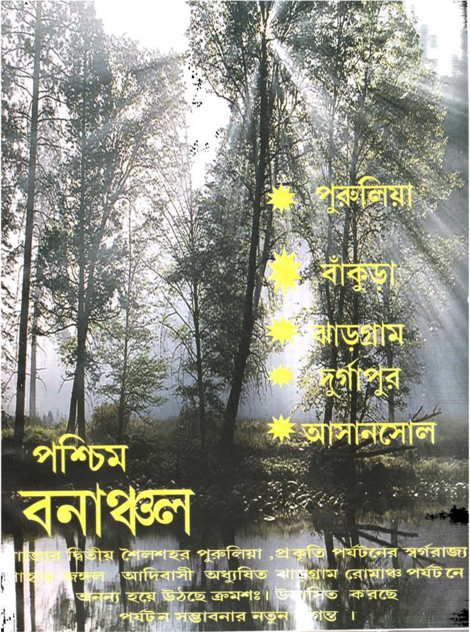
উৎকলরীতিতে নির্মিত রঘুনাথজীউর মন্দিরটিতে বিশাল দেউল ও জগমোহন নাটমণ্ডপ আছে। পাশে কামেশ্বর মহাদেবের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি আনুমানিক ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাসমঞ্চ।

এই রঘুনাথগড় 'রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ি' নামে পরিচিত। রঘুনাথগড়ের মন্দিরগুলো হল রঘুনাথজীউ, লালজীউ, গিরিধারীজীউ, কামেশ্বর মহাদেব, রাসমঞ্চ। ওই অঞ্চলটি অযোধ্যা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

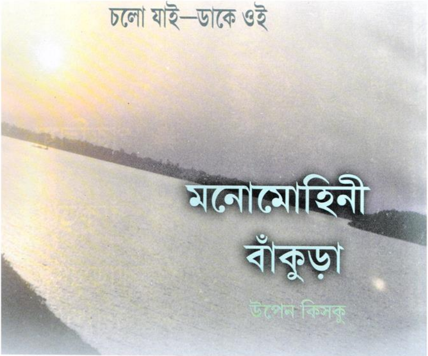
চন্দ্রকোণার তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। মল্লেশ্বর, শান্তিনাথ, উজন্নাথ। কালাপাহাড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য মল্লেশ্বরকে পাথর দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখা হয় এবং উজন্নাথকে বটগাছের তলায় রাখা হয়। মন্দির দুটি ধ্বংস হলেও মূর্তিগুলি রক্ষা পায়। অষ্টাদশ শতকে মল্লনাথের নতুন পঞ্চরত্ন মন্দির তৈরি হয়। শান্তিনাথ শিবমন্দিরটি সতেরোটি সুশোভন শিখর বিশিষ্ট। উজন্নাথ এখনও গাছতলায় পূজিত হচ্ছেন।

মেলা ও উৎসব

দশহরায় এখানে রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে রাখা লালজীউ ও রঘুনাথজীউর অলঙ্কৃত সুদৃশ্য রথ দুটিকে ঘিরে রথযাত্রা উৎসব হয়। প্রাঙ্গণ জুড়ে বিশাল মেলা বসে। রঘুনাথজীউর পুষ্যা উৎসবও এ অঞ্চলের অন্যতম বিখ্যাত উৎসব।



পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
ঝাড়গ্রাম
দুর্গাপুর
আসানসোল
পশ্চিম
বনাঞ্চল
দ্বিতীয় শৈলশহর পুরুলিয়া ,প্রকৃতি পর্যটনের স্বর্গরাজ্য
জঙ্গল আদিবাসী অধ্যুষিত রোমাঞ্চ পর্যটনে
অনন্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। করছে
পর্যটন সম্ভাবনার নতুন ।



মনোমোহিনী বাঁকুড়া

উপেন কিসকু

মুকুটমণিপুর

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু......।

কবি যে ঠিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মন উদাস করা উপরোক্ত লাইন কটি লিখেছেন এটা আমাদের জানা থাকলেও বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে কথা কটি যে খুবই প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর মধ্য দিয়ে কবি যেন ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি যাঁরা অনুসন্ধানী মন নিয়ে বা মানসিক শান্তি, পরিবর্তন বা অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়ান এবং অনেক কিছু দেখেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁদের আত্মতৃপ্তির মাঝে আলপিনের খোঁচা মেরেছেন। কবির ওই আত্মবিলাপে বাঙালি বিবেকে যদি সামান্যতম নাড়া দিতে পারে তা হলেই সকলের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

আমি এমন একটি জেলার কথা বলব যার অবস্থান ধানবাদ দুর্গাপুর বর্ধমান জামশেদপুর ঝাড়গ্রাম খড়্গপুর বা পুরুলিয়া থেকে খুব সহজে যাওয়া যায়। এ জেলার চারিদিকে খুব নিকটেই আছে পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নেওয়া বোলপুর-শান্তিনিকেতন অদূরে পুরুলিয়া জেলার ছৌ-খ্যাত বাগমুণ্ডী-অযোধ্যা পাহাড়। কিছুটা এগিয়ে গেলেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও ঘাটশিলা। মুকুটমণিপুরের অদূরে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কাঁকড়াঝোর। আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র দিয়ে ঘেরা অবগুণ্ঠিত বাঁকুড়া আজকে মেলে ধরতে চায় নিজেকে। আপনজনকে শোনাতে চায় নিজ মর্মব্যথা। বাঁকুড়ার বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-কন্দরে, নদীর তীরে লুকানো আছে কত কথা, কত ব্যথা, কত বীরত্ব গাথা। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে বাঁকুড়ার অবদান জানতে শুধু বই পড়ে হবে না। চলে আসুন। চর্মচক্ষে অবলোকন করুন। আমি হলফ করে বলতে পারি লাল কাঁকুরে মনোহারিনী বাঁকুড়ার

প্রেমডোরে আপনি বাঁধা পড়বেনই। বৎসরান্তে ছুটে আপনাকে আসতে হবেই।

আপনি তাচ্ছিল্যভরে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, মশাই আপনি যে এতো বকর বকর করছেন কি আছে ওখানে? বাঁকুড়া সম্পর্কে কাগজের কোনও লেখা পড়ে থাকলে বা উন্নাসিক কোনও পর্যটক বন্ধুর কথা শোনা থাকলে আমাকে শুনিয়ে দেবেন—গরিব বাঁকুড়া, রুক্ষ মাটি, খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাট, থাকার কোনো ভালো জায়গা নেই, এমনকি খাবার ভালো হোটেল পর্যন্ত নেই। আমি বলতে চাই ধীরে বন্ধু ধীরে রজনী এখনও বাকি। আমি আপনাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি—কি নেই বাঁকুড়ায়? জানতে হলে চলে আসুন। সপ্তাহান্তে ২ দিন বা ছুটিতে ৩ থেকে ৫ দিন। ভালোই লাগবে।

মুকুটবিহীন মুকুটমণিপুরে ২ দিন

আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমিক হন তাহলে চলে আসুন মুকুটমণিপুর। এখানেই দেখতে পাবেন এশিয়ার বৃহত্তম বা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ। সবুজ পাহাড় ঘেরা কাঁসাই কুমারীর নীল জলরাশি, সোনাঝুরির জঙ্গল, সূর্যোদয়ের পূর্বে পাখির কূজন আপনার চিত্তকে উদাসী করে তুলবেই তুলবে। ক্লান্তিময় একঘেয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেতে ৫-৭ দিন যখন বেরিয়ে যাবে বুঝতেই পারবেন না। সারস-মাছরাঙা পানকৌড়ি প্রভৃতি দেশী পাখির পাশাপাশি লক্ষাধিক পরিযায়ী পাখির সমাবেশ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পর্যটনের মরসুম শুধু নয়, মুকুটমণিপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আপনাকে আসতে হবে ভরা বর্ষায়। মেঘের গর্জন থেকে থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি আর নীল ও ধূসর রঙের জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মনে হবে কোনো সমুদ্রতীরের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শুনছি। থেকে থেকে ঘুঘু কিংবা নাম না জানা পাখির ডাক আপনাকে অচিন দেশে নিয়ে যাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের পাড়ে বসতে পারেন। কিংবা একা, কোনো অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হলে সস্তায় যুব আবাসের বারান্দা কিংবা সেচ বিভাগের পরিদর্শন বাংলো বা বননিগমের সোনাঝুরির ব্যালকনিতে বসেও এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। পকেটে রেস্ত থাকলে ঠাণ্ডাঘরযুক্ত ট্যুরিজম বাংলো, আম্রপালি বা পিয়ারলেস হোটেলেও আশ্রয় নিতে পারেন। বর্ষার জ্যোৎস্নালোকের মুকুটমণিপুর আকাশ পরিষ্কার থাকলে ইন্দ্রের নন্দন কাননকেও হার মানতে হবে। মুকুটমণিপুরেই দেখতে পাবেন ১ জানুয়ারির পর্যটন উৎসব ও মেলা। ১৪ জানুয়ারি বাউল মেলা। এছাড়া পর্যটন মরসুমে সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনগুলোতে উপভোগ করতে পারেন আদিবাসীসহ বিভিন্ন লোকআঙ্গিকের নৃত্য। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র এর উদ্যোক্তা। ২—১ বছরের মধ্যে লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণাগার আপনার তৃষ্ণা মেটাবে। পরখ করে দেখতে পারেন। বাড়তি পাওনা লঞ্চে চড়ে অভিযাত্রী সেজে বনগোপালপুরের হরিণ উদ্যান। ২-১ ঘণ্টা অল্প সময় বলেই মনে হবে।

অনুসন্ধিৎসা থাকলে যেতে পারেন খাতড়ার নিকটে মশক পাহাড়ের গুহার অত্যাচারী রাজাদের হাত থেকে বনবাসীদের আত্মগোপনের ডেরা। পরবর্তীতে যা ডাকাত গুহা নামে পরিচিত। এগিয়ে গেলে বিশাল পাথরের একটি চাঁই সিঁদুরপেটির সোনামণি পাথর আপনার বিস্ময় বাড়াবে। মানসিক প্রশান্তির জন্য অল্প সময় কাটিয়ে আসতে পারেন গোপালপুরের কংসাবতী তীরবর্তী মনোরম পরিবেশে অবস্থিত কেল্যাতি আশ্রমে।

ইতিহাসের ছাত্র হলে ২ কিমি দূরে জৈন সংস্কৃতির কেন্দ্র অম্বিকানগর রাজবাড়ি বা অম্বিকা দেবীর মূর্তি আপনি দেখে নিতে পারেন। কাঁসাই কুমারীর সঙ্গমস্থলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ। এখানেই শুনতে পাবেন স্বাধীনচেতা জমিদার পরিবারভুক্ত বিপ্লবী রাইচরণ ধবলদেবের ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের কাহিনী। বিপ্লবীদের আনাগোনা। ব্রিটিশ বাহিনীর কম্যান্ডারের নাজেহাল অবস্থা। বিপ্লবী রাইচরণকে গ্রেপ্তার করতে আসা সৈন্যদল নদীতীরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয় তুচ্ছ করে ভরা কংসাবতীর তুফান বন্যা সাঁতরে পেরিয়ে বিপ্লবী রাইচরণকে খবর দেওয়া পানু রজকের কাহিনী। নদীর তীরে জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের ছাত্র হন তা হলে নিশ্চিতভাবেই অর্ধ কিমি দূরে ১২১ বৎসরের প্রয়াত জেলভাঙা আদিম আদিবাসী বিরল জনগোষ্ঠীভুক্ত জনদরদী মোহন উসখুস করবেই। পাহাড়ের কোল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে অজানা শিল্পীর বাঁশি কিংবা ঝুমুরের সুর অথবা জ্যোৎস্না রাতে সাঁওতালপল্লীর মাদলের ধিতাং বোল, নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট না হয়ে থাকতে পারবেন না। হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন প্রকৃতির অকৃপণ সাজে সজ্জিত ঝিলিমিলি। ডে-সেন্টার ছাড়াও নির্মীয়মাণ রিমিল গেস্ট হাউসে থাকতে পারবেন। ফিরে এলে থাকতে পারবেন রানীবাঁধ বনবাংলো বা জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে। ইচ্ছা করলে ঘুরে আসতে পারেন ১৫ কিমি দূরের বিপ্লবী ক্ষুদিরামের স্মৃতিবিজড়িত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গোপন কেন্দ্রস্থল ছেঁদা পাথরগ্রামে। ওখানে বিপ্লবীরা গভীর জঙ্গলের কোনো কুয়োতে বোমা পরীক্ষা করে ও আদিবাসী কোনো কোনো যুবক তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গী ছিল। অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসাই বাড়াবে। যে গাছতলায় দুপুরবেলায় ক্ষুদিরামের সঙ্গীসাথীরা বিশ্রাম নিত সে গাছ আজও বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরামের কথা শোনাবে। বনবিভাগের ছোট বাংলো ছাড়াও ছুটির দিনে ছেঁদা পাথরের শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়েও ঠাঁই পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে হালকা বিছানা নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা থেকে সরাসরি সি এস টি সি বাসে যাওয়া যায়। ২ কিমি দূরের বীরকাঁড় বাঁধ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট হিসেবে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিংবা কাছেই জাঁতাডুমুর ড্যাম। ছেঁদা পাথর নিকটবর্তী বড়গ্রামে ব্রিটিশ আমলে তামা উত্তোলন হত। মূল্যবান চিনস্টোন খনিগুলোও এখানেই অবস্থিত।

ছেঁদা পাথর থেকে মুকুটমণিপুর বা রাইপুর ট্রেকিং রুট হিসাবে খুবই আকর্ষণীয় হবে। সেক্ষেত্রে বৈরীপাল ড্যামের তীরে কদমাগড় কলাবনীতে ডে-সেন্টারের রুটের জনপ্রিয়তা বাড়াবে। ঝিলিমিলি থেকে ট্রেকিং করতে চাইলে তালবেড়্যা হয়ে 'সুতান'-এর ড্যাম গহন. অরণ্য বন্ধুর পাহাড়ি পথ আপনাকে মিরিকের কথাই মনে করিয়ে দেবে। এখানে সুতান কটেজে আপনি থাকতে পারেন। নৌকাবিহার করতে পারেন। কিংবা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে প্রকৃতির শোভা দর্শন করতে পারেন। মনে

হবে কম্বোডিয়ার প্রকৃতির শোভা ঢেউ খেলানো পাহাড় ও সবুজ অরণ্যানী আমাজনের গল্প পড়া গভীর অরণ্যের কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। দেখা পেয়ে যাবেন বন্য হরিণ, শুয়োর বা তিত্তির ও বনমোরগ। দেখা মিলে যেতে পারে বন্য হাতিরও কেন না এটা এখন হাতির স্থায়ী আবাসস্থল। সরল সাঁওতাল আদিবাসী সুঠাম দেহের অধিকারী পাচকদের হাতের তৈরি চা বা রান্না খাবার আপনার মনে থাকবে। সদা হাস্যময় সাঁওতাল যুবকদের প্রাকৃত বাংলায় অশুদ্ধ উচ্চারণ আপনার স্মৃতিতে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। চৈত্রের দাবদাহে পথশ্রম ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য শাল, মহুয়া ফুলের মনমাতানো গন্ধ, লাল পলাশ ও শিমুলের সৌন্দর্য কখনও আপনাকে রানীবাঁধ বা মুকুটমণিপুর পৌঁছে দিয়েছে বুঝতেই পারবেন না। বাড়তি একদিন সময় থাকলে চলে আসতে পারেন মটগোদা গ্রামে। এখানে আছে ধর্মরাজের মন্দির। মাঘ মাসের শেষ শনিবারে শুরু হয়ে ৭ দিনের শনিমেলার শরিক হতে পারেন। ৫ কিমি দূরে রাইপুরের চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক দুর্জন সিং-এর মর্মর মূর্তি দর্শন করতে পারেন। শিখর রাজার ধ্বংসাবশেষ চর্মচক্ষে না দেখা গেলেও শিখর সায়রের পাড়ে বসে কিছুক্ষণ ডুব দিতে পারেন অতীত ইতিহাসের অতলে। কিংবা ফেরার পথে যেতে পারেন চাতরি কালাপাথর লালবাঁধ ও সন্নিকটে অবস্থিত বিশালাকার একটি কালো পাথরের 'কালো পাহাড়'-এ। ইন্দ্রঝোর মধুপুর বড়দি-কালা পাথর-শিড়লিগড়। প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্র রাইপুর-সারেঙ্গা ব্লকের মাঝখানে কংসাবতী নদীর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ বনানী, সারা বছর ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা থেকে কুলু কুলু ঝরনা, প্রাকৃতিক ঢেউ খেলানো পরিবেশ, মহুয়া ফুলের মাতাল করা গন্ধ, লাল পলাশের মোহময়ী রূপ আপনাকে আকর্ষণ করবেই। মধ্যখানে ২.৫ কিমি বিস্তৃত বিশাল নদীর নীল গভীর জলরাশি সারা বছরব্যাপী পর্যটকদের নৌকাবিহারের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। তাছাড়া নতুন গজানো শালপাতা ও লাল পলাশ শোভিত খাড়া কালো পাথরের ১০০-২০০ ফুট নীচে চৈত্রের বৈকালিক নৌকাবিহার আপনাকে মোহিত করবেই। প্রকৃতি প্রসন্ন থাকলে দেখা পেয়ে যেতে পারেন বিরল প্রজাতির প্রাণী প্যাঙ্গোলিনের। রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে এখনও স্থান না পেলেও ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ২/১টি গেস্ট হাউস গড়ে উঠলে সপ্তাহান্তের ছুটি উপভোগ সার্থক হবে। বর্তমানে পিকনিক স্পট হিসেবে এটা ক্রমাগত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বৈশাখ মাসের নির্দিষ্ট দিনে সাঁওতালদের শিকার উৎসব এখানেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

প্রস্তাবিত পর্যটন কেন্দ্র রাইপুর-সারেঙ্গা ব্লকের মাঝখানে কংসাবতী নদীর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ বনানী, সারা বছর ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা থেকে কুলু কুলু ঝরনা, প্রাকৃতিক ঢেউ খেলানো পরিবেশ, মহুয়া ফুলের মাতাল করা গন্ধ, লাল পলাশের মোহময়ী রূপ আপনাকে আকর্ষণ করবেই। মধ্যখানে ২.৫ কিমি বিস্তৃত বিশাল নদীর নীল গভীর জলরাশি সারা বছরব্যাপী পর্যটকদের নৌকাবিহারের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। তাছাড়া নতুন গজানো শালপাতা ও লাল পলাশ শোভিত খাড়া কালো পাথরের ১০০-২০০ ফুট নীচে চৈত্রের বৈকালিক নৌকাবিহার আপনাকে মোহিত করবেই।

মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে ২ দিন

মুকুটমণিপুর থেকে সরাসরি বিষ্ণুপুর আসার পথে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতে পারেন শালপলাশের জঙ্গলঘেঁষা চেঁচুড়িয়া ইকো পার্কে। ইচ্ছা করলে নৌকাবিহার করতে পারেন। কবি বা সাহিত্যিক হলে একদিন কাটিয়েও যেতে পারেন।

বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথেই ২০ কিমি ঘুরপথের কষ্ট স্বীকার করতে চাইলে চর্মচক্ষে দেখতে পারেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারত সরকারের লোগোখ্যাত পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির শিল্পীদের নিপুণ হাতের কারিকুরি। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর আপনাকে উজ্জীবিত করে বর্গী হামলার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম গাঁথাগুলি। বিষ্ণুপুরে এসে আপনাকে মোহিত করবে এলাকার মল্লরাজাদের বিখ্যাত কীর্তিগুলি। প্রধান আকর্ষণ টেরাকোটার মন্দির, দলমাদল কামান, জোড়বাংলো মদনমোহন মন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির, রাসমঞ্চ। পোকা বাঁধ, লাল বাঁধ, যমুনা বাঁধ শোনাবে আপনাকে ভোগবিলাসী লাল বাঈ-এর প্রেমে পাগল রাজার কাহিনী। কান থাকলে শুনতে পাবেন রানীর অন্দর মহলের কান্না। কিংবা সঙ্গীত বোদ্ধা হলে ডুবে যেতে পারেন বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরানার সমুদ্রে। যদুভট্ট থেকে শুরু করে গোপেশ্বর ব্যানার্জি পর্যন্ত বহু বিখ্যাত সঙ্গীত প্রতিভা উপহার দিয়েছে এই বিষ্ণুপুর। কজনই বা রাখে সে খবর। বিখ্যাত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এখানেই অবস্থিত। অজস্র হোটেল ও টুরিস্ট লজ দুই তিনদিন কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষ্ণুপুর মেলা আজকে জাতীয় মেলায় স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এখানেই পাবেন বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির অপূর্ব মিলন। সুযোগ হলে কলকাতা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামী দামি শিল্পীরও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এতদিন পর্যন্ত জেলার স্থান সঙ্কুলান সহ থাকার বিভিন্ন অসুবিধা থাকলেও রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদ মিলিতভাবে বিষ্ণুপুর মেলা ও শহরকে

আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে।

এখান থেকে ফিরে আসতে পারেন জয়পুরের ময়ূরের ধ্বনি শুনতে। কিংবা হরিণের ছোটাছুটি দেখতে। বনবাংলোতে থেকেও যেতে পারেন। নিকটেই আছে পঞ্চায়েতের তৈরি বাহারি গোলাপ বাগান কিংবা সমুদ্রবাঁধ। প্রাক্তন মহারাজ প্রদুম্নের আবাস জয়পুর সংলগ্ন প্রদুম্নপুরে ঐতিহাসিক স্থান গড় প্রদুম্নপুর বর্তমানে পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে। কলকাতায় গাড়িতে ফিরতে চাইলে পথে পড়বে সারদাদেবীর জন্মস্থান বাঁকুড়ার শেষ প্রান্তের জয়রামবাটি। ফেরার পথে রামকৃষ্ণদেবের কামারপুকুর।

বাঁকুড়াতে এক দিন

বাঁকুড়া পর্যটনের আর একটি প্রধান কেন্দ্র বাঁকুড়া শহর। এখানে যুব আবাসে পর্যাপ্ত আসন অথবা সরকারি নানান আবাস পেয়েও যেতে পারেন। তাছাড়া আছে সপ্তর্ষিসহ আরও বেশ কিছু হোটেল ও লজ। সপ্তর্ষির মালিক দত্তবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে এলে আপনার সুবিধেই হবে। বাঁকুড়াতে নিজস্ব ট্যাক্সি সার্ভিসের মাধ্যমে ওরাই আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে। আলাদা গাইড নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। কলকাতা থেকেই কিছু সংস্থা হোটেল সপ্তর্ষির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পর্যটকদের পাঠিয়ে থাকেন। এখানেই দেখতে পাবেন বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর বসতবাড়ি। এখানে নিশ্চিন্তে থেকে ঘুরে আসতে পারেন শুশুনিয়া, বিহারীনাথ বা কোড়ো পাহাড়। পথে পড়বে ছাতনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। ১০ কিমি এগোলেই দেখতে পাবেন শুশুনিয়া পাহাড়। চন্দ্রবর্মার শিলালিপি এখনও জ্বলজ্বল করছে। পাহাড়ে চড়তেও পারেন। শুশুনিয়া ধারার জলধারা আপনার তৃষ্ণার্ত হৃদয় শীতল করবে। বহু পর্যটক টিনভর্তি করে শুশুনিয়া ধারার জল বাড়ি নিয়ে যান। লোক বিশ্বাস এই জল ক্ষুধাবর্ধক ও পেটের রোগ নিরাময় করে। চৈত্রের ধারা উৎসব বিশাল মেলার রূপ নেয়। শালী নদীর গাংদুয়া জলাধার আপনার কয়েক ঘণ্টা ভালোই লাগবে। সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন শালতোড়া। সাঁতুড়ি থানার সীমান্তে পাহাড়কোলে সুশোভিত ছোট জলাধার ও বিনোদপুরের মৃগ উদ্যান কিংবা গণউদ্যোগে সদ্য গড়ে ওঠা লিয়াদা সেচ প্রকল্পকে ঘিরে পার্ক। প্রাচীন শহর সোনামুখীও একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র। ছোট রেল তুলে দিলেও বাস যোগাযোগ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আছে। রেশম শিল্পে বিখ্যাত কেন্দ্র সোনামুখী কার্তিক পূজা ও বিখ্যাত বাউল শিল্পীদের বাউলের আখড়া আপনার বাড়তি পাওনা। এখানেই মিলিত হতে পারেন খয়েরবনি গ্রামের বিখ্যাত বাউলশিল্পী সনাতন দাসের সঙ্গে। আসা যাওয়ার পথে ছান্দারের অভিব্যক্তির উৎপল চক্রবর্তীর সদা হাস্যময় অভ্যর্থনা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঁকুড়ায় সৃজনশীল শিল্পকর্মের নতুন রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। নইলে ঘরের শোভা বৃদ্ধির জন্য ২-১ পিস সংগ্রহ করতেও পারেন। বেলিয়াতোড়-এ পরিদর্শন করতে পারেন বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায়ের বসতবাটি ও সংগ্রহশালা।

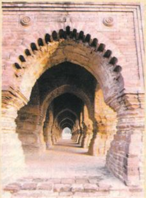
এরকম বহু দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থান ছড়িয়ে আছে বাঁকুড়ার বিভিন্ন আনাচে কানাচে। এযাবৎ শিল্পের বিকাশে যথাযথ গুরুত্ব পেলে বাঁকুড়া জেলা হতে পারতো ভারতবর্ষের পর্যটকদের তীর্থক্ষেত্র। মন্দির থেকে টেরাকোটা, পাহাড় থেকে জলাধার, স্রোতস্বিনী নদী থেকে গহন অরণ্য কোলেরিয়ান জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম, বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলিম সংস্কৃতি মিলন ক্ষেত্র এই বাঁকুড়া। সাম্প্রদায়িক ভেদ কিছু কিছু থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানে সংঘটিত হয়নি। আদিম আদিবাসী শবর থেকে শুরু করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহালী, কোড়া, ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির সাংস্কৃতিক উপহার নিয়ে আজও সমুজ্জ্বল এই জেলা। চুয়াড় বিদ্রোহের বীরত্ব গাথা থেকে শুরু করে লায়েক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহ এবং বর্গী হাঙ্গামা প্রতিহত করার বীরত্ব গাথা আজও এখানের মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বন বাংলো ও জেলা পরিষদ বিশ্রামাগার ও সমস্ত জায়গাতেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে থাকার ব্যবস্থাসহ হোটেল, লজ ও রেস্টুরেন্ট। যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট এক্সপ্রেস বাস ছাড়াও জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য আছে ট্রেকার ও ট্যাক্সি সার্ভিস। স্থানীয় যুবকদের কর্মস্থান ছাড়াও পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যা যথেষ্টই। আগামীদিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সি সার্ভিস চালু হতে যাচ্ছে। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়াতে সরাসরি আসা যায় সাউথ ইস্টার্ন রেল, গাড়িতে চড়ে। বাঁকুড়ার যে কোনো প্রান্তে আসার জন্য ইস্টার্ন রেলের দুর্গাপুর স্টেশন এখান থেকে ৪২ কিমি বাঁকুড়া শহর। কিংবা সাউথ ইস্টার্ন রেলের রোড চন্দ্রকোনা ও ঝাড়গ্রাম থেকে মুকুটমণিপুর ৮৫ কিমি। খড়্গপুর থেকে ১০০ কিমি মুকুটমণিপুর। সরকারি, বেসরকারি এক্সপ্রেস বাসে কলকাতা, শিলিগুড়ি ছাড়াও যে কোনো শহর থেকে সরাসরি বাঁকুড়ার যে কোনো প্রান্তে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন। রাস্তাঘাট এখন অনেক উন্নত। পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিজাত ফসল, সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের বাজার তৈরি হবে। বাজার খুঁজে পাবে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কুটির শিল্প। পাবেন স্থানীয় দরিদ্র শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ার তৈরি বেলমালা, বাঁশের শিল্প। আদিবাসী শিল্পীদের হাতে তৈরি বাঁশ, বেত, কাঠের কারুকার্যখচিত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য আপনার গৃহশোভা বৃদ্ধিসহ গৌরব বৃদ্ধি করবে। ইচ্ছা করলে শহর শিল্পীদের তৈরি দুধিলতা বা বেত বাঁশের শিল্পও পাবেন। মুকুটমণিপুর কেঞ্জাকুড়ার বাঁশের শিল্প বা শুশুনিয়ার পাথরের তৈরি শৌখিন দ্রব্যসম্ভার যে কোনো কেন্দ্রেই পাওয়া যায়। শিং-এর তৈরি শিল্পও মুকুটমণিপুরেই পাবেন। ভগড়া কল্যাণ সায়ের ও মটগোদার আদিবাসী শিল্পীদের পাথরের প্রদীপ থেকে থালা বাটি, শিলনোড়া তাও সংগ্রহ করতে পারেন। রাজগ্রাম কেঞ্জাকুড়ার গামছা, চাদর নিয়ে যেতে আপনার মন চাইবেই। পকেটের জোর থাকলে স্ত্রী বা কন্যার মানভঞ্জনের জন্য আছে বিষ্ণুপুরের জগৎ বিখ্যাত বালুচরী শাড়ি।

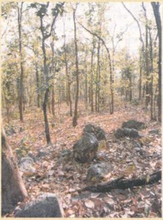
নিজস্ব আত্মতৃপ্তি ও মনোরঞ্জন অথবা অবসর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলা অসংখ্য নামী অনামী শিল্পী ও কুটির শিল্পীদের মুখে হাসি ফোটাবে। নিশ্চয় আপনিও তাই চান। তাই দেরি না করে চলে আসুন বাঁকুড়ায়।

পোড়ামাটির ধ্রুপদী সঙ্গীত

সোমালী পান্ডা



বাঁকুড়া - পুরুলিয়া

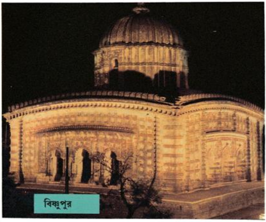


বিষ্ণুপুরে মন্দিরগাত্রে অসাধারণ টেরাকোটার কাজ

ডুয়ার্সের গভীর সবুজ জটিল জঙ্গল, সোঁদা মাটির গন্ধ, তিস্তা-তোর্সা-ডায়ানা-ধরলা-করলা নদী, ধান-পাটের খেত, চা-কমলার বাগান, উর্বর প্রান্তর এই সব ছিল বেড়ে ওঠার অনুষঙ্গ। ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি ছিল সেখানের মাটির সুর। তবু কেন যেন রক্তের গভীরে শুনতে পাওয়া যেত ভাদু-টুসুর সুর। গত জন্মের স্মৃতির মতো দুর্নিবার টানে টানত লাল মাটি-টাঁড়-টিলা। কখনও দেখা হয়নি তবু যেন কত চেনা। কেমন করে সম্ভব হয়েছিল এ সব এখন ভাবতে বসে আশ্চর্য লাগে। সত্যিটা হল,*অমোঘ সেই টানে লাল মাটি এখন আমার মাটি, কংসাবতী-শিলাবতী-দ্বারকেশ্বর-জয়পন্ডা এখন আমার নদ-নদী, ভাদু-টুসু এখন আমার সুর। এ হল অবচেতনের চাওয়া আর অসম্ভব ইচ্ছাপূরণের গল্প। তবে চাওয়া শুধু অবচেতনেই ছিল এমন নয়। স্কুলের নিচের ক্লাসের পড়ুয়া হিসেবে খুব কাছের চরিত্র ছিল সমরেশ বসুর গোগোল। তার মাসির বাড়ি ছিল বিষ্ণুপুরে। পুজোর ছুটিতে গোগোল বিষ্ণুপুরে বেড়াতে গেছে, তার অধ্যাপক মাসতুতো দাদা দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন—'ভাই, তুই সত্যি এয়েচু র‍্যা' ? এর কিছুদিন পর দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করল 'দেখি নাই ফিরে'। রামকিঙ্করের মা জিজ্ঞেস করেন—'কিঙ্কর তু ভাত খেয়েচু' ? এই মুখের ভাষার কাছে পৌছব কী করে ? সমরেশ বসু, রামকিঙ্কর বেজ, বিষ্ণুপুরী ঘরানার ধ্রুপদ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, যদু ভট্ট, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত—এই সমস্ত কিছুকে আশ্রয় করে একটু একটু করে গড়ে ওঠা চেতনার জগৎ জুড়েও সেই একই আকর্ষণের প্রকাশ।

এখন ঘটনা পরম্পরায় লাল মাটি আমার মাটি হয়ে গেছে। ইচ্ছেমত তার অতুল ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। বহুবার, বহুভাবে। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার প্রবল গ্রীষ্মে দগ্ধ চেহারা, শীতে রিক্ত রূপ, হেমন্তের ফসলের ঘ্রাণ, বসন্তে আগুন লাল বর্ণ সবই দেখেছি। দেখেছি চালা-মন্দির, একাধিক চূড়ার রত্নমন্দির, খিলান দেওয়া দালান মন্দির। তবে সবই দেখেছি একান্ত কাছ থেকে—পর্যটকের দৃষ্টিতে নয়। সেইজন্যেই হয়তো খানিকটা অগোছালোও।

বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশের সূচনায় হুগলি সীমান্তে জয়রামবাটি গ্রাম। কলকাতা থেকে আরামবাগ হয়ে, কামারপুকুর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর জন্মস্থান এই জয়রামবাটিতে আসা যায়। গ্রামে সারদাদেবীর দুখানি বাড়ি আছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ব্রাড়িটিতে আনুমানিক


বিষ্ণুপুর

১৮৬৩ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি থেকেছেন। এরপর তাঁর শিষ্য স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ দ্বিতীয় গৃহটি তৈরি করান। এখানে সারদাদেবী ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বসবাস করেছেন। জয়রামবাটিতে দ্রষ্টব্য স্থান বলতে এই দুটি বাড়ি ছাড়া সিংহবাহিনী দেবীর টিনের আটচালা মন্দির। অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ জয়রামবাটির।

আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুর যাবার পথে পড়বে বেশ বড় গ্রাম কোতুলপুর। এখানে একটা কথা বলে নিতে হয়, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া দুই জেলাতেই এত দর্শনীয় সব মন্দির-স্থাপত্য, এত সাংস্কৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে আছে তার বেশিরভাগই গ্রাম অঞ্চলে। শহর বলতে যা বুঝি তার সংখ্যা দুই জেলা মিলিয়েই নগণ্য। কোতুলপুরে ছোট-বড় অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে আটচালা যেমন আছে, তেমনই আছে দালান ও পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দির-স্থাপত্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তুলনামূলকভাবে নতুন এই অঞ্চলের বেশ কিছু মন্দির। টেরাকোটার অলংকরণ আছে কিছু মন্দিরে। আবার নিরাভরণ একশ বছরের পুরনো আটচালা মন্দিরও আছে।

কোতুলপুর থেকে আরও একটু এগোলে বিষ্ণুপুর। বর্তমানের বিষ্ণুপুর এবং পাশাপাশি আরও কিছু স্থান নিয়ে ছিল মল্লরাজ্য, মল্লভূমি বা মল্লভূম। এর সীমা ছিল মোটামুটিভাবে উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে শিলাই, পূর্বে গড় মান্দারণ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে আদিতে যে অঞ্চলটি অনার্য অধ্যুষিত ছিল, ক্রমে তা পরিণত হয় বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির পীঠস্থানে। মল্ল রাজবংশও কারও মতে অনার্য জাতিসম্ভূত। অন্য মতও আছে। সেই অনুসারে আদি মল্লরাজ রঘুনাথ ক্ষত্রিয় বংশেরই জাতক ছিলেন। বাংলার নিজস্ব ঘরানা বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের উৎসাহ ও গুণগ্রাহিতায় সারা ভারতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যে এক উজ্জ্বল এবং স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল।

বর্তমান বিষ্ণুপুরে দর্শনীয় বিষয়গুলির অন্যতম লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ বা বীরবাঁধ এবং চৌখনবাঁধ। এগুলি হল এক একটি বিশাল জলাশয়। চৌখনবাঁধটি এখন ভরাট হয়ে গেছে। এই বাঁধগুলি ব্যূহের মতো রক্ষা করত মধ্যবর্তী পরিখাবেষ্টিত রাজপ্রাসাদটিকে। মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে মারাঠা বর্গীবাহিনী ভাস্কর রাওয়ের নেতৃত্বে এই অঞ্চল আক্রমণ করে। তখন যে কামানটি থেকে গোলাবর্ষণ করে বর্গীর দল মর্দন করা হয়েছিল সেটির নাম হয় 'দলমর্দন' কামান—পরবর্তীকালে অপভ্রংশে সেটি হয়ে দাঁড়ায় 'দলমাদল' কামান। তেষট্টিটি লোহার রিং বা আংটা ঢালাই করেঁ সাড়ে বারো ফুট লম্বা এই কামানটি বর্তমান বিষ্ণুপুরের বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষ্ণুপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। থাকবার জায়গা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি সলদা ও গোকুলনগর গ্রাম দুটি দেখে আসা যায়। বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন পঞ্চরত্ন গোকুলচাঁদের মন্দিরটি এখানেই। মন্দিরের কাছেই আছে বিশালাকায় পাথরের বরাহমূর্তি, তার কিছু অংশ মাটিতে প্রোথিত। এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক দেউলের ধ্বংসস্তূপ আছে। জৈন মূর্তিও অনেক আছে। এছাড়া দুটি বিশালাকৃতি শিবলিঙ্গ আছে এখানে—ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ আর গন্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ।

বিষ্ণুপুর এবং তার আশপাশের অঞ্চলের প্রাচীন স্থাপত্য ও অন্য দর্শনীয় বিষয়ের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সব কটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখতে হলে হাতে অন্তত দিন দুয়েক সময় থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন যাতায়াতের জন্য ট্রেকার বা জিপজাতীয় একটি গাড়ি।

বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়া হয়ে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর পথে যেতে পড়বে বেলিয়াতোড়। গ্রাম হিসেবে সমৃদ্ধ হলেও সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শনীয় তেমন কিছু চোখে পড়বে না। ধর্মরাজের একটি দালান মন্দির আছে। পুরাকীর্তি হিসাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বলার মতো। আমরা জানি গাজন হয় চৈত্র মাসে। কিন্তু এখানে গাজন হয় আষাঢ় পূর্ণিমায়। আষাঢ়ের মেঘে পূর্ণিমার চাঁদ হয়তো ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু বিশাল আকারের দুই কাঠের ঘোড়ার রথে চড়ে ধর্মরাজ এদিন ভ্রমণে বেরোন। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়, মেলা বসে এই উপলক্ষে।

বাঁকুড়া থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পথে ছাতনা গ্রাম। এই

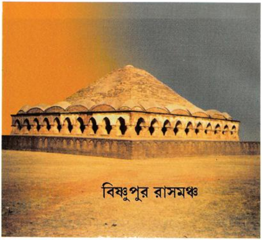
ছাতনাতেই প্রাচীন বাঙালি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের উপাসিত বাশুলি দেবীর মন্দির। বাশুলি দেবীর মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ আছে এখন। আদি মন্দিরটি ধ্বংস হবার পর বাশুলি মূর্তিটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে জনশ্রুতি আছে। তবে যে বিগ্রহটি বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় তার উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৬ ফুটের বেশি।

ছাতনার কাছেই আরও একটি দ্রষ্টব্য স্থান শুশুনিয়া পাহাড়। ছাতনা থেকে শুশুনিয়ার দূরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার। শুশুনিয়া পাহাড়ের উচ্চতা ১,৪৪২ ফুট, বিস্তৃতি প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। পাহাড়টি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ের চূড়ায় গুহার গায়ে দুটি দেওয়াল লিপি আছে। লিপি দুটি খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের। সাধারণত বাঁকুড়া অঞ্চলের পাহাড় নেড়া, বৃক্ষবিহীন। কিন্তু শুশুনিয়া সেদিক থেকে ব্যতিক্রম।

শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্বদিকে আছে পোখরনা বা পাখন্না গ্রাম। দামোদর নদের তীরের এই গ্রামটিই প্রাচীন পুষ্করণা অঞ্চল (পুষ্করণা / পোখরনা / পাখন্না) বলে মনে করা হয়। পুষ্করণার রাজা চন্দ্রবর্মণের শিলালিপিই পাওয়া গেছে শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায়। পোখরনার পশ্চিমদিকে আছে রাজগড়ের ঢিবি। এখান থেকে পাওয়া গেছে মাটির বাসনপত্রের টুকরো, ভাঙা ইট।

এখন পোখরনার সেই প্রাচীন জনপদের বহু চিহ্ন ছড়ানো। একটি খুব বড় দীঘি ছাড়াও ছোট ছোট অনেক পুকুর আছে। পুষ্করিণীর কারণেই এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল পুষ্করণা এমন মনে করা হয়।

ছাতনা থানাতেই আরও একটি দর্শনীয় জায়গা হল দেউলভিড়্যা। পাশেই ইঁদপুর থানায় আরও একটি গ্রাম আছে দিউলভিড়্যা নামে। গ্রামের নাম দেউলভিড়্যা—এ থেকেই সহজে অনুমান করা চলে গ্রামটি দেউল তথা মন্দির খ্যাত। আরও একটি গ্রাম আছে দেউলভিড়্যা নামে, এটি তালডাংরা থানায়। বাঁকুড়ার দক্ষিণদিকে বাঁকুড়া তালডাংরা পথে পোড়ামাটির কাজের জন্য সুবিদিত গ্রাম পাঁচমুড়া। পাঁচমুড়ার পাশেই এই তৃতীয় দেউলভিড়্যা গ্রাম। পুরাকীর্তির দিক থেকে এই দেউলভিড়্যা বেশি খ্যাত। এখানে একটি কালো ল্যাটেরাইট পাথরের রেখ-দেউল



আছে। বাঁকুড়া জেলার অন্যতম সেরা পুরাকীর্তি এটি।

তালডাংরার আশপাশে বেশ কয়েকটি দর্শনীয় জায়গা আছে। যেমন—দক্ষিণ দিকে সিমলাপাল, রাইপুর, পশ্চিমে আছে হাড়মাসড়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে খাতড়া, রাণীবাঁধ, মুকুটমণিপুর। এক্ষেত্রে খাতড়াকে কেন্দ্র করে জায়গাগুলি পরিদর্শন করা সুবিধাজনক। থাকবার জায়গা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দুয়েরই সুবিধা আছে। মুকুটমণিপুর পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত স্থান। মুকুটমণিপুরের পাশেই ঝিলিমিলি। ঘন শালের জঙ্গল, জঙ্গলে হাতি— ঝিলিমিলিকে অপূর্ব আকর্ষণীয় করেছে। ঝিলিমিলির সৌন্দর্য সম্পূর্ণই নৈসর্গিক এবং স্বর্গীয়। মুকুটমণিপুর জায়গাটি স্বাভাবিকভাবেই উঁচু-নিচু পাহাড়ি টিলাময়। সেখানে তৈরি হয়েছে কংসাবতী আর কুমারী নদীর সঙ্গমে কংসাবতী ড্যাম। ইউক্যালিপটাস আর শালের জঙ্গলে ঘেরা মুকুটমণিপুরে সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি নানা বেসরকারি ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে দর্শনার্থীদের থাকবার জন্য। মুকুটমণিপুরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান ছাড়াও খাতড়ার কাছে আছে মশক পাহাড়। একেবারে নেড়া পাহাড়। ওঠবার রাস্তা আছে পাহাড়ের গা ঘিরে।

পাহাড়ের গায়ে একটি মন্দিরও আছে। খাতড়ার উত্তরে ছোট গ্রাম হাড়মাসড়া। এখানে মাকড়া পাথরে তৈরি একটি পঞ্চরথ শিখর দেউল আছে। মন্দির স্থাপত্যটি ওড়িশা ধাঁচের। একটি পার্শ্বনাথ মূর্তিও আছে পাথরের তৈরি। এছাড়া অনেক ইটের মন্দিরও আছে। লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মন্দিরটিতে টেরাকোটা অলংকরণ আছে। সিমলাপালও এরই পাশাপাশি একটি গ্রাম। বলা হয় খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে এক উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবার এই অঞ্চলে মল্লরাজাদের সামন্ত হিসাবে সিমলাপাল রাজ পরিবারের প্রবর্তন করেন। এই রাজবাড়ি এখনও আছে। এর প্রাঙ্গণে মাকড়া পাথরে তৈরি বলরামজীউর মন্দির আছে। মন্দিরটি আটচালা স্থাপত্যের। বাঁকুড়া থেকে তালডাংরা সিমলাপাল হয়ে কংসাবতীর তীরে রাইপুর। শিখরগড় নামে একটি বহু পুরনো দুর্গ আছে এখানে। আর আছে প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। এক চৌহান রাজপুত মোগল সাম্রাজ্যের সমসাময়িক সময়ে এখানে রাজত্ব শুরু করেন। তাঁর উপাধি ছিল শিখররাজা। সেই আমলের অনেক জলাশয়ও এখন আছে। তার মধ্যে যমুনাবাঁধ দীঘিটির পাড়ে মহামায়ার মন্দির আছে। স্থানীয় শাঁখারিদের



পাঁচমুড়া গ্রামের ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে বাঁকুড়ার ঘোড়া

মধ্যে এই মহামায়া দেবী সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত। আদি মন্দিরটি এখন আর নেই। পরবর্তীকালে ইটের তৈরি একটি মন্দিরে মহামায়ার মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাইপুর থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়ার দিকে যেতে পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন জৈন-ধর্মকেন্দ্র পরেশনাথ। তবে জৈন ও হিন্দু দুই ধর্মেরই প্রচুর অবশেষ পাওয়া গেছে এই অঞ্চল থেকে।

এই প্রসঙ্গে বিহারীনাথ পাহাড়ের কথা না বললেই নয়। বাঁকুড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে দামোদর নদের তীরে এই পাহাড়। এখন দামোদরের দূরত্ব এই ১,৪৬৯ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে প্রায় চার কিলোমিটার হলেও অতীতে এই দূরত্ব কম ছিল মনে করা হয়। একটি শিবমন্দির আছে পাহাড়ে, তুলনায় নবীন। পাশেই আছে পার্শ্বনাথের একটি পাথরের মূর্তি এবং লোকেশ্বরের মূর্তি। দুটিই প্রাচীন। পরেশনাথের মত এখানেও জৈন ও হিন্দু ধর্মের চিহ্ন পাওয়া গেছে পাশাপাশি।

পরেশনাথ পাহাড় থেকে আরও পশ্চিমদিকে গেলেই পুরুলিয়া জেলা। পুরুলিয়ার নাম আগে ছিল মানভূম। মান রাজবংশের নামে এই নাম হয়েছিল বলে মনে করেন অনেকে। অনেকের মতে আবার প্রাচীন মান জনগোষ্ঠীর বাসভূমি বলেই এই অঞ্চলের নাম মানভূম হয়েছিল।

বাঁকুড়ার চেয়েও বন্ধুর প্রকৃতির পুরুলিয়ার আসল সৌন্দর্য তার পাহাড়, নদী আর জঙ্গল। অযোধ্যা পাহাড় পুরুলিয়ার সবচেয়ে উঁচু চূড়া। মাঠাবুরু বলে আরো একটি উঁচু চূড়া আছে। পর্যটকদের জন্য এখানে ট্যুরিস্ট লজ আছে। বন দপ্তরের একটি বাংলোও আছে। অযোধ্যা পাহাড়ে এখন চায়ের চাষ হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে। পুরুলিয়া জেলার উত্তরদিক ঘেঁষে দামোদরের তীরে আছে পাঞ্চেত পাহাড়। পাঞ্চেত জলাধার তৈরি হয়েছে এখানে। পাঞ্চেত পাহাড়ের উচ্চতা ২,১১০ ফুট। এখানেই আছে পঞ্চকোট রাজদের প্রাচীন প্রাসাদ। পঞ্চকোট থেকেই পাঞ্চেত শব্দটি এসেছে। আদ্রা রেল স্টেশন থেকে খুব অল্প দূরত্বে আছে জয়ন্তি পাহাড়। তিনটে চ্যাটাল পাথরে যেন তৈরি পাহাড়টা। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। অদ্ভুত রিক্ত সৌন্দর্য জয়ন্তির। পর্বতারোহীদের অনেকে এখানে অভ্যাস করেন নিয়মিত।

ইতিহাসের চোখে এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেইসঙ্গে মতের অমিলও অনেক। কেউ বলেন এখানে বাস করতেন দ্রাবিড় কোলজাতির জনগোষ্ঠী। পরেশনাথের পাহাড় ঘিরে যে জৈনধর্মের পরিমণ্ডলের চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে মনে করা হয় পুরো মানভূম অঞ্চলই জৈন ধর্মের আওতায় ছিল। অনেকের মতে খ্রিস্টিয় চার-পাঁচ শতকে এখানে উৎকল বা ওড্র রাজদের আধিপত্য।

পুরুলিয়ার পঞ্চকোট অঞ্চলটি সম্ভবত সবচেয়ে পুরনো ইতিহাস জড়ান। দুটি কাহিনী আছে এই অঞ্চল ও তার রাজপরিবারের উদ্ভব সম্পর্কে। একটি কাহিনী বলছে অবন্তী (বর্তমান উজ্জয়িনী)-র রাজা সন্তানসম্ভবা রাণীকে নিয়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন করতে যাবার পথে পুরুলিয়ার ঝালদার কাছে শিবিরে বিশ্রাম করছিলেন। এখানেই রাণীর শিশুপুত্র জন্মায়। তাকে ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন রাজা-রাণী। সেই শিশু পরে দামোদর নামে পরিচিত হন এবং পঞ্চকোটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্য একটি কাহিনী বলে রাজার নাম ছিল অনন্তলাল। অরুণবন নামে পরিচিত ছিল পঞ্চকোটি অঞ্চল। বাবা-মায়ের সঙ্গে অরুণবনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সবার অলক্ষ্যে শিশু অনন্তলাল হাতির পিঠ থেকে পড়ে যায়। পরে কপিলা গাভীর দুধের ধারায় জীবন পায় শিশু। শিশুটি বড় হলে কুর্মী সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে সর্দার বলে মান্য করে। কুর্মীরাই পরে অনন্তলালকে শিখরভূমির রাজা নির্বাচিত করেন। এই রাজারই তৈরি পঞ্চকোটি দুর্গ এখনকার গড়পঞ্চকোট। এখানে গড়পঞ্চকোটে প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বনের মধ্যে যে স্থানটিতে কপিলা গাভীর দুধের ধারায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন রাজা অনন্তলাল সেই স্থানটির নাম কপিলা পাহাড়। ঝালদায় রয়েছে এই পাহাড়টি।

আড়ষা অঞ্চলটির আশেপাশে বেশকিছু পুরাকীর্তি রয়েছে। আড়ষা স্থানটিতে আছে

সপ্তনাগের ফণাসহ বিষ্ণুমূর্তি ও মন্দির। মহাবীরের মূর্তিও আছে। আড়ষা থানার জৈদাতে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। দেউলঘাটা আড়ষা থানারই একটি জায়গা। অনেক মন্দির ছিল আগে এখানে। এখন তিনটি মন্দির মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। বাকিগুলির শুধু ধ্বংসস্তূপ আছে। মন্দিরের গায়ে হাঁস, ফুল, লতা, পদ্ম এসবের নক্শা আছে। মূর্তির মধ্যে আছে শিবলিঙ্গ, পার্বতী, মহিষমর্দিনী, দুর্গা, গণেশ। পাল ও সেন রাজত্বের ছাপ সুস্পষ্ট এখানে।

বাগমুন্ডিতে আছে রাজবাড়ি। রাজবাড়ির চত্বরে আছে আটচালার মন্দির। মন্দিরে রাধাগোবিন্দের মূর্তি। বিষ্ণুপুর টেরাকোটার অলংকরণ আছে মন্দিরটিতে। একটি শিবমন্দিরও আছে। বাগমুন্ডির দেউলিতে অনেক মন্দিরের অস্তিত্বের চিহ্ন আছে।

পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানায় আছে পাক বিড়রায় পাঁচটি মন্দির। অনেক মূর্তিও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এর মধ্যে আছে সাত ফুট উঁচু তীর্থংকরের মূর্তি, চন্দ্রপ্রভ, পদ্মপ্রভ, যক্ষিণী, মহাবীরের মূর্তি।

পুরুলিয়ার বিখ্যাত লোকনৃত্য ছৌ। ছৌ নৃত্যের মুখোশ তৈরির জন্য বিখ্যাত চোড়িদা, ঝালদা, আড়ষা। ছোট ছোট গ্রামগুলি থেকেই ছৌ, ঝুমুর, নাচনী নাচের মত ঐশ্বর্যশালী লোকসংস্কৃতির জন্ম।

অযোধ্যা পাহাড়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় দিশুম সেন্দ্রা বা শিকার উৎসব হয়। মূলত আদিবাসী সাঁওতালদের এই উৎসব উপলক্ষে সীতাচাটানে মেলা বসে। বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতালরা এই উপলক্ষে অযোধ্যায় আসেন। শিঙ্গ বা সাঁকোয়া, ধামসা, মাদল বাজিয়ে বল্লম, টাঙি, তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন শিকারে। সারাদিন চলে শিকার, সন্ধের পর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় নাচ-গান আর হাড়িয়ার মাদকতা।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লালমাটির পাশে সবুজ গাছ, কালো পাথরের ইতস্তত ছড়ানো খণ্ড, কাঁটা গাছ, তালগাছ, পুকুর, স্থানীয় অধিবাসীদের মাটির দেওয়ালের বাড়ির নিকোনো উঠোনে নীল আর সাদা রঙের আলপনা—প্রত্যেকটিই তো দর্শনীয় বিষয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার পথই হল বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আসল দ্রষ্টব্য।

> পুরুলিয়ার বিখ্যাত লোকনৃত্য ছৌ। ছৌ নৃত্যের মুখোশ তৈরির জন্য বিখ্যাত চোড়িদা, ঝালদা, আড়ষা। ছোট ছোট গ্রামগুলি থেকেই ছৌ, ঝুমুর, নাচনী নাচের মত ঐশ্বর্যশালী লোকসংস্কৃতির জন্ম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

পর্যটকদের জন্য

বিষ্ণুপুর : কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৫০ কিমি। বাসে ছয় ঘন্টা। কলকাতা থেকে অনেক বাস আছে। রেলপথে দূরত্ব ২০০ কিমি। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস সব কটিই বিষ্ণুপুর যাবার জন্য। থাকবার জন্য পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজ আছে।

মুকুটমণিপুর : কলকাতা থেকে দূরত্ব ২৩৫ কিমি। রকেট বাসে কলকাতা থেকে যাওয়া যায়। এছাড়া বিষ্ণুপুর বা দুর্গাপুর থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট লজ আছে থাকার জন্য। সেচ বিভাগের কংসাবতী ভবন আছে।

অযোধ্যা পাহাড় : কলকাতা থেকে সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে পুরুলিয়া যাওয়া যায়। একরাতের পথ। এছাড়া আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে হাওড়া থেকে রাতে রওনা হয়ে পুরুলিয়া বা আরো একটু এগিয়ে বলরামপুরে নেমে বাসে বাগমুন্ডি। বাগমুন্ডি থেকে পাহাড়ে উঠবার জন্য জিপ পাওয়া যায়। পাহাড় অঞ্চলে সব ঘুরে দেখানোর জন্য গাইডের সাহায্য পাওয়া যায় সহজেই। থাকবার জন্য আছে পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট হস্টেল। এছাড়াও আছে নীহারিকা লজ, কৃত্তিবাস মাহাতোর আশ্রম।

ছবি পঃ বঃ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

অদেখা পুরুলিয়া

এস দত্তচৌধুরী



পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ নৃত্য

ছবি পঃ বঃ পর্যটন নিগম

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে লালমাটির দেশকে নতুন করে জানতে চলুন পুরুলিয়া। বিহারের মানভূম জেলার বাংলাভাষী অঞ্চলকে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নতুন সংযুক্ত এই অঞ্চল পুরুলিয়া জেলা নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তের জেলা পুরুলিয়া, এ অঞ্চলের তরঙ্গায়িত শিলাভূমি, লালমাটির প্রান্তরে সবুজের ছোঁয়া, দলমা পাঞ্চেত-মাঠা পাহাড়ের কোলে শাল-পলাশের বন, দামোদর-দ্বারকেশ্বর-কাঁসাই-সুবর্ণরেখার অববাহিকায় অসংখ্য নদীবাঁধ ও জলাধার এবং সর্বোপরি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পড়ে থাকা অসংখ্য স্থাপত্যসমূহ এই জেলার প্রধান আকর্ষণ।

অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কাছে পরিচিত। এখন পুরুলিয়া শহর থেকে বাসে সিরকাবাদ হয়ে সরাসরি অযোধ্যা পাহাড় চলে আসা যায়। তবে এ পথে বাসে এসে সিরকাবাদ নেমে পড়াই ভালো। সিরকাবাদ থেকে ১৪ কিঃ মিঃ হেঁটে অযোধ্যা পাহাড়কে উপভোগ করে পৌঁছতে পারেন পাহাড়ের চূড়ায়। পথে দেখবেন কৃষকের খেতখামার, আখের চাষ। আরটা ব্লকের এ অঞ্চলে ভালো আখচাষ হয়। পথে বান্দুঝোরায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথচলা। অবশেষে অযোধ্যা পাহাড়, থাকার জন্য আছে পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজ। সি এ ডি সি'র পর্যটন আবাস, খাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ভালো ধাবা আছে অযোধ্যায়। পরদিনটাও হাতে রাখুন অযোধ্যা পাহাড়ের জন্য। চলে আসুন আদিবাসীদের যে কোনও একটি গ্রামে। পরিচিত হোন তাদের সঙ্গে। দেখুন তাদের সুন্দর শৈল্পিক মাটির কুটির, দেওয়ালচিত্র।

ফেরার পথে নামুন বাঘমুন্ডি পথে। দূরত্ব একই রকম। পথে পড়বে বামনি ও টুরগা জলপ্রপাত। বামনিতে চান করে টুরগা জলাধার দেখে নেমে আসুন বাঘমন্ডি। কাছেই ঝালদার রাস্তায় ৩ কিঃ মিঃ দূরে চড়িদা গ্রাম। এই গ্রামেরই বিখ্যাত সূত্রধরেরা তৈরি করেন পুরুলিয়ার বীরত্বব্যঞ্জক ছৌ-নৃত্যের অনিন্দ্যসুন্দর মুখোশগুলি। মনদিয়ে দেখুন এদের শিল্পকর্ম। কিনতেও পারেন মন চাইলে।

.চড়িদার কাছেই কয়রাবেড়া সেচ প্রকল্প ও জলাধার। কয়রাবেড়া আসতে গেলে হেঁটেই আসতে হবে। গাড়ি থাকলে ভালো। চড়িদা থেকে আনুমানিক ৬ কিলোমিটার রাস্তা। পলাশ ও কুলবনের মধ্যদিয়ে কয়রাবেড়া পৌঁছে অবাক হতে হবে। মনে হবে উত্তর হিমালয়ের কোন জায়গায় চলে এসেছেন। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য কয়রাবেড়ায়। কিন্তু থাকার কোনও জায়গা নেই এখানে। বাঘমুণ্ডিতে সেচ বিভাগের বাংলোতে থাকা যায়।

বাঘমুন্ডি থেকে ঝালদার পথে দেখে নেওয়া যায় সুইসা ও দেউলির মন্দিররাজি। থানাশহর ঝালদাকে ঘিরে রয়েছে ছোট বড় টিলা ও পাহাড়। আর একটু এগোলেই বাংলা ঝাড়খণ্ডের সীমানায় 'তুলিন'। মধ্যে সুবর্ণরেখা। ওপারে বিহার। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মুড়ি। তুলিনে থাকার জন্য রয়েছে পি ডব্লিউ ডি'র ডাকবাংলো। আবার ঝালদা থেকে মুরগুমা জলাধার দেখতে অনেকেই আসেন। আপনিও আসতে পারেন। বিরাট হ্রদ, পাহাড়, বনজঙ্গল সবমিলে সুন্দর একটি জায়গা। থাকতে পারেন আগে থেকে অনুমতি নিয়ে সেচ বিভাগের বাংলোতে।

বাঘমুন্ডি থেকে বলরামপুরের পথে আসা যায় মাঠা পাহাড়। পাহাড় আর অরণ্যের মিতালি এখানে। থাকার জন্য আছে মাঠার বনবাংলো।

বলরামপুরে দেখা যেতে পারে লাক্ষা শিল্প ও গালার চুড়ি। গালার চুড়ি তৈরি করে সামান্য ক'টি পরিবার। তবে তাদের শিল্পকর্ম অসামান্য। বলরামপুরের রেল স্টেশন বরাভূম। বরাভূম থেকে সন্ধেবেলা চক্রধরপুর, হাওড়া প্যাসেঞ্জার ধরে ফিরতে পারেন পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে।

জেলা শহর পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিকে রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। পুরুলিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আকর্ষণীয় জলাভূমি "সাহেববাঁধ"। শীতে এখানে আসে পরিযায়ী পাখির দল। পাশেই নেতাজি সুভাষ উদ্যান—প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র ও বিজ্ঞান ভবন। শহরে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ি। এখন তাঁর মা নিস্তারিণী দেবীর নামে মহিলা কলেজ।

মানভূমের ইতিহাসের সঙ্গে পঞ্চকোট রাজ পরিবারের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাশিপুরে পঞ্চকোট রাজবাড়ি দেখতে অনেকেই আসেন। দুর্গাপুজোর সময় রাজবাড়ি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে। কাছেই ব্যস্ততম রেল জংশন আদ্রা। আদ্রা-আসানসোল রেলপথে পড়বে জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন। ছবির মতন সুন্দর স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে চলে আসুন পাহাড় চূড়ায়, পুরুলিয়া থেকে মহকুমা শহর রঘুনাথপুর হয়েও জয়চণ্ডী পাহাড় আসা যায়। সড়ক পথে দূরত্ব ৪৭ কিঃ মিঃ। রঘুনাথপুরে পূর্ত বিভাগের বিশ্রামাগার বা প্রাইভেট লজে থাকা যায়। এখান থেকে আসা যায় 'চেলিয়ামা'। টেরাকোটার কাজের জন্য এখানকার রাধাবিনোদ মন্দির বিখ্যাত।

বর্ধমান-বিহার সীমান্তে পাঞ্চেত ড্যাম। রঘুনাথপুরের উত্তরে। এখানে নেতুরিয়া ব্লকের বাগমারা অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম সম্প্রতি উদ্বোধন করেছেন একটি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্রের। পাঞ্চেত জলাধার ও গড়পঞ্চ কোটের ভগ্নাবশেষের কাছে এই ভ্রমণ কেন্দ্রটি খুব তাড়াতাড়ি ভ্রমণার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

পুরুলিয়া থেকে দক্ষিণে পুইঞ্চা ব্লকের 'পাকবিড়রা' বিখ্যাত জৈন মন্দিরের জন্য। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই জৈন মন্দিরগুলি গড়ে ওঠে। জৈন ধর্মাবলম্বীদের থাকার জন্য এখানে একটি ধর্মশালা আছে। পুরুলিয়া থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৫৫ কিঃ মিঃ। কাঁসাই নদীর অববাহিকায় এই অঞ্চলে 'তুইসামায়' ভগ্ন স্থাপত্যকীর্তি থেকে জৈন ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।



পাকবিড়রা থেকে মানবাজারের পথে পড়বে 'বুধপুর'। মাকরানা পাথরে তৈরি বুদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির আছে এখানে। শিবরাত্রিতে বড় মেলা বসে। মন্দির চত্বরে বিষ্ণু ও গণেশমূর্তি থেকে একদা একটি বৈষ্ণব বা গানপতদের উপাসনাস্থল ছিল বলে মনে করা হয়। নাম থেকে মনে হয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি ছিল বৌদ্ধদের একটি চৈত্য।

জেলার দক্ষিণ সীমান্তে দলমা পাহাড়ের কোলে 'দুয়ারসিনি'। বান্দোয়ান থেকে দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। আছে বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা ছোট্টনদী 'গুরুম'। বন উন্নয়ন নিগম এখানে পর্যটকদের জন্য তিনটি কটেজ তৈরি করেছে। বান্দোয়ান থেকে আসা যায় কুইলাপাল। পুরুলিয়া থেকে বান্দোয়ান (৭৫ কিঃ মিঃ) হয়ে বাসে এখানে আসা যায়। থাকার জন্য আছে বনবাংলো। কুইলাপালে মানুষ ও সুন্দর প্রকৃতি যেন পরস্পরের পরিপূরক।

জেলার আড়টা ব্লকের বরাম মৌজার দেউলঘাট গ্রামের মন্দিররাজি জেলার অন্যতম পুরাকীর্তি অঞ্চল। কাঁসাই নদীর ধারে এই গ্রামে এক সময় ১৫টির বেশি মন্দির ছিল। অধিকাংশই অযত্নে অবহেলায় ভেঙে পড়েছে। এখানে পাওয়া শিবলিঙ্গ, অষ্টভূজা দুর্গা মূর্তি থেকে মনে হয় এটি শৈবপীঠ ছিল। দেউলঘাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় পরাক্রমশালী রাজা রুদ্রর পুত্র দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিররাজি নির্মাণ করেন। জেলার গজপুরে সম্প্রতি অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

পৌষ সংক্রান্তিতে 'তুসু' পরবের মেলা দেখতে পুরুলিয়া আসতে পারেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই মেলা বসে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হয় আদিবাসী ভাইদের শিকার উৎসব। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে চাকনতোড়ে বসে দাতাপরবের মেলা। আদিবাসী ভাইবোনদের নৃত্যগীত ও ছৌনাচ জেলার যেকোন উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ঝাড়গ্রাম

শাল-পিয়ালের দেশে

মন কেমন করা যে কোনো উদাস দুপুরে বেরিয়ে পড়া যায় শাল-পিয়ালের দেশে। হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় মহুয়া-মাতাল ঝাড়গ্রামে। ট্রেনে চলতে চলতেই হঠাৎ-ই চোখে পড়ে যাবে লালমাটির পথ। মনকে তখন ধরে রাখা দায়। বিহার-ওড়িশার সীমান্তে বাংলার এই ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রকৃতিতে প্রাধান্য পেয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলকে ঘিরেই এখানকার মানুষের জীবনযাপনের ছন্দ। গাঢ় সবুজ অরণ্য দিগন্তে যেন পাহাড় হয়ে আছে। নীচে সবুজ সমুদ্র। লাল কাঁকুরে পথ। এই সতেজতা জীবনকে প্রাণিত করে মুহূর্তে।

রাজপ্রাসাদে থাকার স্বাদও নিতে পারা যায় এখানে। রেলস্টেশন থেকে কিমি তিন দূরে রাজবাড়ি। মল্লরাজাদের এই প্রাসাদের একাংশে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট লজ। ঘর সংরক্ষণ করতে হবে বিবাদি বাগ থেকে।

ঝাড়গ্রাম শহর রিকশায় বা সময় থাকলে পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রকানন, আর্ট আকাদেমি, আদিবাসী সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, কদমকাননে ডিয়ার পার্ক।

ঝাড়গ্রাম থেকে লোধাশুলির দিকে যে মনোহরণ পথটি চলে গেছে, সেদিকে ১০ কিমি গেলেই জঙ্গলমহল। নানারকম গোলাপ ফোটে এখানে। গোলাপ বাগিচাটি সত্যিই দর্শনীয়। মেল বাঁধ বা কেরেন্দার বাঁধ নামে দুটি বিশাল দীঘি আছে। ঝাড়গ্রামের রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল এ দুটি খনন করিয়েছিলেন। রাধানগরের এই দীঘি দুটিকে ঘিরে গড়ে তোলা যায় পর্যটন আবাস। পর্যটক আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করা যায় এই জলাশয়গুলিকে। এখান থেকে জামবনী আধঘণ্টার পথ। জামবনীর রাজাদের প্রাসাদ ছিল এই চিল্কিগড়ে। এখন এটি নষ্ট হচ্ছে। ডুলুং নদীর ধারে কনকদুর্গার মন্দিরে যেতে হয় গা ছমছম শিহরণে। নরবলি হতো এক সময় এই মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায়। অদ্ভুত নিঃশব্দতায় গহন অরণ্যের মাঝে বিরাজমান কনকদুর্গার এই মন্দির।

ঝাড়গ্রামের আর এক মন্দির সাবিত্রী মন্দির। এই মন্দিরকে ঘিরে অনেক গল্পকথা আছে।

ঝাড়গ্রাম ছিল পাইকচুয়াড় অধ্যুষিত। গভীর অরণ্যে দস্যুবৃত্তি ছিল এদের জীবিকা। শুধু ধন-সম্পত্তি নয়, লুঠ করত সুন্দরী মেয়েও। এভাবেই একদিন লুঠ করে আনা হয় সাবিত্রীকে। দস্যুগৃহে লালিত হতে থাকে সাবিত্রী। দস্যু-পুত্রের হাত থেকে বাঁচতে রূপবতী সাবিত্রী আশ্রয় নেয় এক সরোবরের মাঝে মন্দিরে। সঙ্গে দৈবপ্রেরিত খড়্গ। দস্যুদের পরাজিত করে একদিন ঝাড়গ্রাম দখল করে রাজ-পরিবার। সাবিত্রীর সঙ্গে রাজার বিয়ের ঠিক হয়। বিয়ের আঙিনা থেকে অনিচ্ছুক সাবিত্রী একাকিনী বনের পথ ধরে। রাজাও পিছু নেয়। বন ছেড়ে বালিয়াড়িতে চলে যায় সাবিত্রী। রাজা সাবিত্রীর কেশগুচ্ছ ধরামাত্রই বালিয়াড়িতে আঁধি ওঠে। ডুবে যায় সাবিত্রী। মূর্ছিত রাজাকে উদ্ধার করা হলে দেখা যায় মুঠোবন্দী সাবিত্রীর চুল। সেই রাজাই সাবিত্রীর মন্দির গড়েন। এই মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই। পূজিত হচ্ছে দৈব-প্রেরিত খড়্গ আর পেটিকাস্থিত কেশগুচ্ছ।

ঝাড়গ্রাম থেকে অনায়াসে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্যে চলে যাওয়া যায় গিধনিতে। বিভিন্ন আদিবাসীর বাস এখানে। দলমা পাহাড়ের কোলে এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আছে বন দপ্তরের বাংলো।

আদিবাসী অধ্যুষিত **শিলদাও** ঘুরে আসা যায়। শিলদায় দেখা যাবে রাজবাড়ি এবং নানান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। রাণী কিশোরমণির তৈরি নতুন সব মন্দির এবং দীঘিও দর্শনীয়।

শিলদা ছেড়ে এগোলেই বেলপাহাড়ি। ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে ঘণ্টা খানেক। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি থেকে দূরত্ব মাত্র ২৬ কিমি। এক পাহাড়ি উপত্যকা বেলপাহাড়ি। নামের মধ্যেই এক অজানা টান। বেলপাহাড়ির বন বাংলোয় প্রকৃতির মাঝে অনায়াসেই কাটানো যায় কয়েকটা দিন। নিরালা প্রকৃতির মাঝে ছুটির স্বাদ হয়ে ওঠে আলাদা।

পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা গ্রামে আদিবাসীদের প্রাণময় জীবনভঙ্গির দেখা মেলে বাঁশপাহাড়িতেই। বেলপাহাড়ি থেকে হাঁটা পথে এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় ঘাঘরা। মনে হবে এলেম নতুন দেশে। ঘাঘরা যেন স্বপ্নরাজ্য। ছড়ানো-ছিটানো পাহাড়ের মাঝে গহন অরণ্য। ৬০ ফুট উঁচু থেকে নামছে তারাফেনির রুপোলি জলধারা।

এই বেলপাহাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কিমি গিয়ে কাঁকড়াঝোড়। তামাজুড়ি হয়ে ভোলাভেদার পথ হয়ে বাস যায়। বাকি ১৮ কিমি ট্রেকিংয়ে অনবদ্যভাবে পাওয়া যায় প্রকৃতিকে।

জিপ বা অ্যাম্বাসাডারও চলে এ পথে। বাঁশপাহাড়ি হয়ে শিয়ববেদা। শিয়ববেদা থেকে কাঁকড়াঝোড়ের গহন অরণ্য। চড়াই উতরাইয়ের এই পথে পথ ভুলের আশঙ্কাও থাকে। জনবিরল এই অরণ্যে পথ রোধ করতে পারে দলমা পাহাড় থেকে আসা হাতির পাল। ৯০০০ হেক্টরের এই সবুজ অরণ্যে শাল, সেগুন, মহুয়া, কুসুম, পলাশমণি যেমন আছে, তেমন আছে ভালুক বুনো শুয়োর। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথায় জানা যায় ভালুক আর বাঘ, লেপার্ডের ভয়ে তারা সদা সন্ত্রস্ত থাকে। আদিবাসীদের মাদলের তালে চাঁদনি রাত বড় মায়াবি পরিবেশ তৈরি করে। বনবাংলোয় একটা রাত থাকতে পারলে অরণ্যকে দেখা যাবে আর এক রূপে। পায়ে পায়ে যাওয়া যায় বিহারের দলমা পাহাড়। ছোট্ট নদী পেরিয়ে ৭ কিমি পায়ে হেঁটে হুল্লুম। হুল্লুম থেকে ১৫ কিমি বাসে গেলে ঘাটশিলা। এখান থেকে গালুডি স্টেশনও কাছে। তবে ঝাড়গ্রামই সুবিধাজনক। এখানে আছে বৃহদাকার শিবলিঙ্গ আর নাগিনীকন্যার মন্দির। আছে নানা আদিবাসী গ্রাম।

নিজস্ব প্রতিবেদক

উপকূল বাংলা

- দীঘা - শঙ্করপুর - কাঁথি - তমলুক
- সুন্দরবন - ডায়মন্ড হারবার - কা কদ্বীপ -ক্যানিং
- বসিরহাট

সুদীর্ঘ সৈকত ভূমি ,ম্যানগ্রোভ অরণ্য, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার
জলে জঙ্গলে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ ———
উপকূল বাংলাকে অনন্য করে তুলেছে।



উপকূল বাংলা



দীঘার অমরাবতী লেক

ছবি কাজল বিশ্বাস

দীঘা

বঙ্গোপসাগরের কোলে 'উপকূল বাংলা'র অন্যতম আকর্ষণ দীঘা। সবুজ ঝাউবন আর সমুদ্রের ডাক, বালিয়াড়ি আর নুলিয়া, মাদুর আর ঝিনুক সামগ্রী—এসবই দীঘার অজস্র অনুষঙ্গের কিছুটা ঝলক।

পুরনো দীঘায় অবশ্য এখন আর ঝাউবনের সেই সৌন্দর্য নেই। ঝাউবন বা বালিয়াড়ি দেখতে হলে যেতে হবে নিউ দীঘায়।

দীঘায় এখন পাড় বাঁধানো সমুদ্র। কংক্রিটের চওড়া স্ল্যাবে আছড়ে পড়ছে গর্জনরত সমুদ্র। নিদাঘ গ্রীষ্ম আর সঘন বর্ষা বাদ দিয়ে বছরের অবশিষ্ট মরশুমে বিশেষত শীতে দীঘা সত্যিই অপরূপা !

দীঘায় অন্যান্য দর্শনীয় ক্ষেত্র হল—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের তৈরি, কৃত্রিম অমরাবতী লেক, এশিয়ার বৃহত্তম অ্যাকোয়ারিয়াম, একশো একর জুড়ে নারকেল গবেষণাকেন্দ্র ও কাজুবাদাম খামার, দীপক মিত্রের সর্পোদ্যান এবং সায়েন্স মিউজিয়াম। অমরাবতীতে বোটিংয়ের বন্দোবস্তও আছে।

দীঘার কাছেপিঠে আরও কিছু দেখার আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তে দীঘা থেকে সাত কিমি দূরে ওড়িশা চন্দনেশ্বর শিবমন্দির। দীঘার দু কিমি দূরে সীমান্ত এলাকা কিয়াগেড়িয়া—যেখানে বাংলার শেষ। কিয়াগেড়িয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাস ও অটো রিকশায় যাওয়া যায়। স্থানীয় জাগ্রত শিবমন্দির এলাকার মানুষের কাছে পরম পবিত্র।

দীঘা থেকে মহকুমা শহর কাঁথি বত্রিশ কিমি। কাঁথি থেকে পেটুয়াঘাট আঠারো কিমি। বাসে রসুলপুর নদী পেরিয়ে হুগলি ও রসুলপুর নদীর সঙ্গমস্থলে প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো মসজিদ হিজলির মসনদ-ই-আলা—স্থানীয় নাম বাবা সাহেবের কোঠগড়া। নদীর ওপারে পেটুয়াঘাট পৌঁছে দরিয়াপুরের লাইট হাউসে যাওয়া যায়। দূরত্ব দু কিমি। রিকশায় যেতে পারেন।

এখান থেকে কাঁথি ফেরা। তারপর বাসে বা অটোরিকশায় জুনপুট। ঝাউবন, বেলাভূমি আর মাছ চাষের বড় সরকারি খামার নিয়ে জুনপুট। কাঁথি থেকে দীঘার পথে চাউলখোলা। বাঁহাতি পথে সাত কিমি দূরে নুন তৈরির কারখানা বেঙ্গল সল্ট ফ্যাক্টরি।

দীঘা থেকে এগারো কিমি দূরে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোলে আরেক সমুদ্র সৈকত শংকরপুর। গভীর ঝাউবন, নিরালা সৈকত, বালিয়াড়ি, ট্রলার সারাইয়ের কারখানা, মাছ শুকানো, মাছ ধরতে যাবার প্রস্তুতি, জাল তৈরি—সব মিলিয়ে দীঘার কাছে আরেক আকর্ষণীয় পর্যটনক্ষেত্র শংকরপুর।

কিছুদূর এলে মোহানা। চম্পানদী বা চম্পাখাল মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। শংকরপুরে থাকার জায়গা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের বেনফিশের কিনারা ও ফিশারিজ কর্পোরেশনের মৎস্যগন্ধা। এছাড়া আছে কিছু বেসরকারি হোটেল।

দীঘা থেকে সোজা বাস যায় শংকরপুর। কাঁথি থেকেও যায়। দীঘা থেকে কলকাতাগামী বাসে চোদ্দো মাইল, স্টপে নেমে ভ্যান রিকশায় শংকরপুর যেতে পারেন।

কীভাবে যাবেন

কলকাতার স্টিফেন হাউসের সামনে পর্যটন দপ্তরের অফিসের কাছ থেকে এবং ধর্মতলা, গড়িয়া ও হাওড়া স্টেশন থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাস ছাড়ে। দমদম-উল্টোডাঙা, ব্যারাকপুর, আসানসোল এবং দুর্গাপুর থেকেও বাস পাবেন। ট্রেনে হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে খড়্গপুর পর্যন্ত একশো ষোল কিমি ট্রেনে এসে তারপর খড়্গপুর থেকে বাসে প্রায় ছিয়ানব্বই কিমি দূরে দীঘা। হাওড়া থেকে মেচেদা লাইনে ষাট কিমি দূরে মেচেদায় নেমে বাসে একশো তিন কিমি দূরে দীঘা। দীঘা থেকে সকাল-বিকেল বার তিনেক শংকরপুরের বাস ছাড়ে। কাঁথি-শংকরপুর বাস চলাচল করে দিনে চারবার। কাঁথি থেকে শংকরপুর দেড় ঘন্টা।

থাকার ব্যবস্থা

পর্যটন বিভাগের দীঘা-ট্যুরিস্ট লজে এসি ডিলাক্স ডাবল বেডের ঘর দুটি। ভাড়া ৬৬০ টাকা। এসি স্ট্যান্ডার্ড ডাবল বেডের ঘর দুটি। ভাড়া ৫৫০ টাকা। নন এসি ফ্যামিলি স্যুট বড় ১টি ঘর। ভাড়া ৫০০ টাকা। নন এসি ফ্যামিলি স্যুট ছোট ২টি ঘর। ভাড়া ৪৫০ টাকা। নন এসি স্ট্যান্ডার্ড ডাবল বেডের ঘর ২টি। ভাড়া ৩৮৫ টাকা। নন এসি স্ট্যান্ডার্ড ডাবল বেডের ঘর (একতলায়) ২টি। ভাড়া ৩৩০ টাকা। নন এসি ডাবল বেডের ঘর ৮টি। ভাড়া ২৫০ টাকা। নন এসি ৩ থ্রি-বেডের ঘর ২টি। ভাড়া ৪৪০ টাকা। নন এসি থ্রি-বেডের ঘর (একতলায়) ২টি। ভাড়া ৩৮৫ টাকা। পাঁচ-শয্যার ডর্মিটারি ১টি ঘর। ভাড়া শয্যাপিছু ৮০ টাকা।

বুকিংয়ের জন্য
Tourism Centre,
3/2, B B D Bag (East),
Kolkata-1.
Phone: 248 5917, 5168, 8272, 8273 ও 210 3201, 3199

এছাড়া আছে অজস্র বেসরকারি হোটেল ও হলিডে হোম।

শংকরপুর

বেনফিশের কিনারা বুকিংয়ের জন্য
Kinara Guest House, Shankarpur Fishing Harbour,
P.O.-Bodhra
Dist-Midnapur-721428
ফোন (03220) 64577
কলকাতায় বুকিং : Benfish,
P-161 / 1, VIP Road,
Kolkata-54
ফোন 334 4931, 3860.

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারিজ কর্পোরেশনের মৎস্যগন্ধার বুকিংয়ের জন্য
Matsyagandha,
Shankarpur Fishing Harbour,
P.O-Bodhra,
Dist-Midnapur-721428.
ফোন (03220) 64259
কলকাতায় বুকিং
West Bengal Fisheries Corporation,
6-A, Dr. Deodhar Rahaman Road,
Kolkata-33,
ফোন : 473 5424.

এখানেও কিছু বেসরকারি হস্টেল ও লজ আছে।

তমলুক

মেদিনীপুরের এক বিশিষ্ট পুরাকীর্তি স্থান তমলুক। রূপনারায়ণ নদের প্রায় দু কিমি পশ্চিমে অবস্থিত এখনকার তমলুক শহর প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দরনগরী বলে অনুমান। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে পাঁশকুড়া বা মেচেদা স্টেশন থেকে দক্ষিণমুখী পাকা রাস্তায় তমলুক যাওয়া সহজ।

প্রায় ঐতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে শুঙ্গ, মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের অজস্র পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে তমলুক শহর ও তার আশপাশ থেকে। অদূরে রূপনারায়ণ ও বঙ্গোপসাগরের অবস্থান এখানে প্রাচীন বন্দরনগর তাম্রলিপ্তের গড়ে ওঠার কথা প্রমাণ করে। পর্যটক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের চেষ্টায় তাম্রাশ্মীয় পর্বের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তমলুক ও সংলগ্ন ইছাপুর, অমৃতবেড়িয়া, বাঁকা, নাটশাল প্রভৃতি স্থান থেকে। এসবের মধ্যে কৃষ্ণলোহিত ও উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের নিদর্শনও আছে। এখানে নবাশ্মীয় পর্বের কিছু কুঠারও পাওয়া গেছে। সেগুলি তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত আছে। তাম্রাশ্মীয় পর্বের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে উঁচু কানাযুক্ত ও ফোটা ফুলের আকৃতির এক শ্রেণীর পাত্র, পিলসুজ আকারের থালি, চিত্রিত ও নকশাকাটা মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, তমলুকের নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত প্রায় ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের প্রায় ২৫ রকমের পোড়ামাটির নিদর্শন সংরক্ষিত আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারে।

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে উপরোক্ত পুরাকীর্তির নিদর্শন ছাড়াও শুঙ্গ, মৌর্য, কুশান, গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের অনেক মূর্তি ও কিছু প্রস্তর মূর্তি সংরক্ষিত আছে। এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য পুরা নিদর্শন অমরাবতী ভাস্কররীতিতে তৈরি বালি-পাথরের এক বুদ্ধ মস্তক। অনুমান এটি ৪র্থ শতকে গুপ্তযুগে নির্মিত। বিভিন্ন সময়ের প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তমলুকে। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের অনুমিত পদ্ম, চক্র, চৈত্য, হস্তী মৃগ ও সিংহ চিহ্নিত কিছু মুদ্রা পাওয়া যায় ১৮৮১ সালে রূপনারায়ণপুরের পুরনো খাত থেকে। নানা প্রাচীন মূর্তির পাশাপাশি পাঠান ও মোগল যুগের বহু মুদ্রা তমলুক থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢালাই করা ও অঙ্ক চিহ্নযুক্ত বেশকিছু প্রাচীন মুদ্রাও রয়েছে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায়। এখানকার হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত সতীশস্মৃতি মিউজিয়ামে চতুষ্কোণ ও বৃত্তাকার মৌর্য ও শুঙ্গযুগের অঙ্ক চিহ্নযুক্ত কয়েকটি তাম্রমুদ্রা আছে। রয়েছে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও মধ্যযুগের কয়েকটি সম্পূর্ণ মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, নারী ও পুরুষের পোড়া মাটির মূর্তি, দু-চাকার মেষশকট, নবাশ্মীয় পর্বের

কুঠার ও চাঁছবার যন্ত্র, টেরাকোটা যক্ষীমূর্তি ইত্যাদি। স্থানীয় হ্যামিলটন উচ্চ বিদ্যালয়ে সংগ্রহশালায়ও কিছু কিছু পুরাকীর্তি সংরক্ষিত আছে।

তমলুকের মন্দিরগুলি ওপরে বলা পুরাবস্তুর তুলনায় বেশ আধুনিক। এই শহরের ভীমাবাজার এলাকায় প্রসিদ্ধ বর্গভীমার দেউলটি একটি উঁচু জায়গায় অবস্থিত। অনেকের ধারণা, এখানে মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ স্তম্ভ ছিল—যেটি সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন। নিচ থেকে একুশটি সিঁড়ি পেরিয়ে বর্গভীমায় পৌঁছতে হয়। বর্গভীমা মন্দিরের বড় দেউলে ওড়িশি রীতির প্রভাব স্পষ্ট। তবে এর শীর্ষের স্থাপত্য অন্য রকম। সেটা অনেকটা স্তুপের মতো। গর্ভগৃহের পুবের দেওয়ালে একটি উঁচু বেদীতে দেবী ভীমা অধিষ্ঠিতা। প্রস্তর নির্মিত এই দেবীমূর্তি চতুর্ভুজা, শবের উপর আসীনা, ডানদিকে ওপরের হাতে খড়্গ, নিচের হাতে ত্রিশূল। বামে ওপরের হাতে পানপাত্র খর্পর ও নিচের হাতে নৃমুণ্ড। এর নাটমন্দিরটি শতাধিক বছর আগে নির্মিত। বর্গভীমা মন্দিরের পশ্চিমে সিঁড়ির পাশে শিবের একটি পঞ্চরথ দেউল লাহোরের জম্মু পরগনার রামকোটবাসী রামানন্দ মগলুরিয়া চৌধুরী ১২৬০ সালে নির্মাণ করেন। ভীমাবাজারের কাছে শঙ্কর আড়ায় কর্মকারদের রঘুনাথের পঞ্চরত্ন উনিশ শতকের শেষে নির্মিত বলে অনুমান।

মন্দিরপ্রধান তমলুকের উল্লেখযোগ্য আর কটি মন্দির হল রাজবাড়ির দুটি রাধামাধব ও রাধারমণের পাশাপাশি দুটি সপ্তরথ দেউল ও সংলগ্ন চারচালা জগমোহন। এই দুই মন্দিরেই বর্গভীমা মন্দিরের স্থাপত্য দৃশ্যমান। মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাতা রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

স্থানীয় হরির বাজারে রামজীউর সপ্তরথ দেউল, চারচালা জগমোহন ও নাটমন্দির উল্লেখ্য। হরির বাজারে জগন্নাথের আটচালা বৃহদাকৃতি। জগন্নাথ মন্দিরের অদূরে জিষ্ণু হরির সপ্তরথ দেউল ও চারচালা জগমোহন পশ্চিমমুখী। এটি ইটের তৈরি। সেনযুগে নির্মিত পাথরের দুটি বিষ্ণুমূর্তিই জিষ্ণুহরির মূর্তি। অনুমান এ দুটি এখানকার কোনও লুপ্ত প্রাচীন দেবমন্দিরে ছিল।

তমলুকের মহাপ্রভুবাজারে বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের স্মৃতিধন্য মহাপ্রভুর দালান মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরবাড়ির বাইরে গোস্বামীদের আটটি চারচালা মন্দির আছে। পদুমবসানেও একটি চারচালা মন্দির রয়েছে।

বসিরহাট

কলকাতা থেকে ৫৬ কিমি দূরে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট। কলকাতা থেকে সরাসরি বাস, শিয়ালদা থেকে ইছামতী এক্সপ্রেস, দমদম ও বারাসাত থেকে একাধিক ট্রেনে পৌঁছতে পারেন বসিরহাট। ঐতিহ্যময় এই প্রাচীন মহকুমা শহরটির অবস্থান ইছামতী বা যমুনা নদীর তীরে।

পঞ্চাননতলা, কালীমন্দির, চড়ক, রথ, বারুণী, জন্মাষ্টমী, পীরের মেলা ইত্যাদি নিয়ে প্রায় সম্বৎসর উৎসবমুখর থাকে বসিরহাট।

প্রসঙ্গত, ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বসিরহাট পরিচিত ছিল বসুরহাট নামে। খোলাপোতা থেকে মছলন্দপুরগামী রাস্তাটি গৌড়বঙ্গ রোড নামে পরিচিত ছিল।

বসিরহাট টাউন স্কুলের কাছে বিখ্যাত শাহী মসজিদ বা শালিক মসজিদ। ১৪৬৭ সালে উলুগ মজলিসই আজম এটি নির্মাণ করেন। এছাড়া নিকারিপাড়ায় আরেকটি মসজিদ আছে। শোনপুকুর ও আস্তানা রোডের কাছে দুই পীরের আস্তানায় আসেন সব সম্প্রদায়ের মানতকারী মানুষ।

হাটখোলার ইছামতীর তীরে বারুণী উৎসব উপলক্ষে বসে তিন দিনের মেলা। পুণ্যস্নান ও গঙ্গাপুজো হয়। নলপোড়া ও মন্দিরহাটায় দুটি প্রাচীন শিবমন্দিরে নিত্যসেবা হয়। কালীবাড়িপাড়া, নৈহাটি, দণ্ডীপাট ও হাটখোলায় আছে কালীমন্দির আর ট্যাটরা পঞ্চাননতলায় পঞ্চাননের থান।

বসিরহাট মহকুমা শাসকের বাংলোর কাছে সংগ্রামপুরে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল। গড়ের ধ্বংসাবশেষে সেই সংগ্রামেরই সাক্ষ্য দেয়। সংগ্রামপুরে দক্ষিণ কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। পরে অবশ্য এই মন্দির টাকির জমিদার সূর্যকান্ত রায়চৌধুরির দখলে আসে। এখানে দুর্গা ও কালীপুজো হয়।

টাকি রোডে পাশে ধান্যকুড়িয়ায় শিবমন্দির, কালীমন্দির, মদনমোহন জীউ মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে শ্যামাচরণ বল্লভ মদনমোহন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামে আষাঢ় মাসে রাস মঞ্চের কাছে রথযাত্রা পূর্ণযাত্রার মেলা, কার্তিক পূর্ণিমায় চার-পাঁচ দিনের এবং চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসে।

টাকি রোডের ধারে নেহালপুরে মহিষপুকুরের কাছে প্রত্যেক বছর ১২ ফাল্গুন পীর গোরাচাঁদের নামে একদিনের মেলা বসে। কাঁকড়া গ্রামে রায় উপাধিধারী জমিদারদের স্থাপিত দুর্গামণ্ডপ ও সাতটি শিবমন্দির আছে। বারাসাত-হাসনাবাদ রেল লাইনে হাড়োয়া রোড বা মালতীপুর স্টেশনে নেমে কাঁকড়া যাওয়া যায়।

পনেরো দিনব্যাপী ঈদের মেলা বসে কৃপালপুরে। বাস রাস্তা থেকে আট কিমি হাঁটা পথ বা নৌকোয় যাওয়া যায়। এই গ্রামে একটি মসজিদ ও কয়েকটি মন্দির আছে।

কলকাতা-বসিরহাট বাস রুটে বেকিরহাটে নেমে প্রায় দুকিমি হাঁটা-পথ শ্রীনগর। এই গ্রামে প্রাচীন রক্ষাকালীর পুজো হয় চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার।

শ্যামবাজার-হাসনাবাদ ও শ্যামবাজার-বসিরহাট বাসরুটে খোলাপোতায় নেমে হাবড়াগামী বাসে গোবিন্দপুর, ধোকড়া গ্রামে যেতে হয়। এখানে চৈত্র মাসে বারুণী স্নানের একদিনের মেলা এবং আষাঢ় মাসে দুদিনের মেলা বসে।

বালবল্লভী রাজ্যের রাজধানী বালান্দার খ্যাতি বৌদ্ধযুগ থেকে। এই বালান্দা ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চাকেন্দ্র। এক সময় উৎকৃষ্ট মাদুর তৈরির সুখ্যাতি ছিল।

বসিরহাট মহকুমার একটি প্রাচীন জনপদ হাড়োয়া। চণ্ডীমণ্ডপ, গোরাচাঁদ পীরের দরগাহ ও মসজিদ আছে এখানে। বারাসাত থেকে ট্রেনে হাড়োয়া রোড স্টেশনে নেমে কিংবা বেড়াচাঁপা থেকে বাসে এই গ্রামে যাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এই গ্রামে পীর গোরাচাঁদের উরস উপলক্ষে মেলা, দুর্গাপুজোর মেলা ও চড়ক জনপ্রিয়। স্থানীয় হরিপুর গ্রামে ধনপোতায় রাজা চন্দ্রকেতুর ধনাগার ছিল বলে কথিত। পাশেই চিবির বাগান বলে একটি ধ্বংসস্তূপ আছে। শতাধিক বছরের পুরনো চড়কমেলা অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

শিয়ালদা থেকে বাসে ঘুষিঘাটা কর্পোরেশন পৌঁছে লঞ্চে মালঞ্চ। মিনাখাঁ

থানার অন্তর্গত এই গ্রামে ব্যাপক ফুলচাষ হত বলে নাম মালঞ্চ। এখানে কালীমন্দির, তারকেশ্বর শিবমন্দির, মনসার থান ও বনবিবির দরগা আছে।

কলকাতা থেকে ৩৪ কিমি দূরে বেড়াচাঁপা। একদা মার্টিন কোম্পানির রেল স্টেশন ছিল এখানে। এখানে আড়াই হাজার বছরের পুরনো জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখান থেকে হাড়োয়াগামী রাস্তায় বামদিকে খনা মিহিরের ঢিবি। প্রসঙ্গত, এই জায়গা এক সময় দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল। বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়টি বিরাট এলাকাভুক্ত। পোড়া ইটের উঁচু পাঁচিল ঘেরা এই জায়গায় ছিল সেনানিবাস, হাতিশালা, সিংহদ্বার, রাজকর্মচারী নিবাস, দিঘি ইত্যাদি। চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অসংখ্য নিদর্শন যেমন বুদ্ধমূর্তি, বোধিবৃক্ষ, হস্তী, পদ্ম, স্বস্তিকচিহ্ন, জাতক কাহিনীযুক্ত ফলক, ধর্মচক্র, মুদ্রা ও সিল পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত চন্দ্রকেতুগড় শুঙ্গ শাসকদের অধীন ছিল। শুধু তাই নয়, বেড়াচাঁপার দশ মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে মৌর্যযুগের, ভাঙড় গ্রামে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তি এবং ধারা গ্রামে পাল যুগের প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

ইছামতী বা যমুনা নদীর তীরে উত্তর ২৪ পরগনার পুবদিকে টাকি। পুবে যমুনা, পশ্চিমে বিদ্যাধরী ও সুন্দরবনের উত্তরে এর অবস্থান। ধান উৎপাদনে টাকির সুদীর্ঘকালের সুখ্যাতি। এখানকার জমিদার কালীনাথ মুন্সির অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয় টাকি রোড।

যমুনা ও কালিন্দীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হিঙ্গলগঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরাজ রাজকর্মচারী টিলম্যান হেঙ্কেলের নাম। যশোহরের জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হেঙ্কেল প্রতিষ্ঠা করেন হেঙ্কেলগঞ্জ বাজার। পরবর্তীকালে যা হিঙ্গলগঞ্জ নামে পরিচিত হয়। এখানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ১৪ দিন ধরে মেলা বসে রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরে। পার্শ্ববর্তী রমাপুর গ্রামে দোলযাত্রার মেলা বসে।

হিঙ্গলগঞ্জ থেকে বাস বা নৌকোয় যাওয়া যায় কনকপুর। এই গ্রামে শতবর্ষ প্রাচীন চারটি অনুষ্ঠান হল আশ্বিনে দুর্গাপুজো, ফাল্গুন ও মাঘে হরিপুজো, ফাল্গুনে কালীপুজো ও চৈত্রে চড়ক উৎসব।

চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অসংখ্য নিদর্শন যেমন বুদ্ধমূর্তি, বোধিবৃক্ষ, হস্তী, পদ্ম, স্বস্তিকচিহ্ন, জাতক কাহিনীযুক্ত ফলক, ধর্মচক্র, মুদ্রা ও সিল পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত চন্দ্রকেতুগড় শুঙ্গ শাসকদের অধীন ছিল।

কলকাতা থেকে ৬৯ কিমি দূরে ইছামতীর তীরে অবস্থিত হাসনাবাদ সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। হাসনাবাদ থানার অধীন প্রসিদ্ধ তিনটি জায়গা সিমুলিয়া, রামেশ্বরপুর ও ইছাপুর। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে হাসনাবাদ হয়ে কিংবা বাসে সিমুলিয়া যাওয়া যায়। যাওয়া যায় জলপথেও। এখানে মহা ধুমধামের সঙ্গে শীতলাপুজো, দুর্গাপুজো, শ্যামাপুজো, বাসন্তীপুজো ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বছরে একবার মুসলিমদের ইছালে ছাওয়ার অনুষ্ঠিত হয়। রামেশ্বরপুরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে প্রতিবছর স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। কৃষিপ্রধান ইছাপুর গ্রামে ঋষিদাস সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব হয়। পাশের বেদেমারি পারঘাটা গ্রামে একটি মন্দিরে কালী, বনদেবী, শীতলা, মনসা ও হরি ঠাকুরের বিগ্রহ আছে। বছরে উৎসব হয় একবার।

হাসনাবাদ থেকে লঞ্চে সন্দেশখালি। রায়মঙ্গল ও কালিন্দি নদীপথ। বারাসাত-হাসনাবাদ রেলপথে বসিরহাট বা হাড়োয়ায় নেমেও সন্দেশখালি যাওয়া যায়। এ গ্রামের মুখ্য উৎসব চড়ক। মাছ ব্যবসায়ীরা মাকাল ঠাকুর ও দক্ষিণ রায়ের পুজো করেন। সতীমার উপাসনাও হয়। চেকনামারিতে পালিত হয় টুসু উৎসব। এ গ্রামে শীতলা, কালী ও রাধা গোবিন্দর থান আছে।

কলকাতা-নাজাত বাসরুটে নাজাত একটি আদিবাসীপ্রধান গ্রাম। গ্রামের আকৃতি গরুর ল্যাজের মতো বলে ল্যাজহাট বা ন্যাজাট বা নাজাত নাম হয়েছে। এখানে কালী, শীতলা, দুর্গাপুজো, দোল উৎসব হয়।

হাসনাবাদ থেকে কালিন্দী ও রায়মঙ্গল দিয়ে লঞ্চে যাতায়াত করতে হয় হাটগাছা গ্রামে। মুসলিম ও আদিবাসী প্রধান এই গ্রামে পাকা শিবমন্দিরে আছে শিবলিঙ্গ। দুর্গা, কালী, হরি, শিব, শীতলাপুজো হয়। সবচেয়ে বড় উৎসব হয় শিবপুজোয়। দোল উৎসব উপলক্ষে সাহেবখালি ও গৌড়েশ্বর নদীর সঙ্গমে তিন দিনের মেলা বসে। হাসনাবাদ থেকে লঞ্চে যাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী শীতলিয়া গ্রামে। এখানে দুর্গাপুজোয় চারদিনের মেলা বসে। চৈত্র মাসে রক্ষাকালী ও চড়কপুজো হয় সাড়ম্বরে। ক্যানিং থেকে ২২ কিমি অথবা হাসনাবাদ থেকে ২৫ কিমি নৌকাপথে জয়গোপালপুর। এখানে একদিনের চড়কের মেলা, চারদিনের দুর্গাপুজোর মেলা ছাড়াও বাবাঠাকুর, বনবিবি, শীতলা, গঙ্গাদেবী ও কালীপুজোর উৎসবে জনসমাগম হয়।

গ্রন্থসূত্র

(১) মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ—প্রণব রায়
(২) উত্তর ২৪-পরগনার ইতিবৃত্ত—কমল চৌধুরী
(৩) পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ

জলে জঙ্গলে রোমাঞ্চে ভরা সুন্দরবন

ভবতোষ ভট্টাচার্য



সুন্দরবন—জলে কুমির ডাঙায় বাঘ *ছবি রাণা লোধ*

গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র মোহানার দক্ষিণতম প্রান্ত উনবিংশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়ে, হুগলি নদীর মোহানাতে অরণ্যানী সমাকুল বিস্তীর্ণ জলাভূমি—এটা পৃথিবীর সবচাইতে বড় বদ্বীপ। 'সুন্দরীগাছ' বা সমুদ্রবনের অপভ্রংশ—'সুন্দরবন'। নদী-নালা ও নদীর মোহানা জলধারায় সমাচ্ছন্ন। পশ্চিবঙ্গের দক্ষিণ প্রত্যন্তের মানচিত্রটি যেন একটি বড় নারকেল পাতার আলপনা। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলধারা দিয়ে এই ভূখণ্ডটির নদী বা জলপথগুলি পুষ্ট। নোনা জল, মিঠে মাটি, মাথার উপর উন্মুক্ত উদার আকাশ। নাম না জানা অসংখ্য খাঁড়ি ও নদী ছড়িয়ে আছে মাকড়সার জালের মতন। জলাভূমির কোথাও ধরেছে ভাঙন, আবার কোথাও জেগে উঠেছে চরা। জলাকীর্ণ এই গহীন অরণ্যানীর বুক চিরে কোনো রাজপথ যায়নি। জলপথই প্রবেশের একমাত্র পথ। দিনে রাতে এখানে জোয়ার আসে, ভাটা বনমূল ধুয়ে দিয়ে যায়। ফলে জমির বর্ধিত উর্বরাশক্তিতে প্রাণের বীজ পোঁতা হয় নিয়ত, এক অতুলনীয় রূপে সাজে ভূপ্রকৃতি, যার চল্লিশ ভাগ জল তথা অরণ্যের প্রাণশক্তি। বহু খাঁড়ি এই বিশাল ব-দ্বীপের ভূখণ্ডটিকে বহুধা বিভক্ত করেছে। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় নদী-নালা-অরণ্য-জনপদ মিলিয়ে ৪২৬৪ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে সুন্দরবন। এর মধ্যে রয়েছে ৫৬টি দ্বীপ। সুন্দরবনকে সঠিকভাবে দেখভাল করার জন্য দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাতলা নদীর ঠিক মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে একটা কাল্পনিক রেখা টেনে এর পূর্বে ২৫৮৫ বর্গকিমি নিয়ে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ আর পশ্চিমে ১৬৭৯ বর্গকিমি চব্বিশ পরগনা বনাধিকারিকের অধীন।

সুন্দরবন নামটার মধ্যেই আছে রোমাঞ্চ। বৈচিত্র্য সুন্দরবনের প্রতি পরতে। অসংখ্য নদী-নালা-খাঁড়ি দিয়ে ঘেরা এই মহারণ্য যেন এক সত্যি গোলকধাঁধা। বহু রকমের উদ্ভিদ, বৃক্ষের সমারোহ এই অরণ্য। সুন্দরী, গরান, হেতাল, গর্জন, কালচে-সবুজ পাতার ক্যাওড়া, কাঁকড়া, পশুব, ধুধুল, বাইন—আরও বহু রকমের আকাশ আড়াল করা গাছ নিয়ে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু উদ্ভিদের অরণ্য। উদ্ভিদবিজ্ঞান মতে এই বনাঞ্চলের নাম দেওয়া যায় 'নোনা জলের হেরিশিয়েরা'। লোনা জলের উদ্ভিদ আর তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পর্যটকদের কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এই সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে থাকতে এখানের নানা প্রাণীর যে নতুন সব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে তা

পর্যটক তো বটেই, গবেষকদের কাছেও এক পরম বিস্ময়। ভীষ্মের শরশয্যার মতো মাথা উঁচিয়ে থাকা বৃক্ষমূল আর ঘন ডালপাতার এই অরণ্য বিশ্ববিখ্যাত দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সবচেয়ে বড় আস্তানা। সংখ্যায় এরা প্রায় তিনশোর কাছাকাছি। নদী-নালায় মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবী, বনের কাঠ আর ফুলের মধু সংগ্রাহকদের ত্রাস ভয়ঙ্কর হিংস্র এই বাঘের দল পর্যটকদের আকর্ষণের মূল বিষয়। ২৫৮৫ বর্গকিমি ব্যাঘ্র প্রকল্পের কিছুটা ঘন (Core) বাকি বাফার অঞ্চল। চামদায়, ঝাঘনাতে সবচাইতে বেশি বাঘ ঘুরে বেড়ায়। এই সুন্দরবনেই বাঘের উপযুক্ত প্রতিবেশী গভীর জলে লুকানো অসম্ভব ক্ষিপ্র বৃহত্তম অ্যাসচ্যুরিয়াল ক্রোকোডাইল বা কুমির। এর সঙ্গে জলে ভাসছে ছোটো প্রজাতির হাঙর, মস্ত শুশুক আর অসংখ্য কাঁকড়া। পাখিদের দলে আছে সারস, বক-পাখি, মাছধরা ঈগল, সামুদ্রিক ঈগল, এসং সীগাল। সমুদ্রের যত কাছে এগিয়ে যাওয়া যাবে শোনা যাবে শঙ্খচিলের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার। মাছরাঙার কঠিন ঠোঁটে কুঁকড়ে যাওয়া রুপোলি শিকার ঝলসে উঠবে। হুইমব্রেল, কালো পুচ্ছ, গডউইট, ছোট স্টিন্ট, ইস্টার্ন নট এবং কারলিউ স্যান্ডপাইপার, সোনালি প্লোভার, পিনটেল, শ্বেতচক্ষু পোচার্ড, লেমার হুইসলিং টিল— এদের ডানায় সূর্যাস্ত দেখতে পাবেন। সুন্দরবনের নদীতে সাগরে আর যে প্রাণীটির দেখা মেলে তাদের জীবনধারা বড়োই অদ্ভুত। বহু দূরের আটলান্টিক মহাসাগর থেকে হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে অলিভ রিডলে দল বেঁধে আসে ডিম পাড়তে। আবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নদী থেকেও বাটাগুর বাসকা দলে দলে আসে। এরাও ডিম পাড়তে আসে। এই দুই প্রজাতির কচ্ছপ সুন্দরবনের নদীর পাড়ে ডিম পেড়ে নিজের নিজের অঞ্চলে ফিরে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এদের বাচ্চারা কিছুটা বড় হয়ে যে যার নিজের মায়ের দেশে চলে যায় ঠিক যে পথে তাদের মা কচ্ছপের দল এসেছিল সেই পথ দিয়েই। এসব চাক্ষুষ করার সুযোগ এই সুন্দরবনেই।

সুন্দরবনের সব নদীর চরিত্রও আবার সমান নয়। রায়মঙ্গল, মাতলা, বিদ্যাধরী স্বভাবে রাগী। এছাড়া আছে সপ্তমুখী, কালিন্দী, ঠাকরুন, গৌরেশ্বর, হরিণডাঙা, আরও কত নাম না জানা স্রোতস্বিনী। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য খাঁড়ি, যা দ্বীপগুলিকে ঘিরে রেখেছে। মাঝেমধ্যে আবার চোখে পড়বে এঁকেবেঁকে যাওয়া নদী ও খালের পাশে টুকরো-টুকরো জলা।

সুন্দরবনে হরিণ ও বাঁদরের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক সহাবস্থান দেখা যায়। বাঁদরেরা গাছের ওপর থেকে কেওড়া ফল ফেলে দেয় হরিণদের খাবার জন্য, আর হরিণরা তা খায়। বাঘ দেখলেও বাঁদরের দল আগেভাগেই হরিণদের সতর্ক করে দেয়। নৌকায় যেতে যেতে প্রায়ই চোখে পড়বে হরিণের পিঠে বসে থাকা বাঁদর। আর নদীর পাড়ে শীতের রোদ পোহায় লোনা জলের বিশাল বিশাল কুমির। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে গাছের মরা গুঁড়ি। মাছের লোভে হাওয়া ভেসে বেড়াতে দেখা যাবে পানপায়রা আর গাংচিলকে।

সুন্দরবনে গ্রীষ্মের সৌন্দর্যও উপভোগ করার মতো। সারা বনভূমি ফুলে ফুলে যায় ভরে। খলসা, গরান, কেওড়া ও গেওয়ার গাছের মাথা ফুলে ঢেকে রাখে। খলসা ফুল থেকে বড় বড় পাহাড়ি মৌমাছিরা তুলে নেয় মধু। মৌলেরা মুখোশ পরে নেমে পড়ে মধু আনতে।

ষড় ঋতুতে সুন্দরবনের প্রকৃতির রূপও বারেবারে বদলায়। কোথাও চোখে পড়বে 'অবারিত মাঠ গগন ললাট'। কোথাও বা



রোমাঞ্চকর জল বিহার

ছবি: পঃ বঃ পর্যটন উন্নয়ন নিগম

'ছায়া সুবিনিড় শান্তির নীড়'। খোলা মাঠের বিস্তীর্ণ এলাকায় এদিক-ওদিক ইতস্তত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু গাছপালা। সুন্দরবনের প্রকৃতিই আলাদা। নদীগুলির মোহনায় চোখে পড়বে সারা রাত ধরে টিম টিম করা লম্ফের আলোয় জেলেরা মাছ তুলছে। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির আলো এক অপরূপ দৃশ্য রচনা করে। এখানকার প্রকৃতির রাজ্যে শ্যামলিমা যেন আচমকাই গেছে হারিয়ে। যত দূর চোখ যাবে জঙ্গল-আদিগন্ত জঙ্গল। গাছগাছালি ভরা নদী দিয়ে ঘেরা দ্বীপময় সুন্দরবন স্বভাবে বড় গম্ভীর। আবার পূর্ণিমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছের ফাঁক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে। নদীর ঢেউয়ের পরতে পরতে আলোর ঝলকানি। দিগন্ত বিস্তৃত বন আর বনের মধ্যে খাঁড়িগুলি যেন সীমানা ভাগ করে দেয়। খাঁড়ির মধ্য দিয়ে ছোট ডিঙি নৌকায় করে ঢুকে পড়ে জেলে ডিঙি। হঠাৎ হয়তো চোখে পড়বে নদীর ধারে একদল হরিণ জলে মুখ দিয়ে। দুদিকে সারিবদ্ধ হেঁতাল গাছের তল দিয়ে সুন্দর মসৃণ পথ। মনে হবে কেউ যেন ঝাঁট দিয়ে গেছে। বাঘ এই ঘন হেঁতালের মধ্যেই থাকতে পছন্দ করে।

গঙ্গাসাগর মেলা—সুন্দরবনের আরও একটি আকর্ষণ। মকর সংক্রান্তিতে স্নান হয়—কপিল মুনির আশ্রমে গঙ্গা, ভগীরথ, কাপিল মুনিকে পুজো দেওয়া হয়। এখন যাত্রীদের জন্য যুবকেন্দ্র হয়েছে। কত খড়ের চাল-ছাউনি দিয়ে অস্থায়ী ঘর হয় মেলা যাত্রীদের জন্য। সারা ভারতের সাধুরা সব আসে মেলায়। উত্তরপ্রদেশের পাণ্ডারাই এই মন্দিরের কর্তা ও মোহান্ত।

কলকাতা থেকে সুন্দরবনে ঢোকার ৬টি পথ রয়েছে। পূর্বদিকের পথ হল ধামাখালি। পশ্চিমের পাঁচটি পথ হল সোনাখালি (বাসন্তী), রায়দীঘি, জামতলা, নামখানা ও ক্যানিং। ক্যানিং দিয়েই সবচেয়ে বেশি মানুষ ঢোকেন সুন্দরবনে। কলকাতা থেকে ক্যানিং ট্রেনে মাত্র সোয়া একঘণ্টার পথ। গড়িয়া ও ধর্মতলা থেকে সরকারি ও বেসরকারি বাস যাচ্ছে ক্যানিংয়ে। সেখান থেকে সুন্দরবনের নানা জায়গায় যাবার লঞ্চও সহজেই পাওয়া যায়। সুন্দরবনে ঢুকতে হলে একমাত্র নদীপথেই তা সম্ভব।

আস্তে আস্তে রূপরসে ভরা রোমাঞ্চকর এই সুন্দরবনকে পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এগিয়ে আসছে বেসরকারি সংস্থাগুলো। আন্তর্জাতিক পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে সুন্দরবনকে গড়ে তুলতে সাহারা ইন্ডিয়া ৯১৫ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে। ইতিমধ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে। তাতে সুন্দরবনের পর্যটনের নানারকম আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। এমনভাবে সেটা গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে যাতে উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সকলেরই আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে। সব রকম মানুষের চাহিদার হরেককিসিম নিয়ে হাজির হবে সাহারা ইন্ডিয়া। জলাজঙ্গলে রোমাঞ্চ ভরা সুন্দরবনের প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে একাত্মতা আনতে সেখানে থাকার বা রাত্রিবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে জলের উপরে। কলকাতার বাবুঘাট থেকে এই জলযান সরাসরি নিয়ে যাবে সুন্দরবনে। জলযানগুলিতে পাঁচ তারা কিংবা সাততারা সুবিধাসমন্বিত ব্যবস্থা থাকবে। সুন্দরবনের গহীনে পৌঁছে এই জলযানই হবে পর্যটকের রাত্রিবাসের বা থাকার স্থান। সুন্দরবনের শিল্পকলা-সংস্কৃতি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে বিশেষ নজর থাকবে এই প্রকল্পের আওতায়। এর পাশাপাশি থাকবে বিভিন্ন ধরনের জলক্রীড়া। সাগর মেরিন পার্কও থাকবে। পর্যটকরা সুন্দরবনের মূল আকর্ষণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যাতে দেখার সুযোগ পান তার জন্য ধনচেতে তৈরি হবে টাইগার রেসকিউ সেন্টার। পুরো প্রকল্পটি ২০০৫ সালে শেষ হওয়ার কথা। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের অনুমোদন পেলেই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। এখন পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার জমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাবদ ইক্যুইটি অংশগ্রহণ করবে। এর অর্থ আগামীদিনে সুন্দরবনে আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পর্যটকদের কাছে মেলে ধরতে চলেছে হরেক কিসিমের ডালি নিয়ে। এর পাশাপাশি বন্যপ্রাণী দেখবার জন্য সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি জায়গায় নজরমিনার রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলদি, নেতাধোপানি, সুধন্যখালি, গাববেড়িয়া, সজনেখালি, বুড়িডাবর প্রভৃতি। পাখি দেখবার ভাল জায়গা সজনেখালি, ধনচে, চিমাগুড়ি, লোথিয়ান প্রভৃতি। ভগবতপুরে রয়েছে কুমির প্রকল্প।

সুন্দরবনকে পর্যটনের জন্য অনেক আকর্ষণীয় করা যায়—এই লোমকর্ষক ভীতিপ্রদ আবহাওয়ার স্বাদ পর্যটকমাত্র পাবেন যদি প্রার্থিত দর্শনের ব্যবস্থা থাকে।



সুন্দরবনের নেতিধোপানিতে মিষ্টি জলের পুকুর। এই পুকুরে জল খেতে আসে বাঘেরা।

ছবি হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল

পর্যটনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাগর চট্টোপাধ্যায়



বাওয়ালির মন্দির চত্বর

ছবি সাগর চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উত্তর ছাড়া বাকি তিনদিকের সীমানায় জল। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলি, পুবে রায়মঙ্গল। হুগলি পেরোলে হাওড়া, মেদিনীপুর, রায়মঙ্গলের পর বাংলাদেশ। উত্তর, উত্তর-পূর্বে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা। ১৯৮৬-র ১ মার্চ প্রশাসনিক সুবিধার্থে অখণ্ড ২৪ পরগনা ভেঙে হল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পৃথিবীর বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের নিম্নাংশ নিয়ে এই জেলা যার ভূভাগ সমতল, পলিময়, উত্তর থেকে দক্ষিণ ক্রমশ নিচু। ভূখণ্ডের শেষ বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গোপসাগরের লাগোয়া ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অসংখ্য নদী, খাঁড়ি, গাঙ সুন্দরবনের ১০২টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের পাশ কেটে বঙ্গোপসাগরে উপনীত। এর মধ্যে ৪৮টি দ্বীপে মানুষের কোনও বসতি নেই। অল্প উঁচু ম্যানগ্রোভ বা বাদাবনে বাস করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ হরিণ, বাঁদর, শুয়োর, সাপ ও অন্যান্য জীবকুল। জলে কুমির, কামট, শুশুক সহ নানা প্রজাতির মাছ, সাপ, কচ্ছপ। সুন্দরবনই পৃথিবীর একমাত্র বাদাবন যেখানে বাঘ বাস করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই ভূ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে কিছু কিছু পর্যটন কেন্দ্র। পশ্চিমবাংলার পর্যটন মানচিত্রে স্থানগুলির অন্তর্ভুক্তিও ঘটেছে। ভাবনা-চিন্তাও চলছে অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা আরও বাড়ানোর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এমন একটি জেলা যেখানে পর্যটন ও তার সম্ভাবনার যথেষ্ট ইতিবাচক দিক রয়েছে। কথাটা অমূলক বা অতিশয়োক্তি নয়। প্রথমত এই জেলার পর্যটনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সুন্দরবন। নিছক বন বা অরণ্যভূমি নয়, একদিকে ভয়াল ভয়ংকর হিংস্রতার হাতছানি, অন্যদিকে প্রকৃতিসৃষ্ট অপার সৌন্দর্যের আহ্বান। বিচিত্র উদ্ভিদ, প্রাণিজগৎ, সেই সঙ্গে নদী-খাঁড়ি-দ্বীপ নিয়ে এক আশ্চর্য অঞ্চল সুন্দরবন যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার নিয়ত সংগ্রাম, বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ সারা পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সুন্দরবনে এক বিদেশি পর্যটকের মুখে শুনেছিলাম সুন্দরবন সম্পর্কে এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ উক্তিটি—Sunderbans is an international forest. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এত অনাবিল সৌন্দর্যের দ্বীপময় অরণ্য বিরল। দ্বিতীয়ত জেলার ঐতিহ্যের দিকটি যার শুরু অন্তত ২২ শো বছর আগে, শুঙ্গ যুগ থেকে। এই জেলায় আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদ নিশ্চিতভাবে এক সুপ্রাচীন ইতিহাসের কথা বলে। ইতিহাস আর ভূগোলের সার্থক সমন্বয় এই জেলায় লক্ষ করা যায়। তাছাড়া সমুদ্র, নদী ও শ্বাপদসংকুল অরণ্য একসঙ্গে এই তিনটির

পর্যটনস্থান পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও জেলায় নেই।

পর্যটন শুধু পরিভ্রমণ বা নিসর্গ দর্শন **নয়, পর্যটন** একটি অঞ্চল বা জেলা কিংবা **দেশের** জীবন পরিক্রমা, তার ঐতিহ্যের **খোঁজে।** সেই খোঁজ থেকে নতুন কিছু দেখা, শেখা, জানা। পর্যটন মানে মানসিক একাত্মতা—ঐতিহ্যের সঙ্গে মননের, ভূ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দৃষ্টির, অনুভবের। শহর কলকাতার লাগোয়া জেলা বলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। প্রথমত যোগাযোগ ব্যবস্থা যা পর্যটনের মূল সূত্র। দ্বিতীয়ত **দূরত্ব। কলকাতা থেকে এই জেলার ভূখণ্ডের শেষ সীমা কোনওমতেই দেড়শো কিলোমিটার পেরোবে না। সড়ক ও রেলপথ ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরতে গেলে অবশ্য ভুটভুটি বা লঞ্চ ছাড়া গতি নেই।** পর্যটন কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে আলাদা আলোচনার আগে আমরা দেখে নিই এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার খুঁটিনাটি দিক।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ট্রেন সরাসরি যাচ্ছে প্রান্তিক স্টেশন হিসেবে বজবজ, ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর ও কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপে যেতে সময় লাগবে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। কাকদ্বীপে পৌঁছে ভুটভুটি বা লঞ্চে সরাসরি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দ্বীপগুলোতে যাওয়া যায়। ধর্মতলা থেকে সরকারি ও বেসরকারি বাসও যাচ্ছে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে ঠাকুরপুকুর, আমতলা, ডায়মন্ডহারবার, কুলপি হয়ে সরাসরি কাকদ্বীপ, নামখানা। ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে নেমেও বাসে কাকদ্বীপ, নামখানা যাওয়া **যায়।** লক্ষ্মীকান্তপুর হয়ে কাকদ্বীপ-পর্যন্ত **ট্রেনও** যাচ্ছে। কাকদ্বীপ থেকে নামখানা পর্যন্ত ট্রেনলাইন পাতার কাজও চলছে। নামখানা থেকেই সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে যাওয়ার সুবিধে। কাকদ্বীপ-নামখানা সুন্দরবনের অন্যতম দুটি প্রবেশপথ। তবে সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঘুরতে গেলে বন দপ্তরের অনুমোদন লাগে। নামখানা থেকে সড়কপথে আরও যাওয়া যায় জেলার ভূখণ্ডের শেষ বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দ্বীপ বকখালি ও ফ্রেসারগঞ্জ। দুটিই এ জেলার মূল্যবান পর্যটন কেন্দ্র। ধর্মতলা থেকে সরাসরি সরকারি বাস ফ্রেসারগঞ্জ ছুঁয়ে বকখালি যাচ্ছে। সরাসরি বাস না পেলে নামখানা পৌঁছে ফেরি টপকে ওপারে স্থানীয় বাস বা ট্রেকারে বকখালি যাওয়া যায়। কাকদ্বীপের কিছুটা আগে নতুন রাস্তার মোড়। এখান থেকে পশ্চিমে সাইকেল ভ্যান বা স্থানীয় বাসে চার কিলোমিটার দূরে হারউড পয়েন্টে গিয়ে মড়িগঙ্গা পেরিয়ে পুনরায় বাস বা ট্রেকারে গঙ্গাসাগর যাওয়া যায়। ধর্মতলা থেকে হারউড পয়েন্ট পর্যন্ত ভূতল পরিবহণ নিগমের বাসও আছে। ভাড়া ২৯.৫০ টাকা। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এই হারউড পয়েন্ট দিয়েই প্রতি বছর গঙ্গাসাগর যান। কাকদ্বীপ দিয়েও গঙ্গাসাগর যাওয়া যায়।

ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে ট্রাম কোম্পানি বা বেসরকারি বাস যাচ্ছে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের পাশ দিয়ে ডান দিকে বেঁকে রায়চক ও নূরপুর। দুটিই আলাদা জায়গায়। বাসও আলাদা। নূরপুরের কিছুটা আগে একটি রাস্তা বাঁ দিকে বেঁকে রায়চক গেছে। হুগলি নদীর তীরে দুটিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় মনোরম স্থান।

ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে আমতলা ফেলে দস্তপুর থেকে ডানদিকে ফলতা রোড ধরে ফলতা। বেসরকারি ও ট্রাম কোম্পানির বাস সরাসরি ফলতা যাচ্ছে। হুগলি নদীর তীরে ফলতায় আছে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

ধর্মতলা থেকে বেসরকারি বাসে বজবজ ও বজবজ ফেলে অছিপুর। একদিনের বেড়ানোর জায়গা হিসাবে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। বজবজ থেকে আবার যাওয়া যায় বাওয়ালি। বাওয়ালিতে আছে প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ। ইতিহাসপ্রিয় সকলের ভাল লাগবে এখানে আসতে।

ধর্মতলা বা গড়িয়া থেকে বেসরকারি বাস কিংবা ট্রেনে ক্যানিং। ক্যানিংকে সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ বলা হয়। প্রতি বছর লঞ্চে সুন্দরবন বেড়াতে আসা ভ্রমণার্থীরা ক্যানিং থেকেই লঞ্চে ওঠেন। ক্যানিংয়ে প্রচুর ট্যুরিস্ট সেন্টার গড়ে উঠেছে।

ধর্মতলা থেকে ভূতল পরিবহণ নিগমের বাসে সরাসরি ডায়মন্ডহারবার, কুলপি, লক্ষ্মীকান্তপুর হয়ে রামগঙ্গা। রামগঙ্গার ওপারেই পাথরপ্রতিমা, মধ্যে বড়তলা নদী। এটিও সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশপথ।

লক্ষ্মীকান্তপুর বা কাকদ্বীপগামী ট্রেনে মথুরাপুর স্টেশনে নেমে ট্রেকার, বাস কিংবা গড়িয়া থেকে সরকারি বা বেসরকারি বাসে বারুইপুর হয়ে রায়দিঘি। ডায়মন্ডহারবার হয়েও রায়দিঘি যাওয়া যায়। এটিও সুন্দরবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ। তাছাড়া এটি এই জেলার একটি বৃহৎ মৎস্য বিপণন কেন্দ্রও। কাকদ্বীপের মতোই এখান থেকে প্রচুর সামুদ্রিক ট্রলার ও মাছ ধরা নৌকো বঙ্গোপসাগর সহ সুন্দরবনের আরও গভীরে নদী-খাঁড়ি অঞ্চলে যায়।

এই জেলার পর্যটনে মুখ্য ভূমিকা নদী, খাঁড়ি ও জঙ্গলের। ইতিহাস ও প্রত্ন নিদর্শনের ভূমিকাও কম নয়। জেলার মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে একদিকে কলকাতা পেরিয়ে হুগলি নদীর কোল ঘেঁষে যেমন তৈরি হয়েছে বজবজ, অছিপুর, ফলতা, নূরপুর, রায়চক, ডায়মন্ডহারবারের মতো বেড়ানোর জায়গা, তেমনি অবশিষ্ট পর্যটন স্থলগুলো মূলত গড়ে উঠেছে বকখালি, ফ্রেসারগঞ্জ, সাগরের মতো বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দ্বীপ ও নদী-খাঁড়ি বেষ্টিত দ্বীপময় সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে। সুন্দরবন কখনও শ্বাপদসংকুল অরণ্যভূমি, কখনও জঙ্গল হাসিল করে গড়ে তোলা গ্রামময় ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডে কোথাও স্বাভাবিক নিসর্গের সঙ্গে কৃত্রিম বনসৃজন ঘটিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ভ্রমণপিপাসু মানুষদের জন্য অবকাশ, পর্যটন আবাস। তবুও অনেক কাজ বাকি। চালু পর্যটন কেন্দ্রগুলির সার্বিক উন্নয়ন ছাড়াও নতুন ও সম্ভাবনাময় পর্যটনের খোঁজ, সেই সঙ্গে পর্যটকদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার দিকগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত বিষয়গুলো রূপায়িত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এতে কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনি সরকারের আয় বাড়ার সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে। একা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সবকিছু করে ওঠা সম্ভব নয়। প্রয়োজনে বেসরকারি বিনিয়োগ বা বেসরকারি সংস্থার সাহায্যও দরকার হবে। সম্প্রতি সাহারা ইন্ডিয়া সুন্দরবনকে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে ৯১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছে। উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সকলের জন্য পর্যটনের সমস্ত

রকম সুযোগ-সুবিধা থাকবে এই প্রকল্পে। ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে মহাকরণে সাহারা ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত রায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে এই প্রকল্প সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেন। সেই সঙ্গে সুন্দরবনকে কীভাবে আর্কষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার একটি ভিডিও ক্লিপিংও দেখান। এই প্রকল্পে থাকছে সুন্দরবনে পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্য উন্নত ও আধুনিক মানের পাঁচ কিংবা সাত তারা সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত ভাসমান হোটেল বা ফ্লোটেল নির্মাণ, যেখানে থাকবে জলক্রীড়া সহ বিনোদন, চিকিৎসা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই ফ্লোটেলের জন্য কলকাতায় তৈরি হবে বিশেষ জেটি। সাগরদ্বীপের পাশে এবং ফ্রেজারগঞ্জ গড়ে তোলা হবে আন্তর্জাতিক মানের বেলাভূমি। ধনচি দ্বীপে একটি টাইগার রেসকিউ সেন্টার তৈরি ছাড়াও সুন্দরবনের মানুষদের সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে সুব্রতবাবু আশা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীও এই প্রকল্পের বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মণ, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এর আগে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদও সুন্দরবন অঞ্চলকে একটি পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক গুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর কয়েকটি পূর্ব গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত, পর্যটন শিল্পের ব্যাপারে সচেতনতার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা। এ বছর সুন্দরবন থেকে ২৫ জন ছেলেমেয়েকে এই পাঠক্রমের জন্য বেছে নেওয়া হবে। মাথাপিছু খরচ পড়বে ৮ হাজার টাকা। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হবে ৩ হাজার টাকা। সুন্দরবনে বিদ্যুতায়নের জন্যও এ পর্যন্ত ৬৮টি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প বসানো ছাড়াও এলাকা অনুযায়ী সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এছাড়াও


গঙ্গাসাগরে বৈবতরণী পারের দৃশ্য

ছবি কালিকানন্দ মণ্ডল

পিয়ালি, পাঁচোয়াখালি, বসন্তসোনালি ব্রিজগুলো ১ বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা ছাড়াও রায়পুর, গঙ্গাধরপুর, দুর্বাচটিতে সেতু তৈরির ব্যাপারে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদ পরিকল্পনা নিয়েছে।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে সুন্দরবনের পরিকাঠামোগত উন্নতির সঙ্গে জড়িত এই জেলার পর্যটন। সুন্দরবনের সার্বিক পর্যটন যে বিগত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১) ভাল অবস্থায় ছিল না তার ইঙ্গিত ২৫০০০ সাধারণ পর্যটক ও মাত্র সাড়ে চারশো বিদেশি ভ্রমণার্থীর উপস্থিতি। সরকারি আয় এক বছরে মাত্র ২,৫৪,১১৪ টাকা। রাজ্য পর্যটন দপ্তর সূত্রে এই পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। বিদেশি পর্যটকরা যে সুন্দরবন সম্পর্কে খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছেন না তার একটি বড় কারণ সম্ভবত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ক্যানিং থেকে সরাসরি লঞ্চে সুন্দরবন পরিভ্রমণ ছাড়া আলাদা করে গোসাবা, পাখিরালয়, সজনেখালি পৌঁছে সুন্দরবন ঘোরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কলকাতা-ভাঙড়-সোনাখালি ৯০ কিমি রাস্তা গাড়িতে যেতে সময় লাগছে ন্যূনতম সাড়ে তিন ঘন্টা, এর মধ্যে অন্তত ৩০ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। গাড়ি শম্বুক গতিতে চলে। পাশাপাশি হোগল নদীর ওপর সোনাখালি-বাসন্তী গুরুত্বপূর্ণ ওভারব্রিজ কয়েক বছর আগে শিলান্যাস হলেও আজও সম্পূর্ণ হল না। ব্রিজটা হলে গোসাবার মুখ পর্যন্ত সটান চলে যাওয়া যেত, সময়ও বাঁচত। অন্যদিকে ক্যানিংয়ে মাতলা মজে গিয়ে এমন অবস্থা যে ভাঁটার সময়ে হেঁটে, কোথাও কোমর জলে নদী পেরোতে হয়। ভুটভুটি চলে না, অবর্ণনীয় কষ্ট। অথচ সুন্দরবন যেতে ক্যানিংই সবচেয়ে সুবিধেজনক ও কম সময়ের পথ। জনসাধারণের বহুদিনের দাবি সত্ত্বেও মাতলার ওপর ক্যানিং-ডকঘাট ওভারব্রিজ আজও হল না। অথচ কয়েক হাজার মানুষ রোজ এই পথে যাওয়া-আসা করেন।

সুন্দরবনের বহুবিধ সমস্যা আছেই। প্রচেষ্টাও চলেছে তার সমাধানের। তবু বিশেষ করে সুন্দরবনের পর্যটনকে জনমুখী ও অর্থকরী করে তুলতে দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার দ্রুত সফল রূপায়ণ। এই জেলার পর্যটনের আর্থিক বনিয়াদ অনেকটাই জোরদার হতে পারে শুধু সুন্দরবনকে আরও পর্যটনমুখী করে তোলার প্রয়াসের ওপর।

সুন্দরবন

পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাদাবন। গেঁয়ো, গরান, বাইন, হেতাল, গর্জন, সুন্দরী, পশুর, কেওড়া, খলসী, কাঁকড়া, ধুধুল, গোলপাতা, ধানী ও বরুনা ঘাস ইত্যাদি গাছ-গাছালিতে সমৃদ্ধ এক অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপময় অঞ্চল। আঁকাবাঁকা নদী, ছোট ছোট ব-দ্বীপ, অল্প উঁচু বাদাবন আর নোনা জলে জোয়ার-ভাঁটার নিরন্তর খেলা—এই সবকিছু নিয়েই এক অসাধারণ চিত্রকল্প যার নাম সুন্দরবন। কিছু বড় নদী এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোট নদী, খাঁড়ি ও দ্বীপ নিয়ে এক আকর্ষণীয় নদীশৃঙ্খল সুন্দরবনে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা জাতীয় উদ্যান

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান
১৩৩০.১০ বর্গ কিলোমিটার

সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার

বাফার অঞ্চল (Buffer zone)
৮৯২.৬০ বর্গকিলোমিটার

সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা (মোট)
২৫৮৫.১০ বর্গ কিলোমিটার

(ক) সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

আয়তন-৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার। বাঘ, চিতল হরিণ, বাঁদর, বুনোশুয়োর, গোসাপ, উদ্‌বিড়াল, সাপ নিয়েই এই অভয়ারণ্য। এছাড়াও আছে বিভিন্ন ধরনের কয়েক হাজার পাখি—হাঁস, পানকৌড়ি, টিট্টিভ, ঈগল, শঙ্খচিল, শামুকখোল। জঙ্গলে পা দেওয়া নিষেধ।

কোথায় থাকবেন

সজনেখালি পর্যটন আবাস : গভীর জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড ঘেরা অঞ্চল যেখানে অপরিসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎই শোনা যেতে পারে বাঘের হুঙ্কার, হরিণের পালিয়ে যাবার খসখস শব্দ, বাঁদরের ছটফটানি কিংবা পরিযায়ী পাখিদের দ্রুত উড়ে যাওয়া। সজনেখালি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কার্যালয়ের অদূরে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের কাঠের সুদৃশ্য আবাস, ওয়াচ্ টাওয়ার, একটি পুকুরে কুমির, অন্যটিতে কচ্ছপ। পর্যটন আবাস থেকেই দেখা যাবে জলাশয়ে বিকেলে ছোলা খেতে আসা অসংখ্য চিতল হরিণের আনাগোনা। বাঁদর-হরিণের খুনসুটি। সজনেখালি ছাড়াও ওয়াচ টাওয়ার আছে সুধন্যখালি, হলদি এবং নেতিধোপানিতে। নেতিধোপানির ওয়াচ টাওয়ার থেকে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়।

যেতে হলে ধর্মতলা বা বাবুঘাট থেকে বাসে সোনাখালি। কিংবা ট্রেনে ক্যানিং পৌঁছে মাতলা পেরিয়ে ডকঘাট থেকে আবার অটোয় সোনাখালি। সোনাখালি থেকে ভুটভুটিতে গোসাবা। গোসাবা থেকে সাইকেল ভ্যানে পাখিরালয় টাইগার মোড়। আর ফেরি টপকে সজনেখালি ট্যুরিস্ট অফিস। এখানে থেকেও অনুমতি নিয়ে বেসরকারি লঞ্চে বা ভুটভুটিতে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে বেড়ানো যায়।

লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আয়তন ৩৮ বর্গ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় লোথিয়ান দ্বীপ। চিতল হরিণ, বন্য বরাহ, বাঁদর, বন বিড়াল এবং গাছের মধ্যে বাইন, কেওড়া, গরান। শীতের পরিযায়ী পাখিরা দ্বীপটিতে আসে। বিশেষ করে সাদা পেট সামুদ্রিক ঈগল ও কালো মাথা মাছ রাঙা এখানে দেখা যায়। দ্বীপের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সামুদ্রিক কুমির।

যোগাযোগ বিভাগীয় বন আধিকারিক, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), ৩৫ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭ অথবা বন বিভাগ, মহাকরণ।

হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আয়তন ৫.৯৬ বর্গ কিলোমিটার। চিতল হরিণ, বন্য বরাহ, মর্কট ইত্যাদি বন্যপ্রাণী এখানে আছে, মাঝে মাঝে বার্কিং হরিণ ও বাঘের দেখাও মেলে।

পথ নির্দেশ রায়দিঘি থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব ৫০ কিমি। বোট ভাড়া করে যাওয়া যায়।

যোগাযোগ বনবিভাগ, মহাকরণ।

ভগবতপুর এখানে রয়েছে কুমির প্রকল্প। এখানে মোহনার সব থেকে বড় কুমিরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের খাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পিয়ালি সুন্দরবনে প্রবেশের অন্যতম পথ। শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেনে গোচরণ স্টেশনে নেমে অটো রিকশ বা মিনিবাসে ঢোসার হাট। এখান থেকে ভুটভুটিতে পিয়ালি ব-দ্বীপ, জলপথে এখান থেকে সজনেখালি-সুধন্যখালি নেতিধোপানি খুব কাছে। ছোটনদী পিয়ালির পাশে গড়ে ওঠা এই সুন্দর ব-দ্বীপ বেড়ানোর দারুণ জায়গা। এখানে একশো একর জমির ওপর রাজ্য পর্যটন দপ্তর সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি পর্যটন আবাস তৈরি করেছেন।

কৈখালি জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনে নেমে বাস বা ট্রেকারে জামতলা। এরপর মোটর বোট বা ভুটভুটিতে কৈখালি। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাড়াও এই সুন্দর দ্বীপ চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা।

ডাবু মাতলা নদীর ধারে ক্যানিং থানার এই গ্রামটি বর্তমানে সুপরিচিত চড়ুইভাতির জায়গা হলেও একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল হিসেবে পরিচিত। মূল প্রত্নস্থলটি এখন মাতলার গর্ভে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির একটি কাছারিবাড়ি এখানে ছিল, বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। জায়গাটির নৈসর্গিক দৃশ্য আকর্ষণীয়। গড়িয়া বারুইপুর-ক্যানিং বাস রাস্তায় ক্যানিংয়ের আগে ডাবুর মোড়। এখান থেকে সাইকেল-ভ্যানে গ্রামটিতে যাওয়া যায়। তবে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়।

বকখালি কলকাতা থেকে ১৩২ কিলোমিটার, ধর্মতলা থেকে সরাসরি সরকারি বাস কিংবা বাসে নামখানা পর্যন্ত গিয়ে ফেরি টপকে আবার ট্রেকার বা স্থানীয় বাসে যাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের কূলে একখণ্ড দ্বীপ। রাজ্যের দ্বিতীয় জনপ্রিয় সৈকতাবাস। ঝাউবনের ফাঁকে সমুদ্র, উড়ন্ত পাখি, লাল কাঁকড়া আর অসম্ভব নির্জনতা। প্রচুর হোটেল, কুটীর আছে, আছে রাজ্য শ্রম দপ্তর ও পর্যটন দপ্তরের অতিথি আবাস। বর্তমানে ঘরের সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নতির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বকখালির কাছেই ফ্রেসারগঞ্জ।

ফ্রেসারগঞ্জ বকখালির কয়েক কিলোমিটার আগে বঙ্গোপসাগরের কূলে আর একটি দ্বীপ, বিস্তীর্ণ সাদা বেলাভূমি, সীমাহীন সমুদ্র ও জলের ওপর অস্তায়মান সূর্যের সঙ্গে মেঘের রঙের খেলা এখানে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে আবৃত দ্বীপটি প্রথম হাসিল হয় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেসারের (১৯০৩-১৯০৮)

আমলে। তাঁর নামেই দ্বীপ। ফ্রেসারগঞ্জ থেকে ভুটভুটিতে মনুষ্য বসবাসহীন জম্বুদ্বীপে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। জম্বু-দ্বীপের একদিকে গভীর জঙ্গল, অন্যদিকে জেলেদের ব্যস্ততা। মাছ শুকোনোর গন্ধ অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।

গঙ্গাসাগর বঙ্গোপসাগর মোহনায় জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের শেষ ভূখণ্ড সুপরিচিত ও সুবিস্তৃত সাগর ব-দ্বীপ। চার-পাঁচ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাবেশ প্রতি বছর পৌষ বা মকর সংক্রান্তিতে, কপিলমুনির মেলা উপলক্ষে। প্রবাদ মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গা এবং সাগরের মোহনায় পুণ্যস্নানে পাপ স্খলন হয়। পুণ্যস্নান উপলক্ষে মেলা বসে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে (জানুয়ারির ১৩-১৪ তারিখ নাগাদ)। চলে তিন দিন। মেলা উপলক্ষে অসংখ্য বাস পুণ্যার্থীদের নিয়ে হারউড পয়েন্টের দিকে ছুটে যায়। রাজ্যের বৃহত্তম ও এই অঞ্চলের প্রাচীনতম মেলা এটি। মেলা ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও পর্যটকদের ভিড় থাকে এখানে। সমুদ্রকে দেখা ছাড়াও স্নান ও নিসর্গকে উপভোগ করার যথেষ্ট অবকাশ এখানে রয়েছে। রাজ্য যুব-আবাস, ভারত সেবাশ্রম সংঘে থাকা ছাড়াও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ধর্মতলা-হারউড পয়েন্টে সরাসরি বাস ছাড়াও কাকদ্বীপ, নামখানা বা গঙ্গাধরপুর বাসে কাকদ্বীপের আগে নতুন রাস্তার মোড়ে নেমে সাইকেল-ভ্যান বা স্থানীয় বাসেও হারউড পয়েন্টে পৌঁছানো যায়। এখান থেকে মড়িগঙ্গা পেরিয়ে আবার বাস বা ট্রেকারে সাগর। কপিলমুনির বর্তমান মন্দিরটি আধুনিক হলেও ইতিহাস অনেক প্রাচীন, হারউড পয়েন্টের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাজ্য পর্যটন দপ্তর এখানে জমি কিনে রেখেছে। একটা অতিথি আবাস তৈরির পরিকল্পনা আছে হারউড পয়েন্টে।

ডায়মন্ডহারবার কলকাতা থেকে সড়ক পথে ৪৮ কিমি। হুগলি নদীর কোলে দ্বিশতাধিক বছর আগেও ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। বর্তমানে ছোট শহর। হুগলি নদী এখানে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে। ওপারে মেদিনীপুর, ফেরি টপকে হলদিয়া যাওয়া যায়। 'কেল্লা' অঞ্চলে বৃটিশদের তৈরি দুর্গের (চিংড়িখালি ফোর্ট) ধ্বংসাবশেষ হুগলি নদীর পাড়ে। পাশেই বনভোজন স্থল। ধর্মতলা থেকে বাসে সরাসরি কেল্লার মোড়ে নেমে কিংবা ডায়মন্ডহারবার স্টেশন থেকে সাইকেল-রিকশায় ১ কিমি দূরে কেল্লায় যাওয়া যায়। রাজ্য পর্যটন দপ্তর ভ্রমণার্থীদের সুবিধের জন্য এখানে পানীয় জল এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছাড়াও নদীর পাড়কে আরও সুসজ্জিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রচুর বেসরকারি হোটেলের পাশাপাশি জেলা পরিষদের বাংলো, রাজ্য পর্যটন বিভাগের অতিথি আবাস 'সাগরিকা'য় থাকা যেতে পারে। সাগরিকাকে আরও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। বাড়ানো হচ্ছে ঘর, পর্যটকদের জন্য পরিষেবার আরও উন্নতি ঘটানো হচ্ছে। লজে বসেই নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। নদীর ধারে নুনগোলা অঞ্চলে গির্জার পাশে ২০০ বছরের পুরনো কয়েকটি ইউরোপীয় সমাধি বাড়তি আকর্ষণ। ১৭৯৫-এর একটি স্মৃতিফলকে এই কথাগুলি লেখা আছে—To the memory of Thompson who departed from the life 20th October, 1795, aged 30 years. This year's port master of this Harbour. Monument is erected by his...Mrs MARY THOMPSON.

১৮৫১-য় ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফ স্টেশন তৈরি হয় ডায়মন্ডহারবারে। ১৮৬৪-র অক্টোবরে ডায়মন্ডহারবারে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি নূরপুরের রাস্তায় উত্তর কামারপোল (কামারপোল স্টপ) নৈনানের রাস্তায় খোরদ (কালীতলা মোড়), পাটদহ ও তার আগে সরিষায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন আটচালা মন্দির দেখা যেতে পারে। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁদের আগ্রহ বেশি তাঁরা অবশ্যই যাবেন রামরামপুর (কপাটের হাটমোড়) ও এখান থেকে আবদালপুর (দেউলপোতা)। দেউলপোতায় আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্র থেকে শুরু করে বহু উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু। আবদালপুরে রবীন হালদারের ব্যক্তিগত প্রত্ন সংগ্রহশালাটি দেখলে আশ্চর্য হতে হবে। ডায়মন্ডহারবার থেকে গ্রামগুলোর দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের মধ্যে। গাড়ি না থাকলে বাস ও সাইকেল ভ্যানে যাওয়া যায়। হাতে সময় থাকলে ডায়মন্ডহারবার-রায়দিঘি বা ডায়মন্ড-হারবার-লক্ষ্মীকান্তপুর বাসে মন্দিরবাজারে নেমে কেশবেশ্বরের প্রাচীন টেরাকোটা মন্দির (১৭৪৮ খ্রিঃ) ও হাউড়ির হাটের জোড়া শিবমন্দির দেখলে ভালোই লাগবে। স্টেশন ডায়মন্ডহারবারের আগের স্টেশন গুরুদাসনগরে নেমে বোলসিদ্ধি ও বড়িয়ায় আরও কয়েকটি মন্দির দেখে আসা যায়।



হারউড পয়েন্ট
ছবি - কালিকানন্দ মন্ডল

অছিপুর বজবজ রেল স্টেশন থেকে অটো-রিকশা কিংবা ধর্মতলা থেকে ৭৭নং বাসে অছিপুর। বড় বটতলায় নেমে দক্ষিণে প্রায় ১ কিমি দূরে চীনাম্যানতলায় অছিপুরের সুপরিচিত 'চাইনিজ টেম্পল'। কলকাতায় চীনা কলোনি গড়ে ওঠার আগে এখানেই প্রথম চীনা উপনিবেশ টং অছু গড়ে ওঠে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে। ১৭৮০ নাগাদ চীনা বণিক টং অছু অছিপুরে চিনিকল স্থাপন করে দেশ থেকে নিয়ে আসেন একদল চীনা বণিককে। অছুর নামেই অছিপুর। মন্দিরে খোদাখুদির বিগ্রহ অন্য মতে চীনা দেবদেবী প্যাকম-প্যাকিমের মূর্তি দুটি অভিনিবেশযোগ্য। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে অর্থাৎ চীনা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন থেকে ১৫ দিনের জন্য এখানে বসে চীনা উৎসব ও মেলা। মন্দিরের অদূরে হুগলি নদী। পাশে টং অছুর অশ্বখুরাকৃতি সমাধি। ফেরার পথে বজবজ চার মাথার মোড়ে গির্জা ছাড়াও বজবজ রেলস্টেশনের কাছে হালদার পাড়ায় নবরত্ন শিবমন্দির, হুগলি নদীর কোলে চিত্রগন্ধ ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি, কালো পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'খুকী কালীর' বিগ্রহ, ঐতিহাসিক 'কামাগাটামারু' শহিদস্তম্ভ দেখা যেতে পারে। ১৮৯৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি শিকাগো ধর্মসভায় ঐতিহাসিক ভাষণের পর বিবেকানন্দ বজবজ হয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন। ১৯৩৯-এর ১০ নভেম্বর বাটানগর কারখানা দেখতে বজবজে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এসেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১৬-১৭ নাগাদ। বজবজকে পর্যটকদের কাছে আরও অকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় থাকছে হুগলি নদীর পাড়কে সুসজ্জিত করে পর্যটন উপযোগী করে তোলা। বজবজ পৌরসভার এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে সম্প্রতি পৌরসভার কাছে পরিকল্পনা চেয়েছে পর্যটন দপ্তর। হাতে আর একটু সময় থাকলে বজবজ থেকে ধর্মতলা সড়কপথে শ্যামপুর মোড় হয়ে পাইকপাড়া গ্রামে ঘুরে আসা যায়। পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও অলংকরণযুক্ত কয়েকটি মন্দির পুরাকীর্তি গ্রামটিতে রয়েছে। গবেষকদের কাজে লাগবে।



গোসাবার বেকন বাংলো

ছবি - লেখক

নূরপুর : ধর্মতলা-নূরপুর সরাসরি ট্রাম কোম্পানির বাস যাচ্ছে। ডায়মন্ডহারবার বা রায়চকগামী বাসে সরিষা আশ্রম মোড়ে নেমে পুনরায় ৭৪নং স্থানীয় বেসরকারি বাসেও নূরপুর যাওয়া যায়। হুগলি নদীর তীরে চড়ুইভাতির সঙ্গে প্রকৃতিকে উপভোগ করার যথেষ্ট অবকাশ এখানে। হুগলি, রূপনারায়ণের বিস্তৃত জলরাশির আবছায়ায় একসঙ্গে হাওড়া, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভূখণ্ডের শেষ নূরপুরে এসে উপভোগ করা যায়। যত সকালে পৌঁছানো যায় তত ভালো। ফেরি টপকে ওপারে হাওড়ার পর্যটন স্থল গাদিয়াড়াকেও একই সঙ্গে ছুঁয়ে চলে আসা যায়। গাদিয়াড়া যাবার এটিই সহজতম পথ। নূরপুরে হুগলির সঙ্গে মিশেছে রূপনারায়ণ। হুগলি এখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে রায়চক, ডায়মন্ডহারবারের দিকে এগিয়েছে। বৃটিশ আমলে একটি টেলিগ্রাফ অফিস এখানে ছিল, বর্তমানে নিশ্চিহ্ন টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী জনৈক সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর আগাছা পরিবৃত নাতিউচ্চ দুটি স্মৃতিফলক মনকে ভারাক্রান্ত করবে। তাঁরা দুজনেই জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। ফেরার পথে একটু আগে বেরিয়ে একই রাস্তায় উত্তর কামারপোল ও সরিষার প্রায় ২০০ বছরের পুরনো কয়েকটি জরাজীর্ণ মন্দির দেখতে পারেন।

রায়চক ট্রাম কোম্পানি ও বেসরকারি লাক্সারি বাসে ধর্মতলা থেকে সরাসরি রায়চক। হুগলি নদীর পাড়ে গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটি মনোরম স্থান যা চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা। জেটিতে উঠে নদীকে উপভোগ করা বাড়তি আকর্ষণ। ওপারে মেদিনীপুর। বেসরকারি লঞ্চও আছে। ফেরার পথে উত্তর কামারপোল ও সরিষার প্রায় ২০০ বছরের পুরনো কয়েকটি মন্দির দেখা যেতে পারে।

গোসাবা ধর্মতলা থেকে সরকারি ও বাবুঘাট থেকে বেসরকারি বাস প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টায় যাচ্ছে সোনাখালি বা বাসন্তী। ক্যানিং স্টেশনে নেমে মাতলা পেরিয়ে ডকঘাট থেকে অটো-রিকশা ধরেও সোনাখালি পৌঁছানো যায়। এখান থেকে ভুটভুটিতে প্রায় দেড় ঘন্টার নদীপথে সুন্দরবনের গোসাবা, ওপারে বাসন্তী থেকে গদখালি বা গোসাবার অটো ধরে আরও কম সময়ে গোসাবায় পৌঁছানো যায়। সেক্ষেত্রে গদখালি থেকে আরও একবার নদী পেরোতে হবে। হোগল, বিদ্যাধরী ও দুর্গাদোলনী তিন নদী সঙ্গমের অনাবিল দৃশ্যপট গোসাবায়। গোসাবা ভূখণ্ডের পর থেকেই সুন্দরবনের অরণ্যভূমি শুরু। রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় ২ দিনের জন্য

এসেছিলেন ১৯৩২-এর ৩০ ডিসেম্বর বিশিষ্ট স্কটিশ স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে। বিশ শতকের গোড়ায় জঙ্গল হাসিল করে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া দ্বীপে সমবায় ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন হ্যামিলটন। আর তা দেখতেই রবীন্দ্রনাথের গোসাবায় আসা। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বেকন বাংলোয়। গোসাবা থানার পাশে কাঠের এই বাংলোটি জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। গোসাবা বাজারের পাশে হ্যামিলটনের নিজস্ব কাঠের বাংলোটিও আকর্ষণীয়। ঔপনিবেশিক স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের স্মারক এ দুটি। অবহেলায় নিশ্চিহ্ন হবার আগে দ্রুত সংরক্ষণ দরকার। সুন্দরবন বেড়াতে আসলে বাংলো দুটি দেখে নেওয়া যায়। গোসাবায় রাতে থাকার মতো বেসরকারি ভালো হোটেল আছে। ঘর না পেলে অদূরে রাঙাবেলিয়া গেস্ট হাউসেও থাকা যেতে পারে। গোসাবার কয়েক কিলোমিটার দূরে রাঙাবেলিয়া ও পাখিরালয়, রাঙাবেলিয়া সাইকেল-ভ্যানে ৩০ মিনিট। টেগোর সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণ দেখা যাবে রাঙাবেলিয়ায়। এখানে খাওয়া ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। রাঙাবেলিয়া থেকে পাখিরালয় সাইকেল-ভ্যানে ২০ মিনিট। গোসাবা ভূখণ্ডের জনবসতির শেষ পাখিরালায়। ওপারে সুন্দরবনের সজনেখালি অভয়ারণ্য। পাখিরালয় নদীর উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর সূর্যোদয় ভালো লাগবে। জেলা পরিষদের আবাস ছাড়াও কয়েকটি বেসরকারি লজ পাখিরালয়ে তৈরি হয়েছে। গোসাবা এখান থেকেও বোট ভাড়া করে সুন্দরবনে ঘোরা যায়। অনুমোদন নিতে হবে ওপারে সজনেখালি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কার্যালয় থেকে। সজনেখালিতে রয়েছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের কাঠের সুদৃশ্য আবাস।

ফলতা কলকাতা থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে ফলতা। বাবুঘাট থেকে ৮৩নং বেসরকারি বাস ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে প্রায় আড়াই ঘণ্টায় ফলতা যাচ্ছে। তারাতলা থেকেও লাক্সারি বাস ফলতা যায়। গ্রামে ডাচদের একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ১৭৫৬-র ১৯ জুন কলকাতায় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কাছে পরাজিত হয়ে গভর্নর ডেকসহ অনেক ইংরেজ জাহাজে করে পালিয়ে এসে এই দুর্গে আশ্রয় নেয়। প্রায় ৩০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই ধ্বংসাবশেষে রয়েছে ভূ-গর্ভস্থ ও চতুর্দিকে বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ, কামান দাগবার জায়গা, আস্তাবল, বারুদ কারখানা। রয়েছে চওড়া পরিখা। ঘুরে দেখতে সময় লাগবে, দুর্গে ব্যবহৃত একটি কামান রয়েছে ফলতা থানা চত্বরে। দুর্গ দেখে ফেরার সময় কাছেই পারুই পরিবারে রক্ষিত ও হুগলি নদীর কোল থেকে আবিষ্কৃত পাল-সেন আমলের একটি কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি দেখে নেওয়া যায়। গবেষকদের কাজে লাগবে। ফলতা থানার পাশে রয়েছে কলকাতায় জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ফলতা শাখার দ্বিতল বাড়ি। ফলতা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার। প্রায় ২৮০ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে ফলতা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। বিদেশি ও ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিনিয়োগ করেছে এখানে। গড়ে উঠেছে তিনতারা হোটেল সহ বহু কারখানা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। অদূরে দামোদর ও হুগলির সঙ্গম (Falta Point) শুধু নৈসর্গিক দৃশ্য নয়, ফলতা এখন চড়ুইভাতির একটি আদর্শ জায়গা। রাজ্য পর্যটন দপ্তরও ফলতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

বাওয়ালি বাবুঘাট থেকে ৭৬-এ বেসরকারি বাসে সরাসরি কিংবা ডায়মন্ডহারবারগামী যে-কোনও বাসে আমতলায় নেমে বাওয়ালির ট্রেকার ধরে বাওয়ালি মোড়। ট্রেনে বজবজ হয়েও যাওয়া যায়। শখেরবাজার পেরোলেই চোখে পড়বে তৎকালীন মাহিষ্যকুল জমিদার মণ্ডল (রায়) পরিবারের সুবিস্তৃত মন্দির চত্বর যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জীর্ণ, ধ্বংসপ্রায় অনেকগুলি মন্দির, রাসমঞ্চ, বসতবাড়ি, জলটুঙি, নাটমন্দির, হাওয়াখানা, কৃত্রিম উদ্যান সহ ভাস্কর্য ও অলংকরণশৈলীর কিছু অনবদ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। ভালোভাবে দেখতে গেলে সারাদিন লেগে যেতে পারে। শুকনো খাবার নিয়ে যাওয়াই ভালো কারণ দূরে শখেরবাজার ছাড়া আর কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। একটি আদর্শ পর্যটনস্থল হিসেবে এটি গড়ে তোলা যায়। ফেরার পথে বাখরাহাটে এই মণ্ডল পরিবার প্রতিষ্ঠিত রাধা-গোবিন্দর সুবিশাল আটচালা মন্দিরটিও দেখা যেতে পারে। এই জেলায় এত বড় আটচালা মন্দির আর নেই।

জয়নগর-মজিলপুর লক্ষ্মীকান্তপুর বা কাকদ্বীপগামী ট্রেনে কিংবা গড়িয়া হয়ে কুলপি রোড ধরে জয়নগর-মজিলপুর। পাশাপাশি দুটি গ্রামই প্রত্নসম্পদে ভরপুর। আদি গঙ্গার তীরে দ্বাদশ শিবমন্দির তৈরি করে গেছেন জয়নগরের মিত্র পরিবার। মজা আদি গঙ্গা এখন খণ্ড খণ্ড পারিবারিক দিঘি। দ্বাদশ মন্দিরের অবস্থান তাই মিত্র গঙ্গার পাশে। প্রথম মন্দির ১৭৫৫-য়। এরপর বিভিন্ন সময়ে মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছে। পোড়ামাটির কাজ ছাড়াও ইউরোপীয় স্থাপত্য অলংকরণের প্রভাব রয়েছে একটি দোলমঞ্চে। দ্বাদশ মন্দির ছাড়াও ভাল লাগবে রাধাবল্লভ তলায় রাধাবল্লভের দারুমূর্তি। প্রবাদ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার বার ভুইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত মূর্তি এ দুটি। কালিদাস দত্তের মতে প্রতাপ নয় প্রতিষ্ঠা করেন প্রতাপের কাকা বসন্ত রায়। ভাল লাগবে জয়চণ্ডী দেবীর মন্দির ও দারু বিগ্রহ। সেইসঙ্গে উত্তরপাড়ার গোপালচন্দ্র সরকারের বাড়িতে রক্ষিত পুকুর কাটার সময় পাওয়া বিষ্ণুমূর্তি ও শান্তি সংঘে দক্ষিণী পুরাকীর্তি ও বরেণ্য স্মৃতিকক্ষ সংগ্রহশালা (শনি ও রবিবার খোলা)। ট্রেন লাইন পেরিয়ে



ছবি - অঞ্জন খাঁন

পাশের মজিলপুর গ্রামের দেরবেড়িয়া, ভট্টাচার্যপাড়া ও দত্তবাজারে কয়েকটি পুরনো মন্দির ছাড়াও ভাল লাগবে সুপরিচিত ধন্বন্তরি কালীমন্দির, দত্ত বাজারে প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা (ভ্রাম্যমাণ), মজিলপুর কয়েন মিউজিয়াম। প্রত্ন-গবেষকরা দারুণ উপকৃত হবেন। কুখ্যাত ইংরেজ বিচারপতি আর আর গার্লিককে (বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন) আলিপুরের জজ কোর্টের এজলাসে গুলি করে হত্যা করে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য ১৯৩১-এর ২৭ জুলাই। বিপ্লবী কানাইলাল মজিলপুরেরই সন্তান। তাঁর আবক্ষ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত দত্তবাজারে। সেটি দেখে সেই সঙ্গে এই জেলার প্রত্ন-গবেষণার পথিকৃৎ কালিদাস দত্তের দ্বিতল বসতবাড়িটি দেখে চলে যাওয়া যেতে পারে নিমপীঠ। নিমপীঠেও রয়েছে প্রত্ন ও লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান সংগ্রহশালা। নিমপীঠে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি ছাড়াও অদূরে সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহের স্থাপত্যটি দৃষ্টিনন্দন।

কাকদ্বীপ : শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ট্রেন বা ধর্মতলা থেকে কাকদ্বীপ। মড়িগঙ্গা এখানে অনেকটা চওড়া। নৈসর্গিক দৃশ্য ছাড়াও ভালো লাগবে মাছধরা ট্রলার, নৌকো, ভুটভুটির ব্যস্ততা। এই জেলার একটি অন্যতম বড় মৎস্যবন্দর কাকদ্বীপ। বিশেষ করে যাঁরা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব পছন্দ করেন তাঁরা কাকদ্বীপের গঙ্গারিডি প্রত্ন-সংগ্রহশালাটি দেখতে পারেন। জিজ্ঞেস করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। কাকদ্বীপ থেকে সাইকেল-ভ্যানে পুরনো স্টিমার যায়। ফেরি পেরিয়ে শ্রীশ্রীগৌরনৃসিংহ আশ্রম। আশ্রমের বারান্দায় কালো পাথরের প্রায় হাজার বছরের পুরনো একটি অপূর্ব সুন্দর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। মাটি খোঁড়ার সময় আবিষ্কৃত। গবেষকরা উপকৃত হতে পারেন। এই সঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে কাকদ্বীপের গণেশপুরে (বাস স্ট্যান্ড থেকে হেঁটে ১০ মিনিট) আটচালার সুবৃহৎ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির, মূর্তি-ভাস্কর্য ছাড়াও ঔপনিবেশিক স্থাপত্য ও অলংকরণশৈলীর কিছু বর্ণময় নিদর্শন মন্দিরটিতে। কলকাতা ফেরার পথে দেখে নেওয়া যেতে পারে শিবকালী নগরে (কামারেরহাট মোড় থেকে পশ্চিমে দেড় কিমি) হুগলি নদীর কোলে নিশ্চিহ্নপ্রায় আর একটি আটচালার বিশালাক্ষীর মন্দির সহ কয়েকটি ধাতব সুবৃহৎ মূর্তি-ভাস্কর্য। নদীর উল্টোদিকেই ঘোড়ামারা দ্বীপ। সব মিলিয়ে দৃষ্টিনন্দন ও বিরল নিসর্গদৃশ্য। আরও এগিয়ে বেলপুকুর মোড় থেকে ডান দিকে ঢুকে অরুণনগরে (পাত্রবেড়িয়া) রয়েছে পাত্রদের প্রত্ন-কীর্তির কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শতাধিক বছরের মন্দির, রাসমঞ্চ, ভগ্ন তোরণদ্বার, সুবিশাল দিঘি। সময় থাকলে কুলপির দুর্গানগর গ্রামে (কুলপিমোড় থেকে) চলে যাওয়া যেতে পারে। বাংলা চালাশৈলীর মন্দির- স্থাপত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা অবশ্যই দেখবেন জনৈক পর্তুগিজ রমণীর সমাধিসৌধ হিসেবে পরিচিত 'চারচালা'র একটি বিরল স্থাপত্যকে। কুলপি থানা চত্বরের মন্দিরে রাখা পাল-সেন আমলের একটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তিও একই সঙ্গে দেখে কলকাতা ফেরা যেতে পারে।

পশ্চিম জটার দেউল : ধর্মতলা-রায়দিঘি সরকারি বাস কিংবা শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেনে মথুরাপুরে নেমে বাস বা ট্রেকারে রায়দিঘি। এখান থেকে মণিনদী পেরিয়ে কঙ্কনদিঘি থেকে সাইকেল-ভ্যানে প্রায় ৭ কিলোমিটার দুরে পশ্চিম জটার দেউল গ্রাম। পাল-সেন আমলের (৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ ?) বিরল দৃশ্য একটি ইটের শিখর দেউলের নামে গ্রামটির নাম। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্ন-সম্পদ এটি। কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এটির সংরক্ষণের দায়িত্বে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে আবিষ্কৃত দেউলটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্মিত করেছে। তবে কি হাজার বছর আগে সুন্দরবনে জনবসতির অস্তিত্ব ছিল ?

বড় একটি ঢিপির ওপর দেউলটি দাঁড়িয়ে। বর্গাকার প্রায় ৬০ ফুট উঁচু। জটা গ্রামে শীতে যাওয়াই সুবিধে তবে ২ বৈশাখ যেতে পারলে ভাল। শিবপূজা উপলক্ষে বড় মেলা ছাড়াও বাড়তি আকর্ষণ ঘোড়দৌড়। ফেরার পথে কঙ্কনদিঘির কয়েকটি ঢিপি, সাবেকি জলাশয়, পাতলা ইটের স্নানঘাট ও ভূ-গর্ভস্থ ইটের বনেদ দেখে রোমাঞ্চিত হতে পারেন। প্রচুর প্রত্নবস্তু কঙ্কনদিঘি থেকে পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের সুপ্রাচীন জনবসতির ইঙ্গিত এখানেও। ফেরার পথে হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় রাখতে পারলে রায়দিঘি পেরিয়ে খাড়িতে দীনবন্ধু নস্করের খাড়ি-ছত্রভোগ প্রত্ন-

সংগ্রহশালা, কৃষ্ণচন্দ্রপুরে নেমে ছত্র-ভোগের সুপরিচিত ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে ডাঃ তুলসীচরণ ভট্টাচার্য স্মৃতিসংগ্রহশালা দেখলে এই জেলার সুপ্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটা অনেকটা স্পষ্ট হবে।

ঘুটিয়ারি শরিফ শিয়ালদহ-ক্যানিং ট্রেন লাইনে ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশন। কয়েক মিনিট হাঁটাপথে চোখে পড়বে মধ্যযুগের ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের অন্যতম পীর মোবারক গাজীর সুদৃশ্য মাজার। ভিতরে গাজী সাহেবের সমাধি। পীর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে মাজারটি যা এক পুণ্যপীঠ হিসেবে পরিচিত। ৭ আষাঢ় থেকে ১৭ শ্রাবণ এখানে বার্ষিক হাজোত উৎসব পালিত হয়। মেলা বসে। হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। তবে সারা বছরই ঘুটিয়ারি শরিফে থাকে ধর্মমত নির্বিশেষে পুণ্যার্থীদের ভিড়। সময় থাকলে ঘুটিয়ারী শরিফ থেকে ফিরতি ট্রেনে সোনারপুর। এখান থেকে বারুইপুরগামী ট্রেনে মল্লিকপুরে নেমে পুবদিকে ৬ মিনিটের হাঁটাপথে (সাইকেল-ভ্যান যায়) গনিমা। এখানে জেলার সুপ্রসিদ্ধ পীরস্থান গনিমাত-উল-খায়ের বা পীরসাহেব হাবিব-আল-আত্তাসিয়ার দরগাহটি ১৯০৫-এ তৈরি। তোরণদ্বারের চারমিনার ও গম্বুজের গঠনশৈলী আকর্ষণীয়। ভিতরে হেফাজৎখানা, নামাজঘর, পীরসাহেবের দ্বিতল আবাস, সুউচ্চ কূপ, পুষ্পশোভিত বাগান। ফতেয়াদোয়াজদহম উপলক্ষে বিদেশি সহ বহু মানুষের সমাগম হয় এখানে। মল্লিকপুর স্টেশনে একটি সাইনবোর্ডও লাগানো আছে এই উপলক্ষে— 'ফতেয়াদোয়াজদহমে যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ এই স্থানে নামুন'। এখন থেকে ফেরার পথে সময় থাকলে পরের স্টেশন সুভাষগ্রামে নেমে কোদালিয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাড়িটি দেখে আসা যায়।

বহড়ু প্রাচীন দেওয়ালচিত্র ও তক্ষণশৈলী বিরলদৃশ্য শিল্প। অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাবেকি সূত্রধর শিল্পীদের হাতের কাজ। এই জেলায় ১৭৫ বছর আগের একমাত্র দেওয়ালচিত্রের নিদর্শন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হবার আগে দেখে নেওয়া উচিত। জয়নগর-মজিলপুরের আগের স্টেশন বহড়ু। ১ কিমি পশ্চিমে বসু পরিবারের শ্যামসুন্দর জিউ-এর দালানমন্দির। অলিন্দের দেওয়ালে শিব, দুর্গা, নন্দী, ভৃঙ্গী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের নানা বিষয়বস্তুগত রঙিন চিত্র। চুনার থেকে নৌকা করে পাথর আর জয়পুর থেকে 'Fresco Point' আনিয়ে নন্দকুমার বসু এই মন্দিরটি তৈরি করান। অবহেলায় অধিকাংশ চিত্র বিবর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত। দ্রুত সংরক্ষণ দরকার। শুধু দেওয়ালচিত্র নয়, কষ্ট হবে অবহেলিত ও নিশ্চিহ্নপ্রায় দুর্গাদালান, বহড়ু বাজারে পাঁচটি জরাজীর্ণ শিবমন্দির দেখলে। এরপর দক্ষিণ পাড়ায় বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আদি বসতবাড়ি, ভঞ্জদের ঠাকুরদালানে ১৮৭৭-তে প্রতিষ্ঠিত অষ্ট ধাতুর বিরল দৃশ্য দুর্গামূর্তিটি। দেখে নেওয়ার পর চলে যাওয়া যায় মন্দিরবাজার থানার মহেশপুর গ্রাম (দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ডায়মন্ডহারবার বাস রাস্তায় কাঠের পোল স্টপ)। মহেশপুরে প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো বিরলদৃশ্য কাঠ খোদাইয়ের কাজ আজ অবহেলায় বিলুপ্তির পথে। কাঠের স্তম্ভে বিধৃত রাধা-কৃষ্ণলীলার নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী সহ বিচিত্র জ্যামিতিক নক্শা। মহেশপুরের ঘরে ঘরে শোলার কাজ বাড়তি আকর্ষণ। ফেরার পথে দেখা যেতে পারে দক্ষিণ বারাশতের আদ্যমহেশের মন্দিরে স্বাভাবিক ভূমিস্তরের নিচে সুপ্রাচীন শিবলিঙ্গ, বারুইপুরের রবীন্দ্রভবন লাগোয়া সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা (শনি, রবি বিকেলে খোলা)। উল্টোদিকে জমিদার রায়চৌধুরিদের দুটি প্রাচীন দুর্গাদালানে শঙ্খের কাজ, পুরাতন বাজারে রায়চৌধুরিদের ধ্বংসপ্রায় আদি বসতবাটি, দোলমঞ্চ, রামনগরে গ্রন্থাগারে কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা। একদিনে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা শক্ত। ফলে যত সকালে বেরোন যায় তত ভালো।

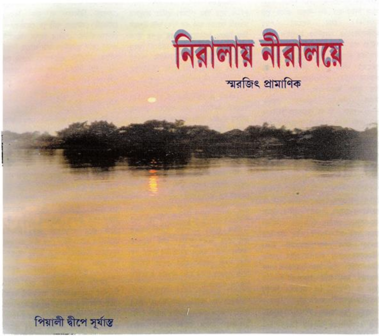
নরেন্দ্রপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আয়তন ০.১০ বর্গকিলোমিটার, অভয়ারণ্যটি গড়িয়া বারুইপুর রাস্তায় নরেন্দ্রপুরে। কলকাতার খুব কাছে এই ছোট অভয়ারণ্যে পাখিদের আস্তানা। মুনিয়া, টুনটুনি, ছাতারে, বেনেবৌ, ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ পান্নাঘুঘু, শা-বুলবুল আর চাক-দোয়েল।

যোগাযোগ: বিভাগীয় বনাধিকারিক, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বনবিভাগ, ৩৫ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭।

বেহালা: একসময় কলকাতা যখন ছিল অখ্যাত গ্রাম, তখন বেহালা অঞ্চলের বড়িশা, সরশুনা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদরূপে স্বীকৃত ছিল। সরশুনা অঞ্চলে বাংলার বারভূঁইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের তৈরি রায়গড় দুর্গের কথা অনেক গবেষক বলে থাকেন। বেহালার সুপরিচিত সাবর্ণ রায়চৌধুরি পরিবারের আদি পুরুষ কেশবরাম রায়চৌধুরি ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিরাটি থেকে বড়িশায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এঁদেরই সন্তোষ রায়চৌধুরীর আমলে বড়িশায় ও তাঁর জমিদারীভুক্ত এলাকায় বেশ কিছু শিবমন্দির তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখ্য বড়িশার সাবর্ণ পাড়ায় আটচালার সুপরিচিত দ্বাদশ শিবমন্দির, সাজার আটচালার পরিত্যক্ত স্তম্ভ, দক্ষিণ বেহালা ও সরশুনার মাঝামাঝি কয়েকটি শিবমন্দির, আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরে পুঁটিয়ারি অঞ্চলে দ্বাদশ শিবমন্দির, চোঙারমোন অঞ্চলে কয়েকটি আটচালার শিবমন্দির ইত্যাদি। সাবর্ণপাড়ার দ্বাদশ শিবমন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির কাজ এখনও আকর্ষণীয়। বড়িশায় দত্তদের কয়েকটি আটচালা শিবমন্দিরও উল্লেখযোগ্য। বেহালা ট্রাম ডিপোর পাশে রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহালয় ও জোকায় গুরুসদয় সংগ্রহশালাটি গুরুত্বপূর্ণ।

নিরালায় নীরালয়ে

স্মরজিৎ প্রামাণিক



পিয়ালী দ্বীপে সূর্যাস্ত

ছবি : স্মরজিৎ প্রামাণিক

যাবেন ? নীরব নিরালায়, নীরের আলয়ে। সীমাহীন নৈঃশব্দ্য আর নীলিম নিসর্গের বসতবাড়ি। তাহলে চলুন কেল্লা। যার পোশাকি নাম অম্বিকানগর।

দক্ষিণের আরেক আকর্ষণীয় এই পর্যটন স্থান তথা পিকনিক স্পটের বয়স প্রায় পঁচিশ। এর স্নিগ্ধ রূপকথা পাঁচকান হয়েছে মুখে মুখে। আর তাতেই চারদিক থেকে পর্যটক আর পিকনিক-পিয়াসীরা বিশেষত শীতের মরশুমে গাড়ি হাঁকিয়ে হাজির হন কেল্লা-অম্বিকানগরে।

সমুদ্র সন্নিহিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী। তেমনই এক মিষ্টি নদী পিয়ালি। মাতলাকে মাতিয়ে তার অভিমুখ সুন্দরবন-বঙ্গোপসাগরে। জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে ছ'ঘন্টা অন্তর অন্তর। জলসেচ, নাব্যতা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে পিয়ালির রাশ টেনে ধরা হল। কুলতলি থানার অম্বিকানগর-ডোঙাজোড়ায় বাঁধ উঠল পিয়ালির বুকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৭৫ থেকে ৭৭—দুবছর ৫২ জন ঠিকাদারের ১৬০০ মজদুরের মেহনতে তৈরি হল পিয়ালি বাঁধ। পিয়ালি হল দ্বিখণ্ডিত। তার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হল খাল কেটে। চাষবাসের পথ সুগম করতে এভাবেই নোনা জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এজন্য ৬০০ x ৬০০ ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ধানক্ষেত ২১ ফুট গভীর খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে সবিস্ময়ে ভাবেন এখানে বোধহয় সৈন্যরা থাকবেন। তাই তৈরি হচ্ছে কেল্লা বা দুর্গ। সেই থেকে লোকমুখে এর নাম হয়ে গেল কেল্লা।

নিথর নীরবতা, টলটলে জলরাশি আর মাথার ওপর অপার সবুজ-শামিয়ানা। এসব ছাড়িয়ে দিগন্তছোঁয়া সুনীল আকাশ। জীবনীশক্তিতে উজ্জীবিত করার অকৃত্রিম আয়োজন অম্বিকানগরে। আঠারো একর জুড়ে সবুজের একার রাজকীয় রাজত্ব। অথচ শুরুতে অম্বিকানগরে ছিল খাঁ-খাঁ হাহারব। 'নাই যে সেথায় ছায়াতরু।' মশলা মেশানোর

মেশিনের আনাচে-কানাচেও চিলতে ছায়ার খোঁজ নিতে হত বাঁধ বাঁধার কাজে যুক্ত মানুষদের। সেচ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের আন্তরিক উদ্যোগে বর্ষায় কর্মীরা গাছ লাগাতে শুরু করলেন। এছাড়া সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প নিয়ে এল সবুজের সমারোহ। নদীর দুতীরে দুতীর বার্তা পায় বাবলার সারি। বাগানে-বাগানে আকাশে মাথা তুলল আকাশমণি, ঝাউ, মেহগনি, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, অর্জুন, ইউক্যালিপটাস। খাঁ-খাঁ শূন্যতাকে অধিকার করে এখন শুধুই সবুজের রাজ্যপাট। আর এই সবুজের আবহে সজল প্রেক্ষাপটে নীল আকাশ ছড়িয়ে দেয় শুধুই স্নিগ্ধতা। নিস্তরঙ্গ জলে প্রতিবিম্বিত হয় ঊর্ধ্বাকাশে সফেদ বকের পালের নিঃশব্দ নিরুদ্বেগ পক্ষবিস্তার। নদীর নিটোল জলে টুপটুপ ডুব দেয় পানকৌড়ি। আর পাড়ে নরম মখমল ঘাসের গালিচায় চরে বেড়ায় গাঁয়ের গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল। নদীর চরে চরে-বেড়ানো গবাদির কাঁধে চড়ে অনাবিল আনন্দ পায় গ্রামীণ বালক। নদীর তীর ধরে এগোলে ডাক দেয় মায়াময় বাঁক। কাটাখালের ওপর বত্রিশটা স্লুইস গেটের সটান সারি। ২৩ জুন ১৯৭৯-এ পূর্ব মগরাহাট জলনিকাশি প্রকল্পের কুলতলি স্লুইস ও পিয়ালি বাঁধ উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

আগে সেচ বিভাগের ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে বনভোজনের অনুমতি মিলত। মাস ছয়েকের মধ্যে সেচ বিভাগের পার্শ্ববর্তী নতুন ভবনে চলে যাবার কথা। পুরো এলাকা জুড়ে ট্যুরিজম সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা পর্যটন দপ্তরের। পুরো জমিও পর্যটন দপ্তরের হাতে তুলে দেবার কথা সেচ বিভাগের। এসব না হওয়া পর্যন্ত খাতায়-কলমে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না পিকনিক-পার্টিদের। তবে নদীর পাড়ে ফাঁকা জমিতে অসংরক্ষিত এলাকায় পিকনিকে আপত্তি নেই।

পিয়ালির বাঁয়ে ডোঙাজোড়া। ডান দিকে কেল্লা-অম্বিকানগর। বুধ-শনি দুদিনই হাট বসে, দুগাঁয়েই। আসার পথে ঢোসা আর মোষমারিতেও হাট বসে রবি-বৃহস্পতি। এসব আর পাঁচটা ছোট গ্রামীণ গঞ্জের মতো। পিকনিকে রান্নাবান্নার জন্য ঢোসাহাটে ডেকরেটার্সের মালপত্র পেতে পারেন।

পিকনিকের অবসরে নৌবিহার। পাড়ে হাজির সার সার নৌকা। স্থানীয় মানুষের মরশুমি আয়ের আর এক পথ। ঘণ্টা হিসাবে কিছু টাকার বিনিময়ে জলের ওপর ঝুঁকে পড়া বুনো গাছের ঝাঁক সরিয়ে ভেসে বেড়ানোর ফাঁকে দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবেন জোয়ার-ভাঁটা। দুকূল ছোঁয়া জল নিমেষে সরে গিয়ে গুমরে ওঠে রিক্ততা।

এখানে রয়েছে রাজ্য সরকারের তিন দপ্তরের কার্যালয়। সেচ দপ্তরের দোতলা অফিস ছাড়িয়ে কাটা খালের ডানদিকে বন দপ্তরের বাড়ি। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে পিয়ালি ট্যুরিস্ট লজ। ৯১-এর ডিসেম্বরে এর কাজ শুরু হয়। শেষ হয়েছে ৯৩-এ। একতলা-দোতলা মিলিয়ে দুটি করে চারটি দ্বি-শয্যার ঘর। এরকম চারটি ব্লক মিলিয়ে মোট ষোলটি ঘর আছে লজে। এই লজে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। 'হোটেল আরণ্যক' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা এটির লিজের জন্য নির্বাচিত হলেও আপাতত বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়ে ওঠেনি। সেচ দপ্তরের কার্যালয় নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবার পর এঁরা পুরো এলাকা হাতে পেলে দরকার মতো সাজিয়ে নিতে চান। সম্প্রতি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

কেল্লা বা অম্বিকানগর যাবার রাস্তা তিনটি। সড়কপথে সরাসরি। নতুবা রেল-স্থল-জল। প্রথমে সোজা রাস্তার কথা। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় লক্ষ্মীকান্তপুর (বা কাকদ্বীপ) লাইনে ট্রেনে দক্ষিণ বারাশত। এক ঘণ্টার একটু বেশি সময়। শিয়ালদা থেকে সকালে ডাউন ট্রেনের সময় এইরকম ৩-৫৫, ৪-৩০, ৫-০৫, ৫-৫৫, ৬-৫২, ৮-১২, ৯-০৮ ইত্যাদি। ভাড়া ১১ টাকা। এছাড়া ৬ নম্বর রুটে সরাসরি গাড়িতেও দক্ষিণ বারাশত আসা যায়। এখানে পৌঁছে রেলগেটের কাছ থেকে মোষমারি-কেল্লাগামী ট্রেকার পাবেন। পুবে গোঁড়ের হাট, নয়পুকুরিয়া, ময়দা, বাঁশতলা, জীবন মণ্ডলের হাট, মায়াহাউড়ি, দাড়া, পদুয়া, তারানগর, কৃপাখালি, গরানকাঠি, মোষমারি পেরিয়ে কেল্লা। অধিকাংশ চড়ুইভাতি-পার্টি এই পথই বেছে নেন।

দ্বিতীয় পথ ওই একই ট্রেনে দক্ষিণ বারাশতের দুস্টেশন আগে গোচরণ। এখান থেকে ৯৯ নম্বর বাস কিংবা বারুইপুর-ঢোসাহাট মিনিবাস বা ভ্যান রিকশায় ঢোসাহাট। নেউতলা, শান্তিপুর, মোমরেজগড়, গোয়ালবেড়িয়া পেরিয়ে আসুন ঢোসাহাট। এখান থেকে ভুটভুটিতে ঘণ্টা আড়াই পিয়ালি নদীতে। ভুটভুটির শেষ গন্তব্য পিয়ালি বাঁধ। নদীর পাড় দিয়েও রাস্তা আছে। প্রসঙ্গত, ঢোসাহাট থেকে নদীর পাড় বরাবর রাস্তা সংস্কারের ওয়ার্ক অর্ডার সম্প্রতি বেরিয়েছে বলে জানা গেছে।

শীতের নরম রোদে পিঠ রেখে একটানা এই কঘণ্টার জলযাত্রার স্মৃতি মনে থাকবে দীর্ঘদিন। ভুটভুটির একটানা যান্ত্রিক শব্দে বিব্রত শরীর আরাম খুঁজে নেবে চিকচিকে জল, সোনালি রোদ, পাড়ের ঝাঁটি ঝোপ, তাল-খেঁজুরের সারি আর পাশে বসা সহজ সরল সহযাত্রীর সান্নিধ্যে।

তৃতীয় পথ একই ট্রেনে দক্ষিণ বারাশতের দুস্টেশন পরে জয়নগর-মজিলপুর। এখানে জয়নগর থানার কাছ থেকে ছাড়ে জামতলার বাস। নিমপীঠ, মাইবিবির হাট পেরিয়ে শেষ স্টপ জামতলা। নিমানিয়া সাঁকোর ওপারে মিনিট পনেরোর পথ কেল্লা।

ফেরার পথে জয়নগর দিয়ে ফিরলে নিমপীঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম, জয়নগরে ধন্বন্তরি কালীমন্দির, দ্বাদশমন্দির, প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা দেখে নিতে পারেন। শীতের সওদা বিখ্যাত জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের পাটালি, সন্দেশ সংগ্রহ করে নিন এদের আদি উৎসভূমি থেকে। দক্ষিণ বারাশতের পথে ফিরলে ময়দা কালীবাড়ি, গোঁড়ের হাটের গোঁড় (পুরু ঘাসের আস্তরণ-মোড়া বড় মজা-দিঘি) দেখে নেবেন। ফেরার জন্য বিকালে শিয়ালদাগামী আপ ট্রেনের সময়সূচি জয়নগর থেকে—৩-০৭, ৪-২৮, ৫-২৭, ৬-১১, ৭-০৩, বারাশত থেকে—৩-১৬, ৪-৪৩, ৫-৩৫, ৬-১৯, ৭-১৩ এবং গোচারণ থেকে—৩-২৭, ৪-৫১, ৫-৪৫, ৬-২৭, ৭-২৭ ইত্যাদি।

নাগরিক যান্ত্রিকতা কিংবা কলকাতার কলরব থেকে কয়েক ঘণ্টা সবুজ, জল আর নিখাদ গ্রামীণ আবহের সমাবেশে সময় বেশ কেটে যাবে। এই বিশেষ রেশ শেষ হবার নয়। মনে মনে আবার আপনাআপনি আপনি কেল্লায় পৌঁছে যাবেন।



আরণ্যক বঙ্গ

ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রকৃতি গোটা দেশের বৈচিত্র্যময় সত্তার নিয়ে আপন স্বাভাবিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চারণভূমির তরঙ্গায়িত বিস্তার গাঙ্গেয় সমভূমির সীমানা ছুঁয়েছে। শস্যশ্যামল সমভূমি ক্রমশ নেমে এসেছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে। বৈচিত্র্য তার মাটির প্রকৃতিতে, অরণ্যানীর বিন্যাসে উদ্ভিদ প্রজাতিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে, এমনকি জনঘনত্বের বন্টনেও। উত্তরবঙ্গের আর্দ্র ডুয়ার্স অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭০০০ মিমি'র বেশি। আবার শুকনো লালমাটির দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০ মিমি'রও কম। ভারতের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ (প্রতি কিমিতে ৭৬৭ জন)। জনঘনত্বের বন্টনের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিপুল বৈচিত্র্য। সুউচ্চ হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ৮৮,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চলে বাংলার যে জীবমণ্ডল প্রসারিত, সেখানে গোটা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ফল-ফুল, পশু-পাখি, শিলা-মৃত্তিকা এবং জলবায়ুর একটা গড় ছবি পাওয়া যায়। যেমন—ভারতের বিভিন্ন জৈব ভৌগোলিক পরিবেশে যে তিন ধরনের ভোঁদড় দেখা যায় অর্থাৎ, (১) জলাভূমিতে সাধারণ ভোঁদড়, (২) নদীতে সাঁতারু ভারতীয় ভোঁদড়, (৩) পাহাড়ি এলাকার ছোট্ট নখের ভোঁদড়—এর সব কটিই পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চল ভীষণভাবে কমে আসছিল। সত্তরের দশক পর্যন্ত ছবিটি এমনই ছিল। কিন্তু সামাজিক বনসৃজনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে থাকে পরিস্থিতির। শুরু থেকেই দক্ষিণবঙ্গের ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। বনভূমির স্বাভাবিক আবাসের আকর্ষণে বিহার থেকে হাতির পাল চলে আসে। বাংলার অনন্য জৈব ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটেছে তার অরণ্য অঞ্চলে। এখানে মূলত রয়েছে—(১) ক্রান্তীয় (২) উপক্রান্তীয় ও (৩) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্য। এর মধ্যেও আবার ৮টি উপশ্রেণী রয়েছে। উদ্ভিদ প্রজাতিতেও তাই বৈচিত্র্য। এখানে রয়েছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কনিফার, ওক, রোডোডেনড্রন, উপক্রান্তীয় আর্দ্র বনাঞ্চলের গাছপালা, আবার ক্রান্তীয় পালল ভূমির শাল অরণ্য। বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ম্যানগ্রোভ অরণ্য রয়েছে সুন্দরবনে, যা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর শিরোপা পেয়েছে।

বাংলার বনভূমির আরেক সম্পদ বিরল প্রজাতির বিখ্যাত এক শৃঙ্গ গণ্ডার। আছে লাল পাণ্ডা, পিগমী হগ, বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান, কৃষ্ণগ্রীব সারস, বিখ্যাত চিত্রিত হর্নবিল, গোলিয়াথ হেরন, খাঁড়ি অঞ্চলের কুমীর, সালভাতোর লিজার্ডস, অলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ, দুর্লভ বাটাগুর নদীচর কচ্ছপ। এ ছাড়া ভারতের নানা শ্রেণীর বাঘ ও বিড়াল প্রজাতির প্রায় সব প্রাণীরই দেখা মেলে পশ্চিমবঙ্গে। এখানে যেমন রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, তেমনই আছে পাঁশুটে চিতা, মার্বেল রঙা বিড়াল, মাছধরা বিড়াল, লেপার্ড ক্যাট, সোনালী বিড়াল, বনবিড়াল ইত্যাদি।

বনভূমি ছাড়াও বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। যেমন উদ্‌বিড়াল, গন্ধগোকুল, মাছধরা বিড়াল, বিভিন্ন ধরনের সাপ এগুলো লোকালয়ের আশপাশেই থাকে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘিরে যে জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র রয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পরিষ্কার জলের জলজ উদ্ভিদের মনোরম বৈচিত্র্য এখানে অনায়াসলভ্য, অর্থনৈতিক তথা নান্দনিক দিক থেকে যার গুরুত্ব রয়েছে। জলাভূমিতে রয়েছে অসংখ্য জলচর পাখি, যার কিছু স্থানীয় আর কিছু পরিযায়ী শ্রেণীর। এদের সমাবেশের চমৎকার স্থানিক বৈচিত্র্য অত্যন্ত উপভোগ্য। পানকৌড়ি আর পরিযায়ী কৃষ্ণসারস যেমন দলে দলে চলে আসে উত্তরবঙ্গের জলাভূমিতে মধ্য বাংলার জলাভূমিতে রক্তাভ মরালী আর চামচ-চঞ্চুরা বা তেমনই গর্বিত পদক্ষেপে হেঁটে বেড়ায়। লালঝুঁটি মাছরাঙার মতো বিরল দর্শন পরিযায়ীরা লালমাটির রাঢ়ভূমিতে জলাভূমি সচকিত করে তোলে।

পরিবেশ ও পর্যটন

প্রণবেশ সান্যাল

পরিবেশের ওপর প্রভাব প্রায় সব শিল্পের ক্ষেত্রেই রয়েছে। পর্যটনকে যখন শিল্পোদ্যোগ বলে গণ্য করা হয় তখন তারও পরিবেশের ওপর প্রভাব কতটা তা ভেবে দেখা দরকার। পূর্ব আফ্রিকার জাতীয় উদ্যানগুলিতে পর্যটকরা সিংহের ছবি তুলতে খুব কাছে গাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাতে ঘাসের বনে বসে থাকা সিংহের বাচ্চারা প্রায়শই চাপা পড়ত। বর্তমানে তাদের বাঁচাবার জন্যে নির্দিষ্ট পথে গাড়ি চালাতে পর্যটকদের বাধ্য করা হয়। পরিবেশ রক্ষা করে পর্যটন শিল্পকে অব্যাহত রাখাকে আজকাল 'ইকো পর্যটন' আখ্যা দেওয়া হয়। ইকো পর্যটকরা চেষ্টা করেন পরিবেশকে নষ্ট না করে, স্থানীয় মানুষকে সচেতন করে তাদেরই কল্যাণার্থে পর্যটনকে কেমন রূপ দেওয়া যায় যেমন জিম্বাবোয়ের ওয়াঙ্কে জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকায় বনজ কাঠ, পাতার ছাউনি দিয়ে পরিষ্কার কুটির করে ৫ কিলোমিটার দূরে গাড়ি রাখে। এই ৫ কিলোমিটার তাঁরা হেঁটে আসেন। ফলে স্থানীয় আদিবাসীরা কুলির কাজও পাচ্ছে। মাসাইমারা জাতীয় উদ্যানে মাসাই গাইড নিয়ে যেতে হয়। মাসাই গাইডরা অসাধারণ পাখি ও প্রাণী চেনে। তাই ইকো পর্যটকরা তাঁদের জিজ্ঞাসা মেটাতে পেরে খুশি হন, স্থানীয় মানুষেরও কাজ মেলে। প্রবাল প্রাচীর দেখতে পর্যটকরা প্রবালেই নৌকা নোঙর করতেন তাতে প্রবাল ধ্বংস হতো। ইকো পর্যটকরা ক্যারিবিয়ানে বয়া বসিয়েছে, অনেকে সেখানে নৌকা নোঙর করতে পারছে। প্রবালপ্রাচীরও পর্যটনের চাপে ধ্বংস হচ্ছে না। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পর্যটন পরিচালনা করার জন্যে সাগর সৈকতে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

(১) যেখানে প্রবালপ্রাচীর রয়েছে এবং স্কুবা ডাইভিং চালু, সেখানে বছরে ১০০০০ জনের বেশি ডাইভিং করলে প্রবালের ক্ষতি হয়। সেইভাবে ডাইভারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(২) সৈকতের এলাকা অনুসারে হোটেলের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। যেমন গোয়ার ক্ষেত্রে জনাপ্রতি ৪০ বর্গমিটার সৈকতের প্রয়োজন।

(৩) ভূগর্ভস্থ বা পানীয় জলের সঙ্কুলান জনাপ্রতি ৫০০ লিটার প্রতিদিন পাওয়া উচিত।

বর্তমানে উপকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ আইনে তরল এবং কঠিন বর্জ্যকে পরিশোধন ও পরিচালন করা হয়। ব্যাঙ্ককে কঠিন বর্জ্য পরিচালন করার জন্যে চার রঙের চারটি টব পর্যটকদের জন্যে সাজানো থাকে। একটিতে প্লাস্টিক, একটিতে কাচ, একটিতে কাগজ, আর একটিতে অন্য সবরকম বর্জ্য ফেলার বোর্ড থাকে।



পর্যটনের চাপে বাদাবন অঞ্চলে পরিবেশের ক্ষতির সমীক্ষা করা হয় মূলত জলের দ্রবীভূত অম্লজান (অক্সিজেন) এবং তেল ও গ্রিজের পরিমাণ দেখে। সুন্দরবনে বছরে ৫০,০০০ পর্যটক যাওয়া সত্ত্বেও বিপজ্জনক মাপের অর্ধেকও অতিক্রম করেনি। কাজেই সুন্দরবনের পরিবেশ অটুট রেখে একলক্ষ পর্যটক প্রতি বছর এই বাঘের রাজ্যে ঘুরে আসতে পারে।

পাহাড়ি অঞ্চলে পরিবেশ দূষণের জন্যে দায়ী পর্যটকদের বর্জ্য প্লাস্টিক। ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্সে আজকাল ঢোকার সময় হাতে বড় কালো পলিব্যাগ ধরিয়ে দেওয়া হয়। যাতে নিজের সবরকম কঠিন বর্জ্য নিজেই বয়ে এনে বেরোনর সময় জমা দিয়ে দিয়ে যেতে পারে। এতে পুনর্ব্যবহার করে সম্পদের সাশ্রয় হয়, পার্কও পরিষ্কার থাকে। এছাড়াও পাহাড়ে পর্যটকদের কাছে পানীয় জলের ঘোর সংকট দেখা দেয়। পাহাড়ে কম করেও ১৫০ লিটার জনাপ্রতি জলের প্রয়োজন। সেইভাবে পর্যটকের সংখ্যা নির্ধারিণ করা উচিত।

এসব ছাড়াও পর্যটকের জন্য প্রবাল, মাদার অব পার্লস (ট্রকাস বা টার্বো), সাগর কাঁকড়া, চিরুনি কচ্ছপের (Hawksbill turtle) পিঠের খোলা বিক্রি করা হয়। সাগর কাঁকড়ার (Horse shoe) খোল ফ্লোরিডার দোকানেও পর্যটকদের কাছে বিক্রি করা হয়। পাহাড়ে বা কাশ্মীরে অনেক সময় বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর চামড়ার ব্যাগ, চর্বি, কোট ইত্যাদি বিক্রি হয়। সাতুস বা তিব্বতি অ্যান্টিলোপের লোমের বাজার দর অতি মূল্যবান ও লোভনীয় বলে কাশ্মীরে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু সাতুস এখন অতি বিপন্ন প্রজাতি।

উপরোক্ত চাপই পরিবেশের ওপর থেকে কমানো যায়, সচেতন ইকো পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইকো পর্যটকরা জানতে চায় উদ্ভিদ সম্বন্ধে, প্রাণী সম্বন্ধে, মন্দির-ভাস্কর্য সম্বন্ধে, ইতিহাস সম্বন্ধে। তাই অন্য কেউ এদের ধ্বংস করছে দেখলে বাধা দেয়। আফ্রিকার রুয়ান্দা ও বুরুন্দিতে শিম্পাঞ্জি হত্যা রদ হয়েছে ইকো পর্যটন বৃদ্ধি করে। অতএব পরিবেশ ও পর্যটনকে একসূত্রে বাঁধতে হলে ইকো পর্যটন বাড়ানো এবং পর্যটন কেন্দ্রের ধারণক্ষমতার অধিক পর্যটন না করে পর্যটন পরিচালনা করা প্রায়োজন।

আন্তর্জাতিক ইকো ট্যুরিজম বর্ষ ২০০২

অসিত বিশ্বাস



তিস্তার ধারে প্রকৃতির মাঝে শিবির

In nature there are neither rewards nor punishments—there are consequences

—Robert Green Ingersoll

আগামী ২০০২ সালের সূচনায় এই কথাটি স্রেফ লাগসই উদ্ধৃতি হিসেবে নয়—এর প্রায়োগিক তাৎপর্যের দিকটি ভাববার সময় হয়েছে। পরিবেশবাদী সংস্থা-সংগঠন, সবুজ সংঘ এবং পরিবেশবিজ্ঞানীরা তো ভাবছেনই। সবচেয়ে সক্রিয় বোধহয় হতে হবে পর্যটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে। পর্যটন শুধু পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সর্বাধিক দ্রুতগতিতে বিকাশমান শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতমই নয় সেইসঙ্গে NON POLLUTING INDUSTRY-ও বটে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ও নির্বিবেক পর্যটন যে কতদূর ক্ষতিসাধন করতে পারে তার ভূরি ভূরি নজিরও পাওয়া যাচ্ছে ইদানীং। কেমন হওয়া উচিত পর্যটনের চেহারা, বিকাশের ধারা ? কি হওয়া উচিত—কিঞ্চিৎ বিশদ অর্থে, তার উদ্দেশ্য—লক্ষ্য ? 'TOURISM'-এর সঙ্গে কি সম্পর্ক CONSERVATION-এর ? এই বিষয়গুলি বুঝতে, দ্বন্দ্ব- সংশয়-বিতর্কগুলির ওপরে আলোকপাত করতে, একটা দিশা খুঁজে পেতে, সর্বোপরি পর্যটনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলি নিয়ে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরির লক্ষ্যে আগামী ২০০২ সালটিকে UNESCO-র তরফে ঘোষণা করা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক ইকোট্যুরিজম বর্ষ' হিসেবে।

বলা বাহুল্য আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারত ভূখণ্ডের মহান এবং অবিশ্বাস্য জীব ও প্রকৃতিবৈচিত্র্য, অভ্রংলিহ হিমালয় যাঁর শিরোপা কাঞ্চনজঙ্ঘা, সুপ্রাচীন মন্দির ভাস্কর্য, গুহাচিত্র, বৌদ্ধমঠ, লোকশিল্প ও ধর্মীয় আচার এবং আরও কত কি—দীর্ঘদিন ধরে দেশি ও বিদেশি ভ্রমণার্থীদের বিস্ময় উদ্রেক করে আসছে। অতএব, পর্যটনের বিশ্ববাজারে ভারত একটি পরিচিত এবং জনপ্রিয় Brand। এই Brandটিকে চকচকে করে, ঘষে-মেজে, নতুন মোড়কে ঢেকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা চলছে নানাভাবে, নানা উপায়ে—কিছুটা সরকারি স্তরে, বেশিরভাগটাই বেসরকারি পর্যায়ে। কিন্তু এইখানে থেকে যাচ্ছে কিছু মৌলিক ভুল, অনালোচিত থাকছে কিছু প্রাসঙ্গিক সত্য ও তথ্য। বিশদে যাবার আগে আমরা কয়েকটি জিজ্ঞাসার (যেগুলিকে আমরা Frequently Asked Questions হিসেবেও



প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে প্রকৃতি প্রশিক্ষণ শিবির

গণ্য করতে পারি) জবাব খুঁজে নিতে চেষ্টা করি।

(ক) ইকোট্যুরিজম্ কী ?

ইকোট্যুরিজমের Grandfather হিসেবে পরিচিত Dr. Alexander Vov Humboldt এর কথায় ইকোট্যুরিজম্ হল "Purposeful travel to Natural areas to understand the cultural and natural History of the Environment, taking care not to alter the integrity of the ecosystem while producing economic opportunities that make the conservation of Natural resources beneficial to local people—"

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে Dr. Humboldt-এর চিন্তা আজও আমাদের কেন স্পর্শ করতে পারল না, তা এক বিস্ময় ! যদিও বিগত দুটি শতাব্দীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে মাঝে মাঝেই বিপন্ন হতে হয়েছে গতানুগতিক ও অতি-পর্যটনের কারণে। তবু আমরা হাঁটছি উলটো পথে—Going back to future ! যে ভবিষ্যত, হয়তো আসলে আরেকটি বড় বিপর্যয় ! অতি পর্যটনের ভয়াবহ পরিণতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (World Tourism Organisation) বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনেও বারবার উঠে এসেছে Sustainable Tourism বা দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী পর্যটন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি।

একটি দেশজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১৯৯৬ সালের ২৩ আগস্ট। তথাগতের 'শান্তি ও অহিংসা'র ললিতবাণীতে চিরআস্থাশীল সরল ধর্মভীরু• লাদাখিদের পাহাড়ি লে শহর হঠাৎই সেদিন বেশ উত্তেজিত ! উপলক্ষ 'পিপলস্ কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' আহূত এক জনআদালত। পর্যটন মানুষের হৃদয়বৃত্তির, চিন্তার, আবেগের, সহনশীলতার, মৈত্রীর, ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিক জ্ঞানের, সহাবস্থানের, আত্ম-গরিমার, আত্মনির্ভরতার, কল্যাণমুখিতার, ঔদার্য্যের, জাত্যভিমানের, জাতীয়তাবাদের, বিশ্বমুখীনতার, সৃজনশীলতার, উন্নয়নের বন্ধ দরজাগুলিকে খুলে দিয়ে এক অচেনা প্রভাতের বার্তা নিয়ে আসে—এই চালু ধারণার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে সেদিন আগুনখেকো হয়ে উঠেছিলেন 'স্টুডেন্টস্ এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্টস'-এর তরুণ লাদাখি নেতা সোনম ওয়াংচুক। তাঁর কথায়—"পর্যটনের এই গোটা ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী। পর্যটকরা আসে। বুঝতে পারি লাদাখি সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা কত মহান। নেহাতই নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ও সারল্যের ঘেরাটোপে প্রবহমান আমাদের এই জীবনযাত্রা, সভ্যতার সুফলভোগী ক্লান্ত দেশি-বিদেশিদের সম্ভ্রম আদায় করতে পারছে দেখে গর্ব হয়। কিন্তু কাল পর্যন্ত যা ছিল আমাদের কাছে গর্বের, আনন্দের—আজ তা এক অসহনীয় বিড়ম্বনা। এই চাপ আমরা নিতে পারছি না। এতটুকু জায়গা ! বিড়ম্বনা শুধু পর্যটকদের নিয়েই নয়। আরও বেশি অশান্তি গোটা ভারত থেকে আসা হাজার হাজার জীবিকাসন্ধানীদের নিয়ে। এরা আসে ভরা মরসুমে। দিনকয়েকের জন্য। এই জায়গা সম্বন্ধে তাদের ঘৃণা নেই, কিন্তু ভালবাসাও নেই। যা রোজগার হয়, তার সবটাই এরা ফিরিয়ে নিয়ে যায় চেঁছেপুছে। পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছে যে, বিদেশি ও ভারতীয় বন্ধুদের স্বাগত জানানোর এতটুকু উদ্দীপনা আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই।"

মনে পড়ে মহান ভারতের রূপকার নেহরুর বাণী 'ওয়েলকাম এ ট্যুরিস্ট, সেন্ড ব্যাক এ ফ্রেন্ড।'

কিন্তু কেন এমন হল ? উৎপাদনের, রোজগারের, সমৃদ্ধির এই সহস্রধারা অর্গলমুক্ত হবার পরেও কেন এই বীতরাগ ? "অসহিষ্ণু ও অগুণতি পর্যটকদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট জায়গাটির পরিষেবকরা শেষ পর্যন্ত সেবাদাস হয়ে ওঠে ! সে খদ্দেরকে চটাতে পারে না, কারণ রোজগারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গেলে তাকে 'বাজারের সেরা' হতে হবে ! পাছে অন্য কেউ টপকে যায়। কিন্তু নিজের জায়গাটিকে বিপণনযোগ্য করতে গিয়ে, খদ্দেরের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সে কোথায় গিয়ে থামবে ?"

অনিয়ন্ত্রিত ও আগ্রাসী পর্যটনের বোঝা টানতে টানতে ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষিপ্ত ও হতাশ লাদাখিদের সসেমিরা অবস্থা এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন Boriface and Fowler !

তাই বিগত এক দশকে Sustainable Tourism এর কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোচনায় আসছে বারবার। ইকো-ট্যুরিজম্ আসলে Sustainable Tourism এরই আরও সংহত, সম্পূর্ণ ও ফলিত উপপাদ্য—যার মূল দর্শনটি দাঁড়িয়ে আছে এই আধারের ওপর স্থানীয় স্তরে পর্যটনের ঔদ্যোগিক বিকাশ যার মালিকানা ও পরিচালনার ভার থাকবে স্থানীয় মানবসম্পদের ওপর, যেখানে কেউ হবে না গৃহ বা জমিহারা প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণগুলিকে যথাসম্ভব রাখা হবে অবিকৃত ও মৌলিক চেহারায়। অর্থাৎ কৃত্রিম ল্যান্ডস্কেনিং (যেমন ছবির মতো পরিপাটি দেখতে হয় গলফ্ কোর্স বা রিসর্ট)। বন্যপ্রাণীর বিচরণক্ষেত্র

নির্দিষ্ট সীমানায় বেঁধে রাখা স্রেফ দর্শকদের কথা ভেবে, আদিবাসী-উপজাতিদের নিয়ে cultural show. সংশ্লিষ্ট স্থানটির চিরাচরিত (Traditional) স্বাভাবিক (Natural) পটভূমি (Setting)-তে খাপ খায় না এমন ধরনের Architecture বা অন্দরসজ্জা—এসবই ইকোট্যুরিজমের শর্ত লঙ্ঘন করে।

সংক্ষেপে ইকোট্যুরিজমের ৮টি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে

১। পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি ইতিবাচক ও সহমর্মী মনোভাব।

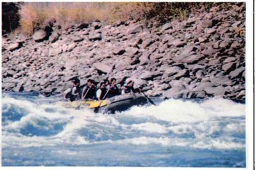
২। প্রাকৃতিক-মানবিক-সাংস্কৃতিক সম্পদের অবনমন নৈব নৈব চ। "উপভোক্তার সন্তুষ্টিসাধনের জন্য" পরিবেশের স্বাভাবিকতার বিকৃতি যথাসম্ভব এড়ানো।

৩। পরিষেবা-সংক্রান্ত সুবিধা (Facility)গুলো নেহাতই সংশ্লিষ্ট পর্যটন উৎপাদনটির বিশেষ 'অন্তর্গত' ও 'বিরল' উপাদানটিকে চেনানোর জন্য প্রয়োজন। দেখা উচিত 'সুবিধাগুলিই' যেন পর্যটন কেন্দ্রটির স্বাভাবিক আকর্ষণের চেয়ে 'বেশি আকর্ষণীয়' না হয়ে ওঠে।

৪। পরিবেশ ও প্রতিবেশই ইকোট্যুরিজমের মূল উপজীব্য। ভোক্তা এবং সরবরাহকারী যেমন খুশি ও যখন খুশি তাকে বদলাতে পারে না। একজন পর্যটক ও ব্যবস্থাপককে এই শর্তটি মেনেই আসতে হবে।

৫। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও বিকাশ হল ইকোট্যুরিজমের একটি অন্যতম সংকল্প। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে ন্যূনতম সংহতি এবং এদের ন্যূনতম আয়ু জোগাতে পারে না যে পর্যটন—তা, আর যা-ই হোক ইকোট্যুরিজম্‌ নয়।

৬। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি এবং মুখোমুখি পরিচয় হল ইকোট্যুরিজমের অন্যতম লক্ষ্য। চলচ্চিত্র এবং চিড়িয়াখানা এই অভিজ্ঞতা দিতে পারে না এবং তা ইকোট্যুরিজমের কর্মসূচির আওতায় পড়ে না।


দুরন্ত নদীতে র‍্যাফটিং

৭। মনন ও অনুভবের তৃপ্তি হল একজন ইকোট্যুরিস্টের সবচেয়ে বড় চাহিদা।

৮। ইকোট্যুরিজমের 'পর্যবেক্ষণ', 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' ও 'উদ্ভাবনী মূলক ব্যবহার ও পরিবর্তন'-এর সুযোগ রয়েছে স্থান বিশেষে।

সেই হিসেবে ইকোট্যুরিজমের ঐতিহাসিক সূত্রপাত সুনির্দিষ্টভাবে কবে হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয়, ১৮৯৯ সালে বার্লিনবাসী ত্রিশ বছরের যুবক Alexander Von Humboldt যখন পৃথিবীর বিষয়ে জানতে ৬০০০ মাইলের লম্বা সফরে বেরিয়ে পড়লেন তখন থেকেই নিশ্চিত হল ইকোট্যুরিজমের জন্ম নেবার ঘটনাটি। 'পিজারো' রণতরীতে চেপে স্পেনীয় উপকূল ধরে দক্ষিণ আমেরিকার (তৎকালীন স্প্যানিশ আমেরিকা) দিকে যেতে যেতে বিস্মিত Humboldt মন্তব্য করেন 'আমি জানতে চাই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানগুলি কিভাবে একে অপরের ওপর কাজ করে। জানতে চাই প্রকৃতির ভারসাম্যের রহস্য।' তিনি বিশ্বাস করতেন খনিজ, পাথর, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মনুষ্যজগৎ এদের ভেতরে ফল্গুধারার মতো নিয়ত প্রবহমান এক গভীর অন্তর্লীন সম্পর্ক। তিনি লক্ষ করেন, প্রাণের যে বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ, তাদের নিজেদের মতো করে জোট বাঁধা—এ সবের পেছনে কাজ করে পরিবেশের কিছু ভৌত উপাদান যার আবহাওয়া ও ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থানগুলি জানা দরকার। এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকেই সাধারণ্যের মধ্যে চারিয়ে দিতে সমসাময়িক পর্যটকদের মধ্যে তিনি শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত 'Campaign' 'Purposeful Travel'। কালক্রমে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় ইকোট্যুরিজমের আধারশিলা। বিগত ২০০ বছরে পর্যটনের জোয়ার যত বেড়েছে তত বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ইকোট্যুরিজমের প্রয়োজনীয়তা। কিউবা, মেক্সিকো, পেরুর INCA TRAIL, ভেনেজুয়েলা, চিলি, আর্জেন্টিনা, পূর্ব আফ্রিকা, আমাজনের অববাহিকা, নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট, শ্রীলঙ্কা গালাপাগস্‌ এসব জায়গায় চলছে ইকোট্যুরিজম সংক্রান্ত কৌতূহলোদ্দীপক কাজকর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব প্রকল্পগুলির চিন্তা-পদ্ধতি-সমস্যা-সাফল্য—এসব কিছু নিয়ে ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও উৎসাহীদের মধ্যে আদান-প্রদান ও মতবিনিময়ের একটি স্থায়ী মঞ্চ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বার্লিংটন-এ প্রায় আড়াই দশক আগে তৈরি হয়। 'THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY' (TIES)। প্রায় আড়াই লক্ষ সদস্যের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট 'TIES' এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অমুনাফাভোগী তথা বেসরকারি ইকোট্যুরিজম্‌ সংক্রান্ত সমিতি।



রিশপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা—দুর্গম স্থানে তাঁবুতে থেকে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখার অনবদ্য সুযোগ

ছবি লেখক

(খ) ভারতে ইকোট্যুরিজম্ নিয়ে কী হচ্ছে ?

এককথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীব-প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ঈর্ষণীয় রকম সমৃদ্ধ এই দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র হলেও, এ ভারি আজব দেশ! এখানে 'উন্নতি' ও 'উন্নয়ন'-এর পথ ও পন্থা এখনও নির্ধারণ করে আমলাতান্ত্রিক অচলায়তন! প্রথমত স্রেফ 'শিল্প (INDUSTRY)'-র মর্যাদা পেতেই পর্যটনকে মাথা ঠুকতে হয়েছে এর-ওর দোরে। তদুপরি রয়েছে পর্যটন ব্যবসার সাংবাৎসরিক লেনদেন ও পর্যটন সংক্রান্ত সরকারি নীতিনির্ধারণের ওপর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির 'বড়দাসুলভ' মনোভাব বা খবরদারি তথা মাৎস্যন্যায়। 'অন্তর্গামী (INBOUND)' পর্যটন ব্যবসার লগ্নি ও লেনদেনের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে দিল্লি ও মুম্বাই ভিত্তিক সিন্ডিকেট। পর্যটন ব্যবসা থেকে সৃষ্ট আয়ের Channelisation-ও নিয়ন্ত্রণ করে এই বৃহৎ সিন্ডিকেট বা বণিক সভাগুলি, তৈরি হয় উন্নয়ন ও আয়ের অসম ও একপেশে বণ্টন-ব্যবস্থা। 'লে'-তে 'সিন্ধুদর্শন উৎসবের' উচ্চকিত কলরোলে চাপা পড়ে যায় উত্তর-পূর্বের সপ্তদুহিতা ও তাদের একমাত্র সহোদর সিকিমের রাতের আহ্বান। বিষণ্ণ প্রদীপ জ্বেলে সে এক অনন্ত প্রতীক্ষা তাদের, অতিথিকে বরণ করবে বলে! অতি সীমায়িত বাজার, ততোধিক সীমায়িত মরসুম! অতএব শুরু হয় এক টুকরো খাবার নিয়ে কয়েক হাজারের এক অনিঃশেষ, পরিণতিহীন, মরণপণ যুদ্ধ! পরিষেবার মান ও দাম নেমে আসে এক বিপজ্জনক বিন্দুতে। তবু, হ্যাঁ, আশার কথা তবু—এসব সমস্যাকে যুঝতে যুঝতে ভারতে ইকোট্যুরিজমের নান্দীমুখ হয়েছে যতটুকু তা কেবল বেসরকারি স্তরে ক্ষুদ্র পর্যটন সংস্থার উদ্যোগেই!

(গ) পশ্চিমবঙ্গে ?

সুনির্দিষ্টভাবে এখনও পর্যন্ত তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়! বিক্ষিপ্ত ও স্বল্পমেয়াদি দু-একটি উদ্যোগ ছাড়া। মূল কারণ বিকল্প আর্থিক উন্নয়নের উপায় হিসেবে পর্যটনকে একটি ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ 'প্রযুক্তি' হিসেবে গ্রহণ করতে। 'অমুনাফাভোগী বেসরকারি সংস্থা (NGO)' ও তৃণমূলস্তরের সরকারি Agencyগুলির (যেমন পঞ্চায়েত, জেলাসমিতি) অহেতুক অনীহা ও সন্দিগ্ধতা। মনে রাখা দরকার—এ ব্যাপারে ভগীরথের ভূমিকা পালন করতে পারে এই রাজ্য। এখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ও বিকেন্দ্রায়িত এমন একটি সরকার রয়েছে যার গণমুখীনতা ও সংবেদনশীলতা নিয়ে সংশয় নেই! চাই একটু সাহস, ধৈর্য, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মুক্তমনা দৃষ্টিভঙ্গি, শুধু বলবার নয়—একটু শোনারও ইচ্ছে, সঠিক তথ্য আহরণের জন্য—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে চা-কাজুবাদামের পরিবহ ছেড়ে আপাত কষ্টকর গুটিকয়েক ক্ষেত্র সমীক্ষার উদ্যোগ, পেশাদার মানেই অমানুষ নয়—এই সত্যটিকে বুঝে একটু পেশাদার হবার চেষ্টা।

আমাদের আছে বিশ্বের বৃহত্তম ও একমাত্র শ্বাপদসঙ্কুল বাদাবন তথা ব-দ্বীপ 'সুন্দরবন', পূর্ব-হিমালয়ের 'সুন্দরীশ্রেষ্ঠা' কাঞ্চনজঙ্ঘা, মল্লরাজাদের কীর্তিস্নাত বিষ্ণুপুর, অনাঘ্রাতা ডুয়ার্স, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব 'সিরাজ-উ-দ্দৌলার' মুর্শিদাবাদ, 'বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম'-এর উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' (শ্রদ্ধেয় ডঃ নিমাইসাধন বসুর ভাষ্যে যা আজ এক 'ভগ্ননীড়'), ভারতের জীবনরেখা 'গঙ্গানদী', বাংলার বাউল-পটচিত্র-রেশম-গালা-পোড়ামাটি-যাত্রাগান-দুর্গাপুজো-ভাসান-আলকাপ-গম্ভীরা-ভাওয়াইয়া-টুসু-ভাদু-বহুরূপী ইত্যাদি কত কি! ঘরের কাছে বজ্রড্রাগনের দেশ ভুটান, পদ্মা-মেঘনার বাংলাদেশ, বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'বর্মামুলুক', তুষারসিংহের পদতলে বিচিত্রবিদ্যার দেশ 'নেপাল'। কবে আমাদের চোখ খুলবে? ইকোট্যুরিজমের এই সাজানো প্রসূতিঘরে পড়বে মার্কণ্ডের প্রথম রেখা? প্রতিবেশী এই দেশগুলিকে নিয়ে যদি তৈরি হতে পারে SAARC, তবে কেন নয় সমগোত্রীয় একটি জোট-ইকোট্যুরিজম নিয়ে, বিশেষত সমস্যার চরিত্র যখন সকলেরই প্রায় এক? এবং তা 'What Bengal thinks'-এর বিভায় সমুজ্জ্বল পশ্চিমবাংলার নেতৃত্বে ও উদ্যোগে? পর্যটনসংস্থা ও ব্যবস্থাপকদের কাজ হোক সেতুবন্ধনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের।

(ঘ) কেন ইকোট্যুরিজম জরুরি, বিশেষত ভারতে ?

- প্রবল বেরোজগারি ও জনসংখ্যাস্ফীতির চাপে জর্জরিত এই দেশে বিকেন্দ্রায়িত ও স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার একটি সার্থক ও ফলিত পরিবাহক হিসেবে যো নেই এর!
- কেবল সরকারি সংস্থা ও Funding Agencyগুলির অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভারতের মতো একটি বহুবিচিত্র ও বর্ণময় উপমহাদেশের মহান জীব ও সাংস্কৃতিক

সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ইকোট্যুরিজম্ sustainable আয় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটি স্বয়ংক্রিয় conservation system এর মধ্যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে, তার উল্লেখযোগ্য ও চিরাচরিত সম্পদগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার স্বাভাবিক প্রণোদনা জোগাবে।

- সিঙ্গাপুর, চীন, কোরিয়া-র মতো উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুকরণে বৃহৎ পুঁজিনির্ভর পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা এ দেশে কম। এসব জায়গায় সাততারকা খচিত হর্ম্যসদৃশ সরাইখানা, বিভাগীয় বিপণি বা রাস্তাঘাট-উড়ালপুল গড়ে ওঠে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড-এ ঠাঁই পাবার মতো দ্রুতগতিতে—যেখানে পর্যটন অর্থনীতির এই হিসেবি সমীকরণ প্রকৃতি-প্রতিবেশ বা সংস্কৃতি বা তার সঙ্গে জড়িত মানবসম্পদকে কতটা অক্সিজেন জোগাচ্ছে তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা কিনা আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যবস্থাপনা যার মূল লক্ষ্য হল বিনিয়োগ বা পুঁজির মুনাফা সর্বাধিককরণ। প্রসঙ্গত, মাসাইমারা ফেরত এক বন্ধুস্থানীয় বাঙালি পর্যটকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'আফ্রিকান সাফারি'তে তদগত এই বঙ্গসন্তানের দেশে ফিরে বক্তব্য ছিল 'এমনটা ভাবিনি ! আমাদের দেখেই একদল ছেলে-বুড়ো হঠাৎ ঢোল পিটিয়ে ধেই ধেই নাচতে শুরু করে দিল।' সঙ্গী স্মিতহাস্য গাইডটিকে লক্ষ করে তাঁর ধারণা হয় "এ ব্যাটা আসলে ঘটাবরদার। ও-ই ঠিক করে কে কখন নাচবে, থামবে কখন !"
- 'লাক্সারি'-র সোনার হরিণ নয় 'এক্সপিরিয়েন্স'-এর মাটির প্রদীপটিকেই দীপ্যমান রাখা—ভারতীয় পর্যটন শিল্পের এই প্রাণভোমরাটিকে চিনে নিতে আর কত বিলম্ব করব আমরা !
- জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্ষেত্র বা হিমালয়ের প্রসঙ্গ এসেই যায়। বন্যপ্রাণী ও বনসংরক্ষণ আইন মোটামুটি চালু হবার পরই আমাদের দেশের বন ও বনসম্পদ নির্ভর আদিবাসীদের অর্থনীতিতে নেমে আসে বিপর্যয়। কাঠ, শুকনো কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ফল-পাকুড়-পাতা ইত্যাদি যারা আহরণ করত, কোনক্রমে দুবেলা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সেই অরণ্যচারীদের কথা ছেড়েই দিন ! অবস্থা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে খোদ বনদপ্তরকে 'LOGGING' ছেড়ে 'LODGING'-এর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে বেশি ! আর অরণ্যনির্ভর আদিবাসীরা ! নিরুপায় হয়ে হয় কাঠ চুরি বা চোরাশিকার-এর অন্ধকার আবর্তে তলিয়ে যেতে বাধা কোথায় ? অরণ্য এতদিন ধরে জোগাত বাঁচার রসদ ! এখন কে জোগাবে তাদের SOCIAL PROTECTION ? একমাত্র ইকোট্যুরিজম্ ফিরিয়ে দিতে পারে তাদের সেই আত্মনির্ভরতা, সে অরণ্য !
- এই অংশটি নিবেদিত থাকল তাঁদের প্রতি যাঁরা এ নিয়ে উদ্দীপক বিতর্ক চান এবং আলোচ্য বিষয়টির ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করতে আগ্রহী।

(ঙ) আন্তর্জাতিক ইকোট্যুরিজম্ বর্ষ-২০০২ (IYE), আমাদের ভূমিকা ?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থারা 'আন্তর্জাতিক নারী-শিক্ষা-শিশু-অনাহার-সাক্ষরতা-ভাষা' ইত্যাদি বর্ষগুলি নিয়ে যতটা আগ্রহী বা অবহিত ছিলেন, ততটা IYE নিয়ে নয় ! অনেকের কাছেই, এটাও অজানা যে ২০০২ সাল INTERNATIONAL YEAR OF MOUNTAINS-ও বটে ! UNESCO এবং THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY-র যৌথ উদ্যোগে ২০০২ সাল জুড়ে বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রচারসূচি তৈরি হয়েছে তাতে অদ্যাবধি 'উজ্জ্বল অনুপস্থিতি' ভারতের ! উদ্যোক্তা সংস্থাদের যে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে ব্যথিত ও বিস্মিত করেছে তার প্রমাণ এই প্রতিবেদকের কাছে আছে।

'কদাপি নয়-এর চেয়ে, দেরিতে ভালো' এই আপ্তবাক্যটিকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়ার সময় হয়েছে !

- NGO-রা ভাবুন।
- পর্যটকরা আসুন।
- প্রচারমাধ্যম সাহায্য করুন।
- TRAVEL AGENT-রা সচেতন হোন।
- TAAI, IATO, TAFI, CII, BCCI, FICCI-রা ঘনঘন ৫ তারা হোটেলে খানাপিনা আলোচনা আপাতত মুলতুবি রেখে IYE নিয়ে কোমর বেঁধে নামুন।
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বন, পর্যটন, বিজ্ঞান ও কারিগরি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিল্প, কারিগরি মন্ত্রক হাত মেলান।
- "প্রত্যেক রাজ্যে অন্তত একটি সফল ইকোট্যুরিজম গন্তব্য !" ২০০২ সালে এটি তেমন কোনও অসম্ভব যোজনা নয় !

শেষ করি, ১৮৫৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন পিয়েরসকে লেখা আমেরিকান ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত স্যুয়ানিশ্ উপজাতিদের মোড়লের লেখা এক মর্মস্পর্শী চিঠি দিয়ে

'মাথার ওপরে ওই নিঃসীম নীলিমা কি কেনা-বেচার বস্তু ? অথবা এই মৃত্তিকার ওম্ ? এই সুমলয়, এই জলের ঝিকিমিকি ! আজও এসবের মালিক তো আমরা নই ! এসব বেচব কোন সুবাদে ? এই ধরিত্রীর প্রতিটি অংশ আমার ! আমার লোকেদের কাছে পূত ! শীর্ষালোকিত প্রতিটি পাইন, তাবৎ বেলাভূমি, সবুজ বনান্ধকারের গায়ে লেপ্টে থাকা প্রতিটি কুয়াশাবিন্দু, এইসব ঝিঁঝিপোকা আর পতঙ্গের ঐকতান আমাদের কাছে এক পবিত্র, সুমহান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা হয়ে বেঁচে আছে—থাকবে ! স্তব্ধ রাতে নিশাচরের মায়াবী কান্না, পুকুরে না-ছোড়-বান্দা ভেক-এর ক্লান্ত সওয়াল-জবাব—এইসব শুনতে পাবে না মানুষ ? কি লাভ তবে বেঁচে থেকে ? বৃষ্টিভেজা পাইনের মাতাল গন্ধে ভরপুর মধ্যরাতের ফিসফিসে হাওয়া—লাল মানুষদের কাছে এ বড় দামি ! যেদিন পৃথিবী থেকে শেষ রেড ইন্ডিয়ান মানুষটিও মুছে যাবে, বিস্তীর্ণ চারণভূমির ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া একখণ্ড উদাসী মেঘের ছায়ায় ছায়ায় কেবল তার স্মৃতি—সেদিনও এই সৈকত, এই অরণ্য আমাদের আত্মাকে বুকে আগলে রাখবে !"

শিশিরে সূর্যের মুখ

উৎপল চক্রবর্তী

সারা পৃথিবী পর্যটন করে মায়ের কোলে ফিরে এসে দেবকুমার কার্তিক দেখেছিলেন তাঁর ঢের আগেই তস্য ভ্রাতা গণেশ সেই স্থানটি অধিকার করে নিয়েছেন। অবিশ্বাস্য এই দ্রুত সিদ্ধিলাভের কারণ সিদ্ধিদাতাকেই জিজ্ঞেস করলে সবিস্ময়ে শোনেন, গণেশ কোথাও যাননি, তাঁর 'মা'কেই প্রদক্ষিণ করেছেন মাত্র। ওই 'মা'ই তাঁর পৃথিবী। সর্বরূপা সনাতনী, জগদ্ধাত্রী। সর্বসিদ্ধি স্বরূপিনী।

গল্পটি আমাদের জানা। এর মর্মকথাটি জীবনানন্দ একটি বাক্যে সংহত করেছিলেন—'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'।

এই বাংলাই আমার মা। আর ওই বিশ্বরূপ দর্শন যেন ওই মায়েরই প্রচ্ছন্ন মহিমা!

প্রখ্যাত ইতিহাস-গবেষক মানিকলাল সিংহ একবার তাঁর হাতের খোলামকুচি দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, এই ফলকটি থেকেই তুমি সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে নিতে পারবে। কোথাও যাবার দরকার নেই! বিস্মিত প্রশ্নাকুল আমাকে বুঝিয়েছিলেন তিনি, এর গায়ে যে রেখাচিত্র, এর যে গঠন-বৈচিত্র্য তার অনুসন্ধানেই এবং চরিত্র নির্ণয়েই ধরা পড়বে বিশেষ সময়ের বিশিষ্টতার চিহ্ন। এই খোলামকুচি সভ্যতার একটি পর্বের প্রতীক। তারই প্রতিক্রিয়া পরিব্যাপ্ত পরবর্তী প্রসারিত সময়ে।

উপরোক্ত একটি গল্প এবং একটি ঘটনা; অতএব, একথা প্রমাণ করে, আমাদের অভীষ্টকে আমরা খুঁজে পেতে পারি দুয়ার হতে অদূরেই, যদি উদ্দেশ্য থাকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকে সুজ্ঞাত সর্বোপরি থাকে মনজোড়া ভালোবাসা যা তুচ্ছকেও করে সমুচ্চ, সামান্যতেও আনে অসামান্যের আভাস। যার স্পর্শে মূল্যহীন কাঁচেও প্রতিবিম্বিত হয় অমূল্য হীরক দ্যুতি। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি—এমন একটি বঙ্কিম কটাক্ষে আমরা পরিচিত। বাঙালি আত্মঘাতী—এমন উত্তর-আধুনিক অভিধাও আমাদের অপরিচিত নয়। এর সঙ্গে বোধহয় যুক্ত করা চলে পরানুকরণপ্রিয়তা এবং আমাদের যা আছে তা সবই খারাপ, অপরের সবই ভালো—এই মাত্রাতিরিক্ত নির্বোধ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ আস্থা! এ সবেরই যোগসাজশে যে মারাত্মক সর্বধ্বংসী ঘটনাক্রম ক্রমাগত—তার এক একটি হল বাংলাভাষার প্রতি অবমাননা, বাঙালির নিজস্ব পোশাক পরিত্যাগ, বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা লোক দেখানো বিজ্ঞতা, বাংলা গানের শ্রোতার সংখ্যাহ্রাস, বাংলাসাহিত্য পাঠে অনীহা এবং বাংলার প্রকৃত রূপ দেখার প্রতি তীব্র অনাসক্তি—। কখনও ঘোর রবে, কখনও কম্পিত কণ্ঠে আবেগাপ্লুত উচ্চারণে—বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি এই কবিতার উচ্চারণ তবু কানে আসে এই কারণে যে আর যে গুণ (!)গুলি যোগ করতে ভুলেছি তা হল বড় বেশি হুজুগপ্রিয় এবং দেখানো ব্যবসায় বাঙালি অতি পটু। শূন্যগর্ভ আত্মগর্বী। সবজান্তা।

বাঙালি ভ্রমণপ্রিয় এমন একটি প্রচারের বাণী ইদানীং ক্রমসোচ্চার। এ যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। কিন্তু উপরোক্ত বাঙালি চরিত্র লক্ষণ প্রায় সর্বাংশে সত্য মনে হবে যখন তথ্য জানাবে ভ্রমণযোগ্য স্থান হিসেবে বাঙালি প্রায়শই বাংলাকে বেছে নেয় না। 'ওই লোক দেখানো'র প্রয়োজনে হিল্লিদিল্লির নাম করে, বাংলার কোন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম বললে 'প্রেষ্টিজ' যায়। এবং যে শূন্যগর্ভ আত্মগর্বের কথা লিখেছিলাম তাও প্রকট হয়ে ওঠে এভাবেই। আসলে সবজান্তাভাব দেখালেও বাংলার আদ্যন্তের সহজপাঠটুকুও তো অনেকের নেই। বাংলার উত্থান-পতনের চমকপ্রদ ইতিবৃত্তও আমরা অনেকেই জানি না। ঐতিহ্যময় অনেক জায়গা আজও নীরবে নিভৃতে আত্মগোপনে। কত ইতিহাসগর্ভ প্রান্তর কৌতূহলী পর্যটকের পদসঞ্চারের প্রতীক্ষায়। কত ভাঙা মসজিদ, মন্দির, দুর্গপ্রাকার, প্রাসাদের জীর্ণ অবশেষ হাহাকারে ভরিয়ে রেখেছে নির্জন হাওয়া। দিঘির অতল জলে লুকিয়ে আছে কত কাহিনী। বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কিংবদন্তির গল্প—এ সবের অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই বলে কোনও আকর্ষণই বোধ করে না বাঙালি পর্যটক বাংলা দেখার। ঠিক তেমনই, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ সৌন্দর্যের কাঙাল পর্যটক বিজ্ঞাপনে-বিখ্যাত জায়গাগুলিই দেখতে যান, কিন্তু বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কত যে অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যের মায়া—সে খবর কতজন রাখে। একথা অবশ্যমান্য, যে খবর রাখার দায় যেমন পর্যটকের, তেমনই খবর দেবার দায়িত্বও পর্যটন দপ্তরের। ওই দপ্তর সে-কাজ কিভাবে করেন বা করতে পারেন এ নিয়ে সেমিনার হতেই পারে। কিন্তু জরুরি যা তা হল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এখন সে প্রসঙ্গটিতে যাবার আগে আরও জরুরি কিছু বিষয়ের আলোচনা জরুরি।

যেমন, যে কথা আগে লিখেছি, বাংলার সম্যক পরিচয় জানা। এ বিষয়ে গভীর তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানীরা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কৃত তার সংক্ষিপ্তসার পড়তে পারেন। বাংলায় ভ্রমণ নামক তথ্যপূর্ণ, অথচ রম্যভ্রমণ কাহিনী সংবলিত বইটি বা রম্যাণি বীক্ষ্য জাতীয় ভ্রমণ কাহিনী অবশ্যপাঠ্য। ব্যক্তিগতভাবে

আমি ভ্রমণে প্রাণিত হয়েছি সুবোধ ঘোষের 'কিংবদন্তীর দেশে' বইটি পড়ে। বস্তুত বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরের বাতাসে ভেসে বেড়ানো অসংখ্য কিংবদন্তি বা লোকবিশ্বাসের গল্প এবং তারই স্মারক হিসেবে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কোনও প্রত্নচিহ্ন এক কল্পনার মায়াময় পৃথিবীতে নিয়ে মুহূর্তে।

হয়তো কিছুই নেই দেখার, রয়েছে জল টলটল তালপুকুর। কিন্তু ওই পুকুরের পাড়ে ছুটোছুটি করা বাতাসে ভাসে এক অদ্ভুত গল্প। নিষ্ঠুরতা আর করুণায় গড়া সেই গল্পের স্পর্শে মৃদুমন্দ ঢেউ তুলে ওই দিঘি জানায় এইখানে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ছিল বন্দীশিবির। সুলতানের আদেশে বন্দীরা চোখের সামনে দেখত ওই তৃষাহর পুকুরের জল কিন্তু তাতে বিষ মিশিয়ে পানের অযোগ্য করে রাখা হয়েছিল। তৃষ্ণায়, পিয়াসায় ছটফট করতে করতে বন্দীরা মারা যেত। ওই দিঘির নাম তাই পিয়াসবাড়ি দিঘি ! সম্রাট আকবরের আমলে এই নিষ্ঠুর প্রথা রদ করা হয়।

হয়ত নিছক গল্পই এটা। অথবা সত্য আর কল্পনার অর্ধনারীশ্বর। কিন্তু পর্যটক যদি এ গল্পটি জেনে ওই দিঘির ধারে দাঁড়ান—এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে তাঁর মন আচ্ছন্ন হবে। তাঁর ভ্রমণ অন্য মাত্রা পাবে। পর্যটকের দায়িত্ব এই জেনে নেওয়াটুকু। এবার পর্যটন দপ্তর যদি ওই পুকুরের চারপাশ ঘিরে বসার জায়গা করে দেন, কিছু সুরভিত রঙিন ফুলের সমারোহ, একটি সাময়িক খাবারের দোকান—আর ওই দিঘির জলে নৌকোবিহারের ব্যবস্থা—পর্যটকের আগমন ঘটবেই সেখানে। জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদের মাধ্যমে অনায়াসে এটা করতে পারেন। সারা বাংলায় এমন গল্পমুখর স্থানের প্রাচুর্য অনুসন্ধিৎসুর মনে বিস্ময় জাগাবে।

মালদহ শহর থেকে যে জাতীয় সড়ক চলে গেছে শিলিগুড়ির দিকে সে পথের প্রায় এগারো মাইল দূরে যে কোনও যাত্রীরই দৃষ্টিই থমকে যাবে বাঁহাতি কতকগুলো প্রত্নচিহ্ন দেখে। যাঁরা জানেন তাঁদের মনে পড়বে এ হল ইলিয়াসশাহী সুলতানদের এক একটি স্থাপত্যকীর্তির ভগ্নাবশেষ—ওই পাণ্ডুয়া, ওই আদিনা মসজিদ। পর্যটক মাত্রই মনে রাখেন, বাংলার ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মানচিত্রে স্থান দুটির গুরুত্ব। কিন্তু তাঁরা জানতেও পারেন না ওই আদিনা মসজিদের উলটো দিকের রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা গেলে সুলতানদের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে আর আছে এক আশ্চর্য নির্মাণকৌশলের শেষ সাক্ষীর মতো এক স্নানাগারের কঙ্কাল। দিল্লির হাউজ-ই-শামসীর অনুকরণে এই স্নানাগার তৈরি করিয়েছিলেন ইলিয়াস শাহ। এ যেন স্পর্ধা আর ঔদ্ধত্যের এক নির্মাণ—এমন মনে করে দিল্লিশ্বর ফিরোজ শাহ ১৩৫৪-৫৫ সালে আক্রমণ করেছিলেন পাণ্ডুয়া। বাংলার সুলতান দশ হাজার ঘোড়া, পঞ্চাশটি হাতি আর দু লক্ষ পদাতিক নিয়ে প্রতিরোধ করেন দিল্লিশ্বরের অভিযান। এক লক্ষ আশি হাজার বাঙালি সৈন্যের মাথা সংগ্রহ করেছিলেন ফিরোজ শাহ মাথাপিছু একটি করে রূপোর টাকা খরচ করে। তবু যুদ্ধ জয় হয়নি তাঁর। দুর্ভেদ্য একতালা দুর্গ দখল করতে না পেরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সসৈন্যে। এ ঘটনা তেরশো বছর আগের। সেই টার্কিশ বাথ-এর ভগ্নাবশেষ আজও আছে। কিন্তু কজন এই ঘটনার কথা জানেন ? যদি জানতেন, যদি জানাবার ব্যবস্থা থাকত, তবে ওই পাণ্ডুয়ার আদিনা দেখে পর্যটক আসতেন এই স্নানাগার দেখতে, যার ভেতরে এখনও পোড়ামাটির জল সরবরাহ ব্যবস্থা, সাতাশঘরা দিঘি থেকে সুড়ঙ্গপথে রাজমহিষীদের যাতায়াতের পথ, স্নানের জায়গা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এই স্নানাগারের কাছেই আছে হরিণবন।

ওই রাজপ্রাসাদের সীমানা, ওই স্নানাগার, ওই হরিণবন ঘিরে চমৎকার একটি পর্যটন ক্ষেত্র হতেই পারে যদি পর্যটন দপ্তর, জেলা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগ নেন।

বাঁকুড়ার ছাতনা সর্বজনপরিচিত কবি বড়ু চণ্ডীদাসের অনুষঙ্গে। তাঁর পূজিত বাশুলিদেবীর মন্দির দর্শনে বহু পর্যটক আসেন। কিন্তু ওই মন্দির সংলগ্ন পুকুরের ধারে কজন যান ? যদিও এখন সেখানকার চমৎকার উদ্যান পথিককে ডাকে, তবু পর্যটক যদি জানতেন সেই আশ্চর্য গল্পটি। সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র, উদ্যানের চেয়ে ওই পুকুরের দিকে তাকিয়ে তিনি কল্পনায় দেখতে পেতেন দুটি রাঙা শাঁখা পরা হাত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। এমনই ডাক শুনতে পেয়েছিলেন এক শাঁখা বিক্রেতা, সুদূর হাটগ্রাম থেকে ছাতনায় এসে। ফুটফুটে একটি মেয়ে পুকুর ধারে বসে ডাকছে তাকে। শাঁখারি এগিয়ে আসে। মেয়েটির অনুরোধে দুটি রাঙা শাঁখা পেরিয়ে দেয় তার কোমল হাতে। মেয়েটি বলে তার বাবা দেবীদাস আছেন। দেবীদাসের ভাই চণ্ডীদাসও আছেন। তাঁরাই শাঁখার দাম দেবেন। শাঁখারি যায় দেবীদাসের কাছে। দেবীদাস অবাক হয়। তাঁর তো মেয়ে নেই। দেবীদাস আর চণ্ডীদাস পুকুরপাড়ে আসেন শাঁখারির সঙ্গে। কেউ কোথাও নেই। কী মনে হয় তাঁদের। করজোড়ে প্রার্থনা করেন, মা একবার দেখা দাও। পুকুর থেকে উঠে আসে দুটি রাঙা শাঁখাপরা হাত। আফসোস করেন দেবীদাস, তিনি বাশুলির পূজারি হয়েও যা দেখতে পাননি, একজন শাঁখারির ভাগ্যে তা ঘটেছে বলে !

এ হয়ত একটি বিশ্বাসের গল্প। কিন্তু পর্যটকের মন অবশ্যই আপ্লুত হবে ঘটনাটির সৌন্দর্যে !

এ জেলারই জোড়হিরার কাছে এক গ্রামে রয়েছে দুটি স্তম্ভিত পাথুরে মূর্তি। গল্প জানায়, এক চাষী চাষের ফাঁকে যখন খিদে পেয়ে অস্থির, তখন তার বউ আসতে দেরি করছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন খাবার নিয়ে এসেছে বউ, তখন রাগে অন্ধ হয়ে কোদালের আঘাতে তাকে মারতে গেলে বউয়ের ঘোমটা খসে যায়। চাষী দেখে সে তার বউ নয়, ভাদ্র বউ। দুজনেই স্তম্ভিত পাষাণ হয়ে যায়।

এমন কত ঘটনার কথা রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে বাংলার মাটিতে। কোনটা লৌকিক, কোনটি অলৌকিক। অলৌকিকের মায়াজাল ছিঁড়ে অন্তরালের সৌন্দর্যটুকুই পর্যটকের সঞ্চয়ের ধন। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা গ্রামে রয়েছে ঢপকীর্তনের প্রবর্তক কবি রূপঠাকুরের ভিটে। বর্ধমানে রয়েছে শের আফগানের সমাধি যাকে ঘিরে রয়েছে নারীলোভী এক সম্রাটের অস্ত্র ঝঞ্ঝনার শব্দ আর শোণিতাক্ত চমক। কোচবিহারের গোসানিমারীর মন্দিরের প্রদীপের আলো ছড়ায় যে একাগ্র সাধনার কাহিনী—তা সকলে জানেন না বলেই হাতে গোনা বহু উচ্চারিত কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাংলায় কিছু দেখার নেই বলে পর্যটকরা হতাশ হন।

আসলে, আগে যা লিখেছিলাম, অভীষ্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, এই দেশ সম্পর্কে

তন্নতন্ন জেনে নেওয়া আর সর্বোপরি ভালোবাসা—এ না থাকলে কিছু জানবই বা কেমন করে।

আমরা যখন ভ্রমণে বেরোই, তখন কতটুকু তা দেশ দেখার প্রয়োজনে, কতটুকু নিছক অভ্যাসে, কতটুকুই বা প্রেস্টিজের তাগিদে—তার বিশ্লেষণ সব সময় করি কি ?

না হলে কী নেই বাংলায় ? হিমালয় পর্বতের নয়নাভিরাম সমুন্নত মহান গাম্ভীর্য, সমুদ্রের বিস্তৃত সুগভীরতা, অরণ্যের ঘনসবুজ প্রাণময়তা, রুক্ষ প্রান্তরের ধূ-ধূ উদাসীনতা, নদীর কল্লোল— প্রকৃতি রসিকের হৃদয় মুগ্ধতার আবেশে মগ্ন হবেই। আর আছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, তার নীরব সাক্ষীর মতো বাংলার বুক জুড়ে ছড়ানো প্রত্নরত্নমালা—

কবি মধুসূদনের ভাষায় বিবিধ রতন। সেই রত্নখচিত বাংলা না দেখে, ওই কবিরই কথায়, 'তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ'—যদি কারোর চেতনায় এই আক্ষেপের বাণী বেজে ওঠে—সে হবে জাতি হিসেবে আমাদেরই দুর্ভাগ্যের দ্যোতক।

এ সব কথা লেখার অর্থ এই নয় যে, অতএব, ভ্রমণের আগে রীতিমতো তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে টিকিট কাটতে হবে। যে গল্পগর্ভ জনপদগুলির কথা লিখেছি—সেই সব কাহিনী অনুপুঙ্খ জেনে ব্যাগ নিতে হবে কাঁধে। তা নয়। আবার কিছুটা তাও বটে। কিন্তু জানব কী ভাবে ? জানাবেন কে ?

এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর পর্যটন দপ্তর। কিভাবে ? সে কথায় এবার।

শোনা গেছে, ভ্রমণার্থীরা সাধারণত কয়েকটি অভিযোগ করেন বাংলায় ভ্রমণের প্রসঙ্গ এলে।

১. যাতায়াতের অসুবিধে।
২. থাকা-খাওয়ার অসুবিধে। সুবিধে থাকলেও তা অত্যধিক খরচসাপেক্ষ।
৩. মাত্র কয়েকটি বিখ্যাত স্থান সম্পর্কেই তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য চিত্তাকর্ষক স্থানগুলি সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারে না পর্যটন দপ্তর।
৪. সব ছেড়ে দিয়ে পুজোর সময় কলকাতা দেখানোরও তেমন ব্যাপক আয়োজন থাকে না।
৫. বহিরাগত কেউ এলে কোথায় গেলে সব খবর জানা যাবে তার জন্য কলকাতার দুই মুখ্য প্রবেশপথে তেমন ব্যবস্থা নেই।
৬. বিভিন্ন জায়গায় থাকার জন্য বুকিং করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে। কোনও একটি জায়গা থেকে সব খবর পাওয়া যায় না।

এছাড়া হয়ত আরও অনুযোগ যোগ দিতে পারে। সমস্যাগুলির সমাধান তেমন জটিল বা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। যেমন—

১. পথঘাটের উন্নতির জন্য যে দপ্তর তার সঙ্গে পর্যটন দপ্তরের যোগাযোগ। যেটা সম্প্রতি হয়েছে।
২. সরকারি আবাসস্থলগুলি ছাড়াও বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা।
৩. শিক্ষিত গাইড প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে নিযুক্ত করা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এন জি ও) এ কাজের ভার নিতে পারে।
৪. পুজোর সময় বা ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসবের সময় নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যা ইদানীং করা হচ্ছে। বিখ্যাত মেলাগুলি যেমন, তালেশের মেলা, রামকেলির মেলা, বিষ্ণুপুর মেলা, বাণীপুর লোক উৎসব—ইত্যাদি দেখার ব্যবস্থা করা।
৫. হাওড়া, শিয়ালদা ও এয়ারপোর্টে ট্যুরিস্ট কর্নার করা যেখান গেলে নানা ধরনের খবর পাওয়া যাবে।
৬. কলকাতায় তথ্যকেন্দ্রে এবং জেলার সব তথ্যকেন্দ্রেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় সিট বুকিং ও খবরাখবর দেবার ব্যবস্থা করা।
৭. সর্বোপরি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, অরণ্য দপ্তর, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের সঙ্গে পর্যটন দপ্তর যোগাযোগ করে পর্যটন ঋতুতে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, হস্তশিল্প মেলা ইত্যাদির আয়োজন করা এবং বনবিভাগের বিভিন্ন সংরক্ষিত উদ্যানগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা।
৮. সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতেই পারে।

পর্যটন নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগও আজকাল কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। সেখান থেকে যাঁরা পাশ করে বেরোবেন তাঁদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষত, সরকারি ক্ষমতা যেখানে সীমাবদ্ধ, সেখানে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করলে সুফল মিলবে বেশি। আশার কথা, এই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এই পর্যটন বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তার সুফলে অদূর ভবিষ্যতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে, এই বাংলার মুখ দেখার আগ্রহ জাগবে—এমন বিশ্বাস করা যেতেই পারে।

৯. যে-সব ঐতিহাসিক জায়গা সুবিখ্যাত, যেমন মুর্শিদাবাদ, গৌড়, পাণ্ডুয়া, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি সেখানে পর্যটন ঋতুতে শব্দ ও আলোর সাহায্যে ইতিহাস বর্ণনা পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই এই দায়িত্ব নিতে পারে। হাজারদুয়ারির প্রাঙ্গণে, গৌড়ের বারোদুয়ারির প্রাঙ্গণে, আদিনা মসজিদের অঙ্গনে, বিষ্ণুপুরে রাসমঞ্চের সামনে এমন আয়োজন করা যেতে পারে।
১০. অখ্যাত স্থানগুলির বিবরণ অভিজ্ঞ পর্যটকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সাধ্যমতো ছোট ছোট স্বল্প খরচে ভ্রমণের স্থান হিসেবে সাজানো যেতে পারে। এক্ষেত্রেও বেসরকারি উদ্যোগ সহায়তা করবে।

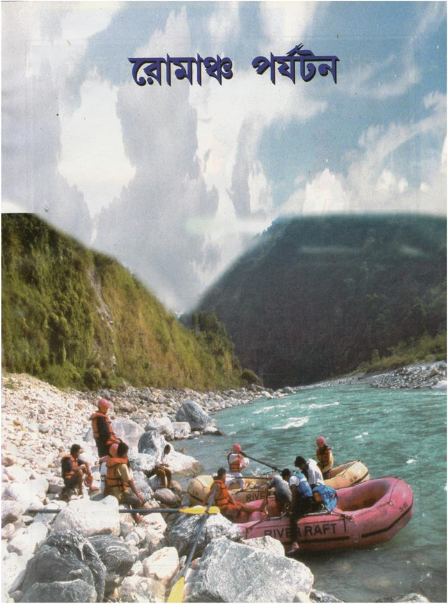
আসলে দরকার সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার। সেই উদ্যোগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই হল আশার কথা।

'আয় মন বেড়াতে যাবি'—এমন একটি আন্তরিক আহ্বান এক ভক্তকবির কণ্ঠে একদা উচ্চারিত হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষিতে। তেমনই আর এক কবি লিখেছিলেন, 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো।' সে-ও ভিন্ন প্রসঙ্গে।

কিন্তু এই দুটি উক্তিতে পর্যটকের ক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ করে একটি সঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানের সূত্রে বাঁধা যায় তাহলে আর এক কবির মতো সংহত বাক্যে আমরাও বলতে পারব, —বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যাই না আর—

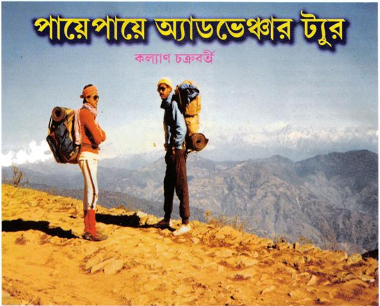
একটি শিশিরবিন্দুতে দেখব সৌন্দর্য সিন্ধুসূর্যের মুখ।

রোমাঞ্চ পর্যটন



পায়েপায়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর

কল্যাণ চক্রবর্তী



সান্দাকফু ট্রেকিং-এর পথে

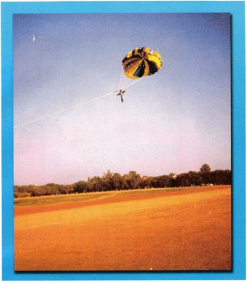
নেতাই কবিয়ালকে মনে পড়ে? নেতাই গান বেঁধেছিল ঠাকুরঝিকে নিয়ে। ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর। ঠাকুরঝি হয়ে উঠত কাশফুল। তার মাথায় থাকা চকচকে মাজা দুধের ঘটি হয়ে উঠত সোনার টোপা। সেই নিশানা টানত নেতাই কবিয়ালকে।

জন্মের পর এক অজানা নিশানা টানে আমাদের প্রত্যেককে। ভবঘুরের নেশা আমাদের জন্মগত। কোথায় পাব তারে। এই এষণাই আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ পালা থেকে সে পালা। অবশেষে নেতাই কবিয়াল শেষ গান শুরু করে 'জীবন এত ছোট ক্যানে'।

বাঙালি জাতির জীবনকাব্য নেহাৎ স্যাঁতসেঁতে নয়। দু'হাজার বছর আগে জাতটা ছিল দুঃসাহসী নাবিকের জাত। তাম্রলিপ্ত আর আশপাশের গাঙ্গেয় বন্দরগুলো থেকে ছাড়ত সপ্তডিঙা। সাত সমুদ্র, তেরো নদী পেরিয়ে চাঁদ-শ্রীমন্ত'র দল পৌঁছোত পৃথিবীর দূর-দূরান্তে। সমুদ্র-তুফান বোম্বেটেদের থোড়াই কেয়ার করত বাঙালি নাবিকের দল। অস্পষ্ট সেই অতীত বাংলা দেশকে সংস্কৃতিমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছিল। বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া রোমের কালো পালিশ করা মাটির পাত্রের গায়ে লেখা রয়েছে, 'হে পূর্ব বায়ু, প্রসন্ন হও, আমায় ভারতে নিয়ে চল।' বোলপুরের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাথরের সিলটি ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপ থেকে এসেছিল আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। অর্থাৎ দু' দেশের সম্পর্কের সময়কাল স্মরণাতীত। দেশবিদেশের মানুষ ভেসে আসত এই বাংলায়। নোঙর করত তাম্রলিপ্ত বন্দরে। বৌদ্ধ-জৈন যুগ, গুপ্তযুগ, পালযুগ পায়ে পায়ে পার হয়ে গেল।

অত্যুৎসাহী বাঙালি জাতির ইতিহাস তাই দুঃসাহসের কাহিনীতে ঠাসা। অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয়, যা কিছু রহস্যময় বাঙালির কাছে তাই আদরণীয়। তার অভিযাত্রীমন চিরাচরিত নিষেধের গণ্ডির বাইরে তাকে যেতে উৎসাহিত করেছে। অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রবৃত্তি বাঙালির উত্তরাধিকার। বাঙালি কোন কালেই ভিতু ছিল না, আজও নয়। অসাধারণ বুদ্ধি, সহিষ্ণু মনোভাব, সীমাহীন সাহস, বিপদকে আপন করে নেওয়ার প্রত্যুৎপন্নমতি জাতটাকে পর্যটনের বোধন সঙ্গীত শুনিয়েছে।

দাঁড়ান, ইতিহাসের ওপর চোখ রেখে নিজের ঢাকটা একটু পিটিয়ে নিই। আজন্ম আমি ভবঘুরে। ভারতবর্ষ তথা বাংলার মাটিতে সাড়ে তিন বছর পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরেছি। দেখেছি প্রায় সবকটি শক্তিপীঠ,



প্যারাসেলিং

পিলে চমকানো কুকাপ শ্মশান, ভয়াবহ বন্যা। লাদাখ থেকে ভুটান পর্যন্ত খাপছাড়া হিমালয়। নেপালের সমাজজীবন। পায়ে পায়ে সারা ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া।. উঁকি মেরে রাশিয়া এবং ভিয়েতনাম। এবার ঢাক পেটানোর কারণটা বলি। বাঙালির সব ভালর মধ্যে একটা মন্দ ভাল হল, নিজের প্রতি কম আস্থা। নামের পাশে ইয়া বড় বড় ডিগ্রি বা বিলেত ফেরত সুপারিশ বাঙালি চিন্তাশক্তিকে সতেজ করে। সে বোঝে না রোমাঞ্চকর কৃতিত্বের ভাগিদার হতে হলে অন্যের সুপারিশের প্রয়োজন নেই। হাজার হাজার বছরের অক্ষয় কীর্তিতে বাংলা অসাধারণ হয়েই আছে। শুধু গুছিয়ে রাখা, যৌথ উদ্যোগ এবং যৌথ কর্মসংস্কৃতির সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠতে পারি পর্যটনের শিখরে।

তরাই বনে পাহাড়ে, কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে, তিস্তার বুকে, তাহার নামটি রঞ্জনার মতো অসংখ্য নদীর শরীরে, দীঘার সমুদ্রতীরে, সুন্দরবনের বনবিবির জঙ্গলে, কোলকাতা-কোচবিহার বা চন্দননগরের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখতে দেখতে চলুন আবার ফিরেদেখা শুরু করি।

এই ফিরে দেখার একটা পোশাকি নাম দেওয়া যাক। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বা দুঃসাহসিক পর্যটন। ইকো ট্যুরিজম বা পরিবেশ সচেতন পর্যটন এর যমজ ভাই। বাংলাকে দেখার যেমন সুযোগ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দেখাবার সুযোগ। এই দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি করবে কর্মসংস্থানের। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান এইমাত্র যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জরুরি।

গুহাবাসী মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে দেখেছিল জীবজন্তুকে। এবং সেটা সে দেখেছিল মাটির ওপর হেঁটে। দেখেছিল জলকে। চেষ্টা করেছিল জলকে ডিঙোতে বা তার ওপর ভাসতে। টানটান চোখে চেয়েছিল আকাশের দিকে। অর্থাৎ মানুষের দুঃসাহসের পরিধি মাটিতে, জলে, আকাশে।

এ রাজ্যে দুঃসাহসিক পর্যটনের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখার ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

মাটিতে হতে পারে ঃ

(ক) ট্রেকিং (Trekking)—পথ বেপথ বা উঁচুতে হেঁটে ওঠা নিজের মালপত্র নিয়ে।

(খ) ক্যাম্পিং (Camping)—কোথাও দলবল মিলে একসঙ্গে থাকা।

(গ) রক ক্লাইম্বিং (Rock Climbing)—পাথর বেয়ে ওঠার রোমাঞ্চ।

(ঘ) স্পোর্ট ক্লাইম্বিং (Sport Climbing)—সম্পূর্ণ নতুন এই খেলাটিও বেয়ে ওঠা।

(ঙ) বার্ড ওয়াচিং (Bird Watching)—দেশি-বিদেশি পাখি দেখার আকর্ষণ।

(চ) হেরিটেজ ট্যুরিজম (Heritage Tourism)—প্রাচীন ইতিহাস এবং সৌধ দেখা।

জলে হতে পারে ঃ

(ক) পেডাল বোটিং (Pedal Boating)—পায়ে চাকা ঘুরিয়ে জলে ঘুরে বেড়ানো।

(খ) ক্যায়াকিং / ক্যানোয়িং / রোয়িং (Kayaking/Canoeing/Rowing)—বিশেষ ধরনের নৌকোয় জলে বেড়ানো।

(গ) ফিশিং (Fishing)—ছিপ ফেলে মাছ ধরা।

(ঘ) ওয়াটার স্কিইং (Water Sking)—দ্রুত জলযানের সাহায্যে আকাশে ওড়া।

(ঙ) প্যারা সেলিং (Para Sailing)—দ্রুত জলযানের সাহায্যে আকাশে ওড়া।

(চ) মোটর বোট (Motor Boat)—বিশেষ ধরনের জলযানে বেড়ানো।

(ছ) সেলিং (Sailing)—ছোট নৌকায় অবসরবিনোদন।

আকাশে হতে পারে ঃ

(ক) বাংগি জাম্পিং (Bungee Jumping)—আকাশ বা উঁচু জায়গা থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়া।

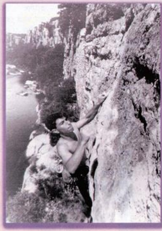
(খ) হ্যাংগ গ্লাইডিং (Hang Gliding)—ঘুড়ির মতন বিশেষ সরঞ্জামের সাহায্যে আকাশে ভেসে বেড়ানো।

(গ) বেলুনিং (Balooning)—বড় বেলুনের মধ্যে গ্যাস ভরে আকাশে ভেসে বেড়ানো।

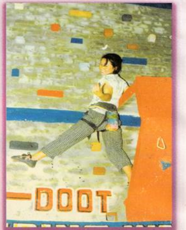
৮৮,৭৫২ বর্গ-কিলোমিটার জায়গার মধ্যে রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। দুঃসাহসিক পর্যটনের সুযোগও প্রচুর। সংক্ষেপে কোথায় কি হতে পারে দেখা যাক।

মাটিতে ঃ

(১) ক্যাম্পিং/ট্রেকিং—দার্জিলিং, ডুয়ার্স, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অভয়ারণ্য। এছাড়া গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোর প্যাকেজ।



শৈলারোহণ



গিরিদূতের স্পোর্ট ক্লাইম্বিং ওয়ালে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র এভারেস্ট বিজয়িনী মেয়ে কুন্সা ভুটিয়া

(২) রক ক্লাইম্বিং/স্পোর্ট ক্লাইম্বিং—শুশুনিয়া, মাঠা, দার্জিলিং, কলকাতা, চন্দননগর।

(৩) বার্ড ওয়াচিং—কলকাতার ভেড়ি-নলবন, খিদিরপুর ব্রিজ, সোনারপুর বাগান, কল্যাণী লেক, সাঁতরাগাছি, রায়গঞ্জ, সুন্দরবন অঞ্চল, পূর্বস্থলী।

(৪) হেরিটেজ ট্যুরিজম—বাংলার মুখ দেখার সুযোগ রয়েছে সর্বত্র। কলকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, ব্যাণ্ডেল, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, বিষ্ণুপুর। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

জলে ঃ

(১) এ রাজ্যের বড় ঝিলের সংখ্যা কম নয়। রয়েছে অসংখ্য নদী। জলপথে পর্যটনের বিস্ময়কর অগ্রগতি হতে পারে এ রাজ্যে। তিস্তায় র‍্যাফটিং-এর জন্য আসতে শুরু করেছেন দেশি-বিদেশি পর্যটকেরা। শুরু হতে চলেছে কলকাতা-চন্দননগর উইক এন্ড ট্যুর। সুন্দরবন নিয়ে চলছে পরিকল্পনা।

আকাশে ঃ

(১) বাংগি জাম্পিং-এর আদর্শ জায়গা হাওড়া ব্রিজ। সারা পৃথিবীর বাংগি জাম্পাররা হাজির হতে পারেন কোলকাতায়।

(২) হ্যাংগ গ্লাইডিং হতে পারে পুরুলিয়া বা উত্তরবঙ্গে।

(৩) বেলুনিং-এর পক্ষে বড় মাপের মাঠই যথেষ্ট।

প্রশ্ন হল, কাজের সুযোগ ঘটবে কেমন করে? পর্যটনের আদর্শ জায়গাগুলো চিহ্নিত করে ব্লক স্তরে যুবসমাজকে আহ্বান জানানো। সঙ্গে থাকবে প্যাকেজ পরিকল্পনা। সরকার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করবে। তৈরি করবে আকর্ষণীয় প্যাকেজ। তৈরি করবে স্থানীয় ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের প্যানেল। ব্যবস্থা করবে প্রচারের। এইমাত্র হোটেল তৈরি সরকারের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। সম্ভব নির্বাচিত বাড়িতে 'ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টের' পরিকল্পনা। বিশেষ বিশেষ বাড়ি চিহ্নিত করে ইচ্ছুক গৃহমালিকের বাড়িতে রাতে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে খাওয়া। ফলে সাধারণ মানুষের আয়ের সুযোগ বাড়বে। গড়ে উঠবে বিশাল পর্যটন নেটওয়ার্ক।

পৃথিবীর সব দেশে পর্যটন আজ লাভজনক ব্যবসা। এর জন্যে প্রয়োজন, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, স্থানীয় জনমত গঠন, যুবসমাজের মধ্যে পর্যটন শিল্প গড়ার ভাবনা এবং বাঙালির বিস্ময়কর অতীতকে তুলে ধরার চেষ্টা। সবশেষে থাকবে, বেনিয়া বুদ্ধি বা প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ।

সরকারকে যা করতে হবে ঃ

* Establish education and training programs.
* Provide Information Services.
* Establish guidelines and monitoring programes for the profession.
* Build an international network of travel agents and professionals.

কাটোয়ার মেলায় নেতাই কবিয়াল গান বেঁধেছিল, ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর। বাবুরা সেই গান শুনে দিলেন শিরোপা, সোনার মেডেল। কবিয়ালকে হারাবার পর ঠাকুরঝি আজও ঘুরছে গ্রামে গ্রামে। তার সঙ্গে দেখা হলে অনুগ্রহ করে বলবেন, কবিয়াল তার জন্যে সোনার মেডেল রেখেছে। সোনার মেডেল ঠাকুরঝিকে না দেওয়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি নেই।

ঠাকুরঝি যে তার মনের মানুষ।

ছবি সৌজন্য গিরিদূত



পায়ে পায়ে পৌঁছে যাই সান্দাকফু

লেখা ও ছবি– পিয়াল অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পর্যটন ক্ষেত্রের নাম সান্দাকফু (উচ্চতা ৩৬৩৬ মিটার) এবং সৌন্দর্যের বিচারেও সেরা। যে সব পর্যটকের শুধুমাত্র যানবাহন নির্ভর ভ্রমণে মন ভরে না, আবার খুব কঠিন চড়াই-উৎরাই ভেঙে পায়ে-পায়ে ভ্রমণও সম্ভব নয় তাদের জন্য উপযুক্ত ভ্রমণ এই সান্দাকফু। এখন অনেক পর্যটকই গোটা পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসেন এখানে। কারণ এখন সান্দাকফু পর্যন্ত জিপরাস্তা হয়ে গেছে।

কি কি দেখবেন এই পথে—পৃথিবী বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গগুলি যেমন এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাবুরু, পাণ্ডিম প্রভৃতি। এই সমস্ত বরফে মোড়া শৃঙ্গগুলোর ওপর দিনের বিভিন্ন সময় অপূর্ব আলোর খেলা, মেঘের আনাগোনা পর্বতপ্রেমীদের বহু বছর ধরে সম্মোহিত করছে। বহু বৈচিত্র্যের এই পথে পড়বে সিঙ্গালিলা অভয়ারণ্য, সুন্দর ছোট ছোট গ্রাম, ভাগ্য ভালো থাকলে বিরল পাণ্ডা, নানা প্রজাতির ফুল—এর মধ্যে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় তথা সকলের প্রিয় নানা রঙের রডোডেনড্রন সবাইকে মুগ্ধ করবেই। তবে পাহাড়ের ফুল-ফলকে দূর থেকে দেখাই ভালো। যতটা সম্ভব কম জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য আরও বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

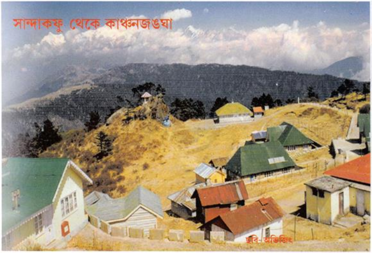
জুন-জুলাই-আগস্ট এই তিনটি মাস বাদে বছরের যেকোন সময়ই সান্দাকফু যাওয়ার জন্য উপযুক্ত। যদি বরফে ঢাকা সান্দাকফু দেখতে হয়, তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিই উপযুক্ত। প্রতি বছরই বরফ পাওয়া যাবে তা বলা যায় না। আবার যদি ফুলে ঢাকা সুগন্ধিত সান্দাকফু উপভোগ করতে হয়, মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্তই উপযুক্ত সময়।

কিভাবে যাবেন—কোলকাতা বা হাওড়া থেকে যেকোন ট্রেনে বা বাসে নিউজলপাইগুড়ি এবং সেখান থেকে জমজমাট শহর শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ড তেনজিং নোরগেতে পৌঁছে যান। এখানে দু'ভাবে আপনাকে পৌঁছে দেবে প্রথম গন্তব্যস্থল মানেভঞ্জনে এবং পরদিন এখান থেকেই হাঁটাপথে সান্দাকফু যাত্রা শুরু। প্রথমত, কার্সিয়াং-ঘুম হয়ে মানেভঞ্জন অথবা দার্জিলিং-ঘুম হয়ে মানেভঞ্জন। যাঁরা দার্জিলিং ভালোভাবে দেখে মানেভঞ্জন যেতে চান তাঁদের জন্য দ্বিতীয় পথ। যদি আপনারা পাঁচ-ছ'জনের দল হন তবে সরাসরি জিপ ভাড়া করে যাওয়াই ভালো, তাতে সময়ও বাঁচে অনেক। অথবা বাসে দার্জিলিং। দার্জিলিং গিয়ে সেখান থেকে মানেভঞ্জনের বাস ধরতে হবে। খেয়াল থাকা আবশ্যক যে সারাদিনে মাত্র তিনটি বাস যায়। একেবারে নেপাল সীমান্তের এই ছোট্ট গ্রামটি ভীষণ ভালো লাগবে। এছাড়া একটু ওপরেই আছে সুন্দর-শান্ত এক বৌদ্ধ গুম্ফা। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে আশপাশের এলাকা একটু ঘুরে দেখতে দেখতেই নেমে আসবে হিমেল সন্ধ্যা। এখানে একটি বাজার আছে। সেখান থেকে অতি প্রয়োজনীয় কিছু কিনে নিতে পারেন। প্রসঙ্গত জানানো দরকার মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু সব জায়গাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেস্ট হাউস আছে। টুরিজ্যম থেকে সেগুলি সংরক্ষণ করে নিলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এছাড়া বেসরকারি লজও আছে বেশ সস্তায়।

প্রথম দিনের গন্তব্য মেঘ্মা হয়ে টংলু। ১১ কিঃমিঃ সামান্য চড়াই রাস্তা। পথে

দার্জিলিঙে তিস্তা-চা-উৎসব (ইনসেটে পাহাড়ি শিশু) *ছবি লেখক*





সান্দাকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

ছবি অভিজিৎ দে

একটি নতুন বৌদ্ধ গুম্ফা পড়বে সেখানে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসুন মেঘমাতে। এখানে পাহাড়ের খাদের ওপর মেঘের খেলা সমুদ্রের মতো মনে হয়। সন্ধ্যা নামার আগেই পৌঁছে যাবেন টংলুর চোখ জুড়ানো সৌন্দর্যের পরিবেশে। যদি পূর্ণিমাকে ভ্রমণসঙ্গী করা যায়—তবে রাতের বেলায় সমস্ত উপত্যকাকে চাঁদের আলোয় স্নান করতে দেখবেন—যা আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।

পরদিন ভোরের সূর্যোদয়ের দৃশ্য আপনাকে সারাদিন তরতাজা রাখবে, ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবে। দ্বিতীয়দিন গৈরিবাস হয়ে কালপোখ্‌রি। এই ১৫ কিঃমিঃ রাস্তায় প্রকৃতির বৈচিত্র্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই। সারা রাস্তা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপ মাঝে মাঝেই চলার গতিরোধ করবে।

সমস্ত পথজুড়ে মনমাতিয়ে রাখবে মিষ্টি বুনো ফুলের গন্ধ। পাহাড়ের ঢালে নানারঙের ফুলের আবরণ এবং তার ওপর নানাবর্ণের প্রজাপতি মৌমাছিদের ভিড় দেখতে দেখতে পৌঁছে যান কালপোখ্‌রিতে। এখানে সুন্দর ছোট একটা পুকুর আছে, যার জলের রঙ মিশ্‌মিশে কালো এবং এজন্যই এখানকার নাম হয়েছে 'কালপোখ্‌রি'। এখানে পাহাড়ের খাদের ওপর মেঘের সমুদ্র ও তার ওপর সূর্যাস্তের নানারঙের আভা এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে। এখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার তীব্র বেগ রয়েছে। যার জন্য বাইরে বেশিক্ষণ থাকা কষ্টকর।

শেষের দিন মাত্র ছ'কিলোমিটার চড়াই পার করলেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান সান্দাকফুতে পৌঁছে যাবেন। ম্যাগনোলিয়া বনের মধ্য দিয়ে এই শেষের পথটুকু একটু কঠিন চড়াই এবং কষ্টকর মনে হবে। তাই খুব ধীরে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে যাবেন সান্দাকফু। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখবেন আপনাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট, পাণ্ডিম, মাকালু, কাবুরু, লোৎসে প্রভৃতি বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি। আপনাকে যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের রাজত্বে পৌঁছোনোর জন্য। অবশ্যই বলতে হবে এই দৃশ্যের জন্য আরো বহু পথ এখনি পাড়ি দিতে পারেন।

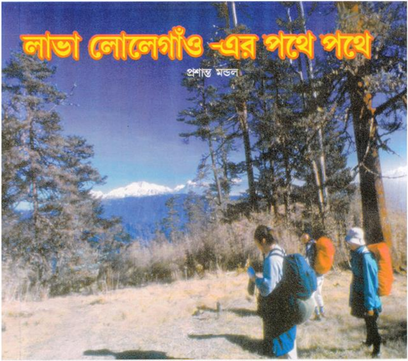
সান্দাকফুতে অনায়াসে দু'দিন কাটিয়ে দিতে পারেন। এখানে সারাদিনই প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন আপনাকে মুগ্ধ করবে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় রঙের খেলায় রূপসী হয়ে ওঠা বরফেমোড়া শৃঙ্গগুলি আপনার সমস্ত রুটিন ওলটপালট করে দিতে পারে। আপনার মনের কবিটি দু-এক কলি কবিতা লিখে ফেলবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এরপর ফেরার পালা। মন ভারী হয়ে যায়, তবু ফিরতে হবেই। অন্য একটা নতুন পথে ফেরা যায়। সান্দাকফু থেকে রিম্বিক হয়ে। তাতে বহু নতুন দৃশ্য চোখ ভরাবে। অথবা যে পথে যাওয়া সে পথেই ফেরা যেতে পারে। রিম্বিক হয়ে ফিরলে রিম্বিক থেকে দার্জিলিং যাওয়ার বাস পাওয়া যায়।

ফেরার সময় এক অদৃশ্য টান অনুভব করবেন—প্রকৃতির টান। কী নিয়ে এলেন আর কী যে রেখে এলেন—ফিরে এসে সেই হিসেব মেলাতেই বেশ কয়েকদিন কেটে যাবে। অর্থাৎ ফেরার পরও সান্দাকফু কয়েকদিন আপনার সঙ্গেই থাকবে।

লাভা লোলেগাঁও -এর পথে পথে

প্রশান্ত মন্ডল



লাভা লোলেগাঁও-এর পথে পথে হাঁটার অভিজ্ঞতাই স্বর্গীয়

ছবি লেখক

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

বহু পরিচিত রবীন্দ্ররচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই শুরু করতে হল। কারণ একথা সত্যি যে, আমাদের এই ভারতবর্ষের আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত একমাত্র অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আনাচেকানাচে পরিচিতির অভাবে এমন অনেক স্থান আজও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যা ভ্রমণপিপাসুদের কাছে আকর্ষণীয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

ধরা যাক লাভা-লোলেগাঁও-এর কথা। পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণ মানচিত্রে আজও সেভাবে জায়গা করে না নিতে পারলেও অভিযাত্রী বাঙালির কাছে বেশ পরিচিতি। আর ইদানীং প্রকাশিত কিছু ভ্রমণ বিষয়ক পত্রপত্রিকার দৌলতে কিছুটা পরিচিত ঘটলেও, আমজনতার দরবারে কিন্তু আজও সে স্বল্প পরিচিতির তালিকাতেই আসন অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ভাবতে বেশ অবাক লাগে, বহুল পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র 'দার্জিলিং' বা 'কালিম্পং'-এর এত কাছে, এই অনিন্দ্যসুন্দর স্থানগুলি আজও সঠিক প্রচারের অভাবে দুর্গমের ভ্রান্তি নিয়ে বিরাজ করছে। অথচ অতি অল্প আয়াসে, অল্প খরচে, যানযোগে, কলকাতা থেকে মাত্র ১৮/২০ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়।

যাঁরা পায়ে হেঁটে বা একটু অন্যভাবে বেড়াতে অভ্যস্ত, তাঁদের কথায় পরে আসছি। কিন্তু যাঁরা সাধারণভাবে স্থানগুলিতে পৌঁছে ঘুরে দেখে আসতে চান, তাঁদের উদ্দেশে জানাই—শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন সরাসরি চলাচলকারী একটিমাত্র বাসে চেপে ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই কালিম্পং হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় লাভায়। আর লাভা থেকে জীপে লোলেগাঁও, সেও ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রা। অথবা, শিলিগুড়ি থেকে সারাদিনে অসংখ্য কালিম্পংগামী বাসে চেপে কালিম্পং, তারপর জীপ যোগে পৌঁছে যাওয়া যায় লাভা। এছাড়া আরও একটি বিকল্প পথের সন্ধান আছে—শিলিগুড়ি থেকে দিনের

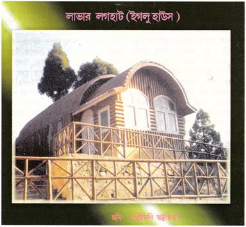
একটিমাত্র বাসে 'গরুবাথান' হয়ে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় লাভায়।

লাভাতে থাকা বা খাওয়ার জন্য বিশেষ অসুবিধা নেই। আছে বনবিভাগের বাংলো, সরকারি অতিথিশালা আর তার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বেসরকারি অতিথি নিবাস।

কিন্তু কেন যাব লাভায় ? প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চতায়, শিবালিক হিমালয়ের এই অনিন্দ্যসুন্দর জনপদটি সবুজ ও প্রাণোচ্ছল। মৌনি হিমালয়ের কোলে ছবির মতো তার অবস্থান। উত্তর-পূর্ব দিকে গা ছমছমে গহন অরণ্যে মোড়া 'নেওড়া ভ্যালি', গা শিরশির করা ঠাণ্ডা হিমেল পরশ, কখনও বা মেঘের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি। নির্জন বনানীর মাঝে পায়ে চলা পথ ধরে পদচারণা করতে করতে চমকে উঠতে পারেন নাম না জানা পাখির ডাকে। পাইনের সূচ্যগ্র পাতায় একটানা শিশ-দেওয়ার মতো হাওয়া কাটার শব্দ। মৃদু পদচারণায় ঘুরে দেখতে পারেন— আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি ছোট-বড় ঝরনা। এখানে নেই শহরের কোলাহল, অথবা গাড়ির শব্দ। নেই মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যবসায়িক মনোভাব। আছে গুম্ফা, আছে লাভা ওয়াটার রিজার্ভ ইত্যাদি। অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় ২/৩টি দিন—যদি তাড়া না থাকে।

চলে আসি লোলেগাঁও-এর কথায়। উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট। লোলেগাঁও পৌঁছোতে হলে, লাভাই সবথেকে সহজ সংযোগস্থল। ২২ কিমি রাস্তা জীপে চেপেই পৌঁছে যাওয়া যায় লোলেগাঁও। লোলেগাঁও-এ রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল— West Bengal Forest Development Corporation-এর 'কাফের' বাংলো। এছাড়া আছে গোর্খা হিল কাউন্সিলের অতিথি নিবাস। বর্তমানে বেসরকারি বন্দোবস্তও গড়ে উঠেছে। দিগন্ত বিস্তৃত শিবালিক হিমালয়ের তরঙ্গায়িত অপরূপ দৃশ্য আপনার নজর টানবেই। আছে অর্কিড সেন্টার। রাতের অন্ধকারে উত্তর-পশ্চিমে লক্ষাধিক জোনাকির ন্যায়, আলোক সজ্জিত কালিম্পং শহর। আর ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন থাকলে শ্বেতশুভ্র তুষারমৌলী কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপ আপনাকে মোহিত করবেই।

এবার আসা যাক তাদের কথায়, যাঁরা একটু অন্যভাবে বেড়াতে ভালোবাসেন— অন্য কথায়, যাঁদের নিজেদের শ্রীচরণযুগলের উপর কিঞ্চিৎ অধিক ভরসা আছে।



কালিম্পং থেকে দুদিনে পায়ে হেঁটে আলগোড়া হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় লাভা। মাঝের রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় 'রিষম' বাংলোয়। এ পথে বাস ও জীপের অনবরত যাওয়া-আসা আছে বলেই বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আর লাভা থেকে লোলেগাঁও এই ২২ কিমি রাস্তা সেও একদিনের হাঁটাপথ। এ পথেও জীপের আনাগোনা কম নয়।

বরং উল্লেখ করা যাক কতকগুলি বিকল্প ও স্বল্প পরিচিত পায়ে চলার পথের।

১ম বিকল্প পৌঁছে যাওয়া যাক কালিম্পং। রাতটা কালিম্পং-এ কাটিয়ে পরদিন সকালে ভালভাবে প্রাতঃরাশ সেরে প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে কিছু ড্রাইফুড ও পানীয় জল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। কালিম্পংয়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে 'র‍্যালি খোলা' (খোলা অর্থে ছোট নদী)। শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি রাস্তা সোজা নেমে এসেছে র‍্যালি খোলার তীরে। প্রথম অংশটুকু পিচের হলেও শেষ অংশটুকু মোরামের। ওই রাস্তা ধরে ঘণ্টা দেড়েকের উৎরাই বেয়ে পৌঁছে যাবেন র‍্যালি ব্রিজে—পায়ে চলার উপযোগী সেতু। সেতু পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে দেখুন—ঘন সবুজ বনবীথিতে ঘেরা সামনে যে পর্বতগাত্র, তারই মাঝে লুকিয়ে আছে লোলেগাঁওয়ের সেই বিখ্যাত কাফের বাংলো। সামনের রাস্তা কিঞ্চিৎ চড়াই ও কষ্টকর, তবে সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় কাফের বাংলো বা গোর্খা অতিথি নিবাসে। আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে অনুমতি সাপেক্ষে নিখরচায়ও রাত কাটানো যায়। এ পথের অভিজ্ঞতা কিন্তু অনেকদিন স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

তবে একটু সতর্ক করে দেওয়া যাক। আগে যে র‍্যালি ব্রিজের কথা বললাম, সেখানে না গিয়ে যদি কালিম্পং শহর থেকে সরাসরি দক্ষিণ দিকে নেমে যাওয়া যায় তবে ওই র‍্যালি ব্রিজ থেকে ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে প্রায় ২ কিমি দূরত্বে অনুরূপ আর একটি পায়ে চলা সেতু দিয়েও র‍্যালিকে পার হওয়া যায়। কিন্তু এ পথ ধরে গেলে প্রিংতাম চার্চ হয়ে, সিংজী গ্রামকে পাশ কাটিয়ে 'কাফের' পৌছাতে কিন্তু বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে যাওয়ার আশংকা আছে।

লোলেগাঁও থেকে লাভা না গিয়ে, আরও দক্ষিণে, চলে আসতে পারেন— সামতাহারে। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। সব লক্ষণ নিয়ে ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে স্বীকৃতির দাবি রাখে। জীপের রাস্তা ধরে কম-বেশি ২১ কিমি হলেও বেশ কিছু চোরাবাটো (short cut) ধরলে শেষ দুপুরে সহজেই

পৌঁছে যাওয়া যায়। বর্তমানে জিপ সার্ভিসও চালু হয়েছে। অপরূপ সুন্দর এই রাস্তা, আর আজকের এই রাস্তা বিশেষ ক্লান্তিকরও নয়। রাস্তার কোনও কোনও অংশ ছবির মতো সুন্দর। সঙ্গে তাঁবু ও রান্নার সরঞ্জাম থাকলে কথাই নেই, নতুবা এখানে জনৈক প্রাক্তন সেনানীর একটি গেস্ট হাউস আছে—তবে কিঞ্চিৎ ব্যয়বহুল। অন্যথায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায় সামতাহার স্কুলেও।

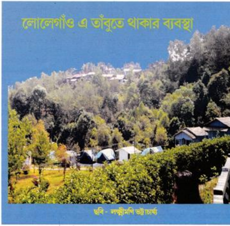
সামতাহার থেকে দুটি ভিন্ন পথে ফিরে যাওয়া যায় শিলিগুড়ি। প্রথমটি হল—ডানদিকে চারকোল খোলাকে রেখে, ছোট সুরুক গ্রাম হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় সামকো ফার্ম হাউস। ফার্ম হাউস কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে নিখরচায় রাত কাটানোর বন্দোবস্ত করা যায় একটি বিশাল চালা ঘরে অথবা রোপওয়ে স্টেশনে। এখান থেকে বিখ্যাত ওই রোপওয়েতে ১৪ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন—সেবকের অনতিদূরে শিলিগুড়ি-কালিম্পং (তিস্তা বাজার) সড়কের উপরে ২৭ মাইল নামক স্থানে। এখান থেকে বাস বা জিপে ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে শিলিগুড়ি। তবে বিগত ১৯৯৬ সালের জুন মাসে ওই রোপওয়েটিতে দুর্ঘটনার কারণে—যতদূর জানা আছে, বর্তমানে মানুষ পারাপার নিষিদ্ধ। বিকল্প হিসেবে Raft (রাবারের ভেলা) করে তিস্তা পারাপারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

২য় পথটি হল—লোলেগাঁও থেকে সামতাহারের পথে, সামতাহারের সামান্য আগে, দেওরালী নামক জায়গা থেকে একটি রাস্তা বাঁদিকে চলে গেছে। ওই রাস্তা ধরে 'ফাটোক্', 'নিম্বাং' হয়ে রাতের আশ্রয় নেওয়া যায় 'বারবোট' চার্চ সংলগ্ন প্রাথমিক স্কুলে, পরদিন বেরিয়ে 'চুইকিম্', 'চুনাভাটি' হয়ে ফিরে আসা যায় বাগরাকোট (মিনামোড়)। সেখান থেকে বাসে চেপে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই শিলিগুড়ি।

২য় বিকল্প আগেই গরুবাথান হয়ে বাসে লাভা যাওয়ার রাস্তার কথা উল্লেখ করেছি। গরুবাথান থেকে প্রায় বাস রাস্তার সমান্তরাল একটি অদ্ভুত সুন্দর পায়ে চলা পথের সন্ধান আছে। এ রাস্তায় যেমন পড়বে নদী, ঝরনা, তেমনই গিরাশিরা ধরে পথ চলার অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট সুন্দর গ্রাম, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ চলার আনন্দ।

শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টা চারেকের বাস যাত্রা শেষে গরুবাথান। রাতটা গরুবাথান স্কুলেও কাটিয়ে দিতে পারেন। পরদিন লাভাগামী বাস রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে, আর্মি ক্যাম্প পার হয়ে বাঁদিকে, এক সমতল, বিস্তৃত প্রান্তরের কাছে বাস রাস্তাকে বিদায় জানান। নেমে আসুন বাঁদিকে—কিছু নিচে দিয়ে বয়ে চলা ছোট খোলার তীরে। একটু এগিয়ে পায়ে চলার উপযোগী পারাপারের সেতু মিলবে। সেতু পার হয়ে বাঁদিকের (পশ্চিম) গিরিশিরার উপরে উঠে আসুন পাহাড়ের ঢাল ধরে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথে। গিরিশিরার উপরে উঠে আসলেই চোখ পড়বে—স্থানীয় মানুষের তৈরি—Observatory-cum-Rest Point—চলতি নাম হাওয়া মহল। অদ্ভুত সুন্দর এই হাওয়া-মহল ও তার সংলগ্ন গ্রাম। অল্প বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চলুন 'নিম' (বস্তি)-এর পথে। দ্বিপ্রহরের শেষে পৌঁছে যাবেন নিম (বস্তি) গ্রামে। এখানেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাত কাটানো যায়। পরের দিন রওনা দিন 'পাস্তিং' হয়ে লাভার উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা কয়েক চলার পর পৌঁছে যাবেন পাস্তিং টি এস্টেটে। এবারের রাস্তা কিন্তু বিশাল এই চা-বাগানের বুক চিরে। এপথের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। চা-বাগানের শেষে উঠে পড়ুন বাস রাস্তায়। সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় লাভা। তবে হাতে সময় থাকলে টি এস্টেট-এর গেস্ট হাউস-এ রাত কাটানো যায়।

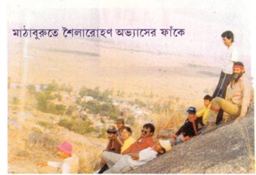
বিকল্পের শেষ নেই। এ রকম অসং
ছোট ছোট পায়ে চলার পথ ছড়িয়ে আ
এই অঞ্চলে। পরিসরের স্বল্পতায় সে প্রস
না গিয়ে পরিশেষে এটুকু বলতে পারি-
যাঁরা এ অঞ্চলে যেতে চান, তাঁদের ম
যাঁদের স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা আ
তাঁরা বাস বা জীপকে বিদায় জানিয়ে আ
শ্রীচরণযুগলের উপর ভরসা রেখে নে
পড়তে পারেন রাস্তায়। হয়ত সামান্য বি
বেশি কষ্ট হবে, তবে এটুকু বলতে পা
খারাপ লাগবে না। জিপ বা বাস রাস্তা ছে
চোরাবাটো ধরে চলতে চলতে, কখনও চ
বাগানের মাঝে, গগনচুম্বী পাইনের ছায়া
কখনও লিলি বা গোলাপ ফুটে থাকা বাড়ি
উঠোনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্তি
অনুভূতি হারিয়ে যাবে। অনুভব করবেন-
স্থানীয় মানুষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আপনা
অনুসরণ করছে। চড়াই ভাঙার কষ্ট শে
উৎরাইয়ের আনন্দ আপনাকে অন্য এ
অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছে দেবে। এ ক্ষে
সামান্য কষ্ট বা পরিশ্রম যে হবে এক
নিশ্চিত। কিন্তু কথা দিতে পারি, ওই সামা
কষ্ট বা পরিশ্রমই আপনার আগামী দিনে
সুখস্মৃতির এক উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে বিবেচি
হবে।



ছবি - লক্ষ্মীমণি ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাডভেঞ্চার ক্রীড়া আকাদেমির নানা কর্মকাণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ পর্বতারোহণ ক্রীড়ায় যুক্ত তরুণ-তরুণী ও সংগঠনদের উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (West Bengal Mountaineering and Adventure Foundation) এবং অ্যাডভেঞ্চারের পরিধিকে সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাডভেঞ্চার ক্রীড়া আকাদেমি (West Bengal State Academy of Adventure Sports) স্থাপন করে। শেষোক্ত আকাদেমিতে ১৯৯৯-এর জুন মাসে রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।



মাঠাবুরুতে শৈলারোহণ অভ্যাসের ফাঁকে

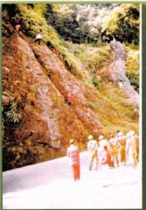
ফাউন্ডেশনের কাজকর্ম ও উদ্দেশ্য (১) পর্বতারোহণে উৎসাহ দান, (২) শিবির, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির, বহিরঙ্গনের কার্যাবলী জাতীয় নানা অ্যাডভেঞ্চার কর্মসূচির উৎসাহ দিতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণ, (৩) স্নোক্রাফট, রক ক্লাইম্বিং ও স্কিইংয়ের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, (৪) বৃহদাকারে ট্রেকিং কর্মসূচির ব্যবস্থা, (৫) সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চার কর্মসূচির আয়োজন, (৬) উপকূল-ট্রেকিং, জঙ্গল-ট্রেকিং, সার্ভাইভাল প্রসিডিওর ইত্যাদির আয়োজন, (৭) দুর্ঘটনায় পতিত পর্বতারোহীদের পরিবারদের আর্থিক সহায়তা দান, (৮) পর্বতারোহণ সরঞ্জামের স্টোর স্থাপন, (৯) ফাউন্ডেশনের মুখপত্র প্রকাশনা ইত্যাদি।

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতি বছর দুজনকে তেনজিং নোরগে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। ৮৬ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এখান থেকে বাঁকুড়া, শুশুনিয়া ও পুরুলিয়ার মাঠায় রক ক্লাইম্বিংয়ের জন্য পাহাড় বুকিং করা হয়। এছাড়া স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে সান্দাকফু রিজিওনে ট্রেকিং কর্মসূচির আয়োজন করে ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের অধীনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার পর্বতারোহণের সরঞ্জামের স্টোর রয়েছে। প্রসঙ্গত, এই যুবভারতীতেই রয়েছে ৫৪ ফুট উচ্চতার রক ওয়াল, মাল্টিজিম ইত্যাদি—সবই ফাউন্ডেশনের অধীনে। এছাড়া ফাউন্ডেশন স্পোর্টস ক্লাইম্বিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আয়োজন করে পর্বত ও পর্বতারোহণ বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতারও।

পূর্বাঞ্চলীয় স্পোর্টস ক্লাইম্বিং প্রতিযোগিতা বাইরের প্রার্থী অর্থাৎ বিহার, ওড়িশা, সিকিম এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রার্থীদের জন্য ইস্টার্ন জোনাল স্পোর্টস ক্লাইম্বিং কম্পিটিশনের আয়োজন করে ফাউন্ডেশন। প্রসঙ্গত, ২০০০-এর ১৮ ও ১৯ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৪র্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওই সব রাজ্যের বসবাসকারী আগ্রহী পর্বতারোহী পুরুষ ও মহিলারা এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বছরে ৩০ নভেম্বরের হিসাবে ১৬র মধ্যে বয়স এমন জুনিয়র বালক-বালিকারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। প্রতি রাজ্য থেকে ২০ জন প্রার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সুযোগ পাবে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ফাউন্ডেশন করলেও যাতায়াত ব্যয় প্রার্থীদের। এছাড়া নিজ নিজ পর্বতারোহণ সামগ্রী প্রার্থীদের আনতে হবে। গত বছর এই প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল সেপ্টেম্বরে। আবেদনের ফি ছিল পঞ্চাশ টাকা। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায় অধিকর্তা, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালি, ১৪২/৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪।

আকাদেমির কাজকর্ম ও উদ্দেশ্য (ক) পর্বতারোহণ (আইস, রক



দার্জিলিং - এইচ এম আই এর পরিচালনায় তেনজিং নোরগে রকে শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ।

ছবি : কাজল বিশ্বাস

ও স্নো) সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশিক্ষণ, (খ) সাইক্লিং, কেভ এক্সপ্লোরেশন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অ্যাডভেঞ্চার শিবির, (গ) স্কিয়িং, (ঘ)এয়ারো-স্পোর্টস, প্যারা-গ্লাইডিং, হ্যাং-গ্লাইডিং, প্যারাসেলিং, (ঙ) কোস্টাল ট্রেক, (চ) ডেজার্ট ট্রেক, (ছ) ওয়াটার স্পোর্টস : উইন্ড সার্ফিং, কায়াকিং, কানোয়িং, রিভার র‍্যাফটিং, স্কুবা ডাইভিং, সমুদ্র সচেতনতা, সমুদ্র অভিযান, (জ) সার্ভাইভাল কোর্স, (ঝ) অবস্টাকল কোর্স, (ঞ) ক্রস কান্ট্রি, (ট) রেসকিউ অপারেশনাল কোর্স, (ঠ) সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন, (ড) ইনস্ট্রাক্টর কোর্স, (ঢ) প্রধান প্রধান শৃঙ্গে (২০,০০০ ফুটের উর্ধ্বে) পর্বতারোহণ ইত্যাদিতে উৎসাহ, সাহায্য ও কর্মসূচি রূপায়ণ। এছাড়াও আকাদেমি বিভিন্ন পুরস্কার, বৃত্তি, স্টাইপেন্ড, মেডেল দেয়। আয়োজন করে নানা রিফ্রেশার কোর্স, সেমিনার ইত্যাদির।

পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ বৃত্তি : দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং উত্তর কাশীর নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে প্রাথমিক উচ্চতর পর্বতারোহণের জন্য প্রশিক্ষণ বৃত্তি দেয় যুবকল্যাণ অধিকার। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী নিম্ন আয় যুক্ত পরিবারের যুবক-যুবতীরা আবেদন করতে পারেন, শুধুমাত্র এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর। প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ফর্মের সঙ্গে আলাদাভাবে প্রার্থীর নাম, বয়স, ঠিকানা, বার্ষিক আয়, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি জানানো জরুরি। যোগাযোগের ঠিকানা : অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৩২/১, বি বা দি বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর প্রায় ১০০ জনকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ ও স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের সহায়তায় আকাদেমি মূলত জলক্রীড়া ও গগনক্রীড়ার (Watersports and Aerosports) ওপর গুরুত্ব দেয়। আকাদেমি পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম জলক্রীড়া বা কায়াকিং কোর্সের আয়োজন করে কলকাতার সুভাষ সরোবরে। এতে দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বিভিন্ন জেলার তরুণ-তরুণীরা অংশ নেন। ৯৯-এর নভেম্বরে রাজ্য পর্যটন বিভাগ আয়োজিত তিস্তা চা-উৎসবে আকাদেমি শিলিগুড়ির কাঞ্চনজংঘা স্টেডিয়ামে বেলুনিং ও প্যারাসেলিং প্রদর্শনীর উদ্বোধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বেলুনিং ও কায়াকিং ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে মংপং ও কালিঝোরা নদীতে। ওই বছর ডিসেম্বরে উত্তরবঙ্গে জলক্রীড়ার র‍্যাফটিং, কায়াকিং ও কেনোয়িং বিষয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আকাদেমি। তিস্তা নদীতে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় রংপো থেকে। এতে আকাদেমি ছাড়াও অংশ নেয় আর্মি অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, আই টি বি পি, সিকিম রাজ্য, ডি জি এইচ সি, বি এস এফ, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য। অত্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এই আকাদেমির প্রতিযোগীরা কায়াকিংয়ের ব্যক্তিগত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং কায়াকিং ও র‍্যাফটিংয়ের দুটি বিষয়ে দলগত বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

এছাড়া পর্যটন বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আকাদেমি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্রিগেড ও স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া কমপ্লেক্সে প্যারাসেলিং ও বেলুনিং প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

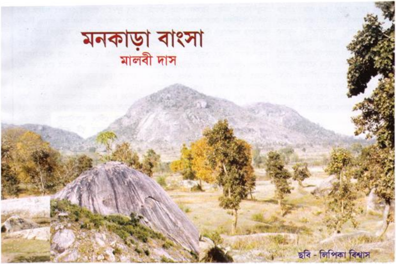
২০০০-এর ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুভাষ সরোবরে কায়াকিং ক্রীড়ার ওপর এক মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল আকাদেমি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে মোট চল্লিশ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে ২০০০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি মিটে অংশ নেবার জন্য আকাদেমি দুজন তরুণকে পাঠায়। ৫ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশ সরকার এলাহাবাদ-মির্জাপুর-চুনার-বেনারস যাত্রাপথে যে-গঙ্গা ওয়াটার র‍্যালির আয়োজন করেছিল তাতে আকাদেমি পাঁচজনকে পাঠায়। তাঁরা এই র‍্যালিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের নজির রাখেন। জল ও গগনক্রীড়ার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে ওই বছর প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফাউন্ডেশনের নথিভুক্ত কার্যালয়ের ঠিকানা : *রাজ্য যুব কেন্দ্র, মৌলালি,* ১৪৩/২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪ এবং আকাদেমির নথিভুক্ত কার্যালয়ের ঠিকানা : ৩২/১, বি বা দী বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১।

মনকাড়া বাংসা

মালবী দাস



ছবি - লিপিকা বিশ্বাস

সপ্তাহের চার-পাঁচ দিন বেশ জমিয়ে রসিয়ে কাটাতে চাইলে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রকৃতির নিভৃত আঁচলের তলায় মুখ লুকানো বাংসা পাহাড়ে ছুটেই যাওয়া যায় নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। ভীষণ মনকাড়া জায়গা।

খুব বেশি দূরে নয়, আবার ঝঞ্ঝাটও এমন কিছু পোয়াতে হবে না। বাংসা পাহাড় হল পুরুলিয়া জেলার ছোট্ট পাহাড়ি এক অজ পাড়াগাঁ। লোকাবাস ছাড়িয়ে সবুজ গাছের আড়ালে নিজের সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রেখেছে বাংসা পাহাড়।

ইট-পাথরের তৈরি ইমারতের শহর কলকাতায় কিছুদিন থাকার পরই আমরা প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধুরা হাঁফিয়ে উঠি কল্লোলিত শহর ছেড়ে দূরে কোথাও প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে নিস্তব্ধতায় নিজেদের ভাসিয়ে রাখার জন্য। Alpine-এর পাহাড়ি সরঞ্জামের ঘরে জড়ো হওয়া আমরা কজনও নিজেদেরকে ভাসিয়ে ছিলাম বাংসার কোলে।

স্থানীয় লোকের কথা অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার এই ছোট্ট অঞ্চলের নামকরণের পিছনে এক অলৌকিক ঘটনা আছে। এই গ্রামে নাকি বাংসা বাবা নামে এক বৃদ্ধ থাকতেন। ওই বৃদ্ধকে গ্রামের কোনও এক বাসিন্দা এঁটো থালায় খেতে দেন। এরপর থেকে বাংসা বাবার আর হদিশ পাওয়া যায়নি। গ্রামের বাসিন্দারা বাংসা বাবাকে ফিরে পাওয়ার জন্য পুজো করতে শুরু করলেন। সেই থেকেই বাংসা ঠাকুরের পুজোর প্রচলন হল আর তাঁরই নামে নামকরণ হল বাংসা গ্রাম আর বাংসা পাহাড়।

২০০০ সালের মার্চের ৩ তারিখে আদ্রা-চক্রধরপুর ধরে ছুটে চললাম বাংসার উদ্দেশে। পুরুলিয়া স্টেশনে নেমে বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝালদা আসার জন্য বাস ধরলাম। বাস ছাড়ার পর শহরের কোলাহল মিলিয়ে

গেল। আমাদের চোখে ধরা পড়ল ধূ-ধূ প্রান্তর, নক্‌শা করা মাটির বাড়ি, কারও কারও উঠোনে মুরগি চরে বেড়াচ্ছে। আবার কিছু দূর এগিয়ে দেখা গেল একটা ছোট্ট চায়ের দোকান, সেখানে তেলেভাজা, মুড়ি সবই পাওয়া যায়। এভাবেই বাসের জানলায় চোখ রেখে হু-হু করে এগিয়ে চললাম ঝালদার দিকে। পথে পড়েছে আমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধুদের সকলের চেনা জায়গা বেগুনকোদর, শিরকাবাদ। এ ছাড়া কংসাবতী নদীকে স্পর্শ করে ছোট সেতু পার হতে হয়েছে ঝালদা আসার জন্য। ঝালদায় পৌঁছেই ছোঁয়া পেলাম সেই দূরে ফেলে আসা কোলাহলের। এখান থেকেও বাজার করে নিয়ে যাওয়া যায় বাংসাতে। ঝালদা থেকে বাংসা অটোয় দশ মিনিট।

'হাত বাড়ালেই বন্ধু' প্রবাদের সত্যতা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল সরযূভাইকে দেখে। একটা ছোট্ট চায়ের দোকান সরযূভাইয়ের। এখানে চা খেয়ে বাংসা পাহাড়ের দিকে সরযূই আমাদের নিয়ে গেল। পাহাড়ের দিকে পা বাড়াতেই দেখলাম গাছতলায় রাখা রয়েছে দেব-দেবীর মূর্তি। আবার একটু এগিয়েই দেখা পেলাম আর একটা ছোট্ট মন্দিরের। মন্দিরের মাথায় লেখা রয়েছে বাংসা ঠাকুর। এখানে পৌষ মাসে মেলা বসে। এই মেলা চলে দু-তিন দিন ধরে। চলতে গিয়ে সামনেই পড়ল ইদারা। ইদারার জলই গ্রামের বাসিন্দাদের পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া টিউবওয়েলও আছে। আছে দিনের শেষে ক্লান্তি দূর করার জন্য ছোট্ট দুটি পুকুর। এই সবকিছুকে ঘিরেই বাংসা গ্রামের সৌন্দর্য। আর এরই কোলে গড়ে উঠেছে বাংসা পাহাড়।

এই বাংসার কোলে ছুটে এসেছিলাম আমরা আটজন দল বেঁধে। প্রত্যেকেই আমরা পাহাড়প্রেমী। এখানে হাজির হয়েছিলাম পর্বতারোহণ অনুশীলনের উদ্দেশ্য নিয়ে। বাংসাতে পৌঁছেই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম পর্বতারোহণ অনুশীলনের জন্য। বিকেল সাড়ে চারটে অবধি অনুশীলন সেরে আমরা ফিরে আসি আমাদের আশ্রয়স্থল তাঁবুতে। ভোর হতে না হতেই আমরা তৈরি হয়ে নিতাম অনুশীলনের জন্য। অনুশীলন-পর্ব সেরে বিকেলে বসত আমাদের মুড়ি-চপ-চায়ের আড্ডা। দুপুরের খাবার পালা সারতাম অনুশীলনের মধ্যেই। এর জন্য আলাদা কোনও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল না। বাংসার কোলে অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাতের খাবার তৈরির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। আর এর তালে তাল মিলিয়ে চলত গানের আসর। এই রকম হাসি-খেলার মধ্যে হঠাৎ করে আকাশের দিকে তাকালে মনে হত, উজ্জ্বল দীপ্ত চোখে তারাগুলো আমাদের পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকেই আমরা কাজের ফাঁকে আকাশের দিকে তাকাতাম আর সকলেরই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগত রাতের ওই রক্ষীবাহিনীদের নাম জানার। সময়টা ছিল অমাবস্যা তিথি। এই পাহাড়ের উল্টো দিকেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা নাম না-জানা পাহাড়, সেটাও কিছুটা বাংসা পাহাড়ের গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। রাতের ঘন অন্ধকারে ওই লাইন ধরে সম্বলপুর এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন ছুটে চলত অবাধ গতিতে। তখন আমাদের সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি গিয়ে হাজির হত ওই ট্রেন লাইনে। প্রকৃতির অবাক করা রূপ দেখতে দেখতে অবসান হত একটি দিনের। ঘরে ফেরার ডাক হাজির ৬ মার্চ। ফেরার দিনেও সকালবেলা বাদ পড়েনি আমাদের বাংসা পাহাড়ের গভীরে প্রবেশ করা। সুন্দর আকৃতির পাথরের গঠনে আমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। প্রত্যেকেই আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম—'বাংসা তুমি কত সুন্দর'। বাংসার কোলের গভীরে বসে দূরে তাকাতেই পাওনা হল আরও তিনটি গ্রাম—মেটাল, মারু ও আরহার। আর দূরে বয়ে চলা নাম না-জানা নদী। প্রকৃতির এই সুন্দর শান্ত পরিবেশ থেকে ঘরে ফিরতে কারই বা মন চায় ! ফিরতেই হবে, কেন না, আমরা গণ্ডির মধ্যে বাঁধা। বিদায়ী মন ফিরে ফিরে চায় বাংসার দিকে। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে ৮-১৭ মিনিটে আমাদের ট্রেন। ফিরে আসার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বাংসা থেকে ঝালদায় পৌঁছে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি, পুরুলিয়া যাবার দুটি বাসই চলে গেছে। অবশেষে ভরসা ঝালদা স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন। ট্রেনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে প্রত্যেকেই চিন্তা করতে লাগলাম, আমাদের হয়তো আবার বাংসায় ফিরে যেতে হবে। উথাল-পাথাল মানসিক অস্থিরতার মধ্যে মনে পড়ে গেল

'আকাশ ডাকে আজ আমায়
পাহাড় ডাকে আজ আমায়।'

সত্যি, বাংসা যেন আমাদের বিদায় দিতে চাইছে না। এরই মধ্যে মনা ও বরুণ সন্ধান করতে গেল জিপের—এটাই পুরুলিয়া যাওয়ার শেষ প্রচেষ্টা। জিপ হাজির, চালকভাই আমাদের কথা দিলেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন। ট্রেন স্টেশনে ঢোকার সাত মিনিট আগে আমরা স্টেশনে হাজির। আমরা একে একে বাংসার স্মৃতিকে সঙ্গী করে গাইতে লাগলাম ঘরে ফেরার সুর।

প্রয়োজনীয় তথ্য

হাওড়া স্টেশন থেকে আদ্রা-চক্রধরপুর ট্রেন ধরে পুরুলিয়া যেতে হবে। সেখান থেকে বাসে করে ঝালদা। এখান থেকে অটো করে বাংসা।

বাংসায় পৌঁছে দেখা মিলবে চায়ের দোকানের। এখানে সরযূভাইকে পাওয়া যাবে। ওঁর কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য পাওয়া যাবে।

থাকার জায়গা বলতে পঞ্চায়েতের ঘর আছে, তাছাড়া নিজেরা তাঁবু টাঙিয়ে থাকা যায়। কাঁচা বাজার ঝালদা থেকে করে নিতে হবে।

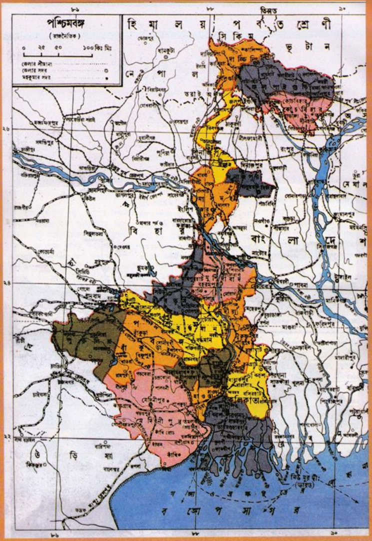
ভ্রমণ তথ্য

কোথায় যাবেন   কিভাবে যাবেন   কোথায় থাকবেন

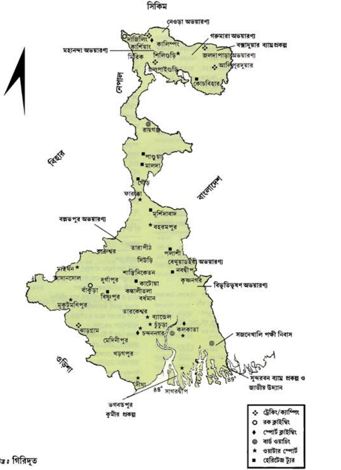
কাদের সঙ্গে যাবেন



সান্দাকফু–ফালুটের ট্রেকিং রুট


পশ্চিমবঙ্গ
(রাজনৈতিক)
জেলার সীমানা
জেলার সদর
মহকুমার সদর
তিব্বত
হি মা ল য় প র্ব ত শ্রে ণী
সি কি ম
ভূ টা ন
নে পা ল
বি হা র
বাং লা দে শ
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র

পশ্চিমবঙ্গের দুঃসাহসিক ভ্রমণ



মানচিত্রঃ গিরিদূত

রেল-বাস-বিমানের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছায়
রাজধানী এক্সপ্রেস	২৩১৩	১৬-৫৫	২৩১৪	১০.১৫
ছাড়ে : সোম, মঙ্গল, বৃহ, শনি				
পৌঁছায় : বুধ, বৃহ, শনি ও সোম				
তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস	৩১৪১	১৩-৪০	৩১৪২	৬-৩৫
দার্জিলিং মেল	৩১৪৩ .	১৯-১৫	৩১৪৪	৮-৪৫
লালকেল্লা এক্সপ্রেস (ভায়া মেন লাইন)	৩১১১	২০-১৫	৩১১২	৭-১৫
কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	৫৬৫৭	৬-২৫	৫৬৫৮	২০-৩৫
গৌড় এক্সপ্রেস	৩৪৫৩	২২-১৫	৩৪৫৪	৫-১৫
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	৩১৪৭	২১-১৫	৩১৪৮	৬-৪৫
ছাড়ে : সোম, বুধ, শনি ; পৌঁছায় : বুধ, শুক্র, সোম				
শিয়ালদহ-অমৃতসর অকাল তখ্ত	২৩১৭	৮-৪০	২৩১৮	১৫-৩০
সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ছাড়ে : বুধ ; পৌঁছায় : শনি				
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	৩১৪৯	২১-১৫	৩১৫০	৬-৪৫
ছাড়ে : মঙ্গল,বৃহ, রবি ; পৌঁছায় : বৃহ, শনি, মঙ্গল				
হাটে বাজারে এক্সপ্রেস	৩১৬৩	২০-০০	৩১৬৪	৪-১৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	৩১৫১	১১-৪৫	৩১৫২	১৫-৫০
মুঘলসরাই এক্সপ্রেস (ভায়া সাহেবগঞ্জ লুপ)	৩১৩৩	২০-৫৫	৩১৩৪	১২-৩০
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	৩১০৩	১৮-২০	৩১০৪	১০-২৫
গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস	৫২৮৫	১৫-১৫	৫২৮৬	৪-২৫
অন্যান্য (আজমীর) এক্সপ্রেস	২৩১৫	১২-৫০	২৩১৬	১৫-৩০
ছাড়ে শনি ; পৌঁছায় : মঙ্গল				

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছায়
দিল্লি-কালকা মেল	২৩১১	১৯-৪০	২৩১২	৬-৫০
অমৃতসর মেল	৩০০৫	২০-০০	৩০০৬	৭-৩৫
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	২৩২১	২২-০০	২৩২২	১১-২৫
পূর্বা (নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস	২৩৮১	৯-৩০	২৩৮২	১৫-৩০
(ভায়া গয়া-বারাণসী)				
ছাড়ে : বুধ, বৃহ, রবি ; পৌঁছায় : মঙ্গল, বুধ, শনি				
পূর্বা (নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	২৩০৩	৯-১০	২৩০৪	১৬-১৫
ছাড়ে : সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি ; পৌঁছায় : সোম, বৃহ, শুক্র, রবি				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	২৩০১	১৭-০০	২৩০২	৯-৫৫
ছাড়ে : সোম, মঙ্গল, বৃহ, শুক্র, শনি ; পৌঁছায় : সোম, বুধ, বৃহ, শুক্র, রবি				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	২৩০৫	১৩-৪৫	২৩০৬	১৩-১০
ছাড়ে : বুধ, রবি ; পৌঁছায় : মঙ্গল, শনি				
যোধপুর এক্সপ্রেস	২৩০৭	২৩-৩০	২৩০৮	৪-৪০
শতাব্দী (বোকারো স্টিল সিটি) এক্সপ্রেস	২০১৯	৬-৪৫	২০২০	২০-৪০
রবিবার বাদে প্রতিদিন				
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	৩০৭৩	২৩-০০	৩০৭৪	১১-৩৫
ত্রি-সাপ্তাহিক, ছাড়ে : মঙ্গল, শুক্র, শনি ; পৌঁছায় : মঙ্গল, বুধ, শনি				
গুয়াহাটি-সরাইঘাট এক্সপ্রেস	২৩৪৫	১৫-৫০	২৩৪৬	১৩-০৫
ছাড়ে : বুধ, বৃহ, রবি ; পৌঁছায় : মঙ্গল, বুধ, শনি				
গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস	৫০৪৯	১৩-০০	৫০৫০	৪-১৫
ছাড়ে : ও পৌঁছায় : রবি				
পূর্বাঞ্চল (গোরক্ষপুর) এক্সপ্রেস	৫০৪৭	১৩-০০	৫০৪৮	৪-১৫
ছাড়ে ও পৌঁছায় : সোম, বুধ, বৃহ, শুক্র				
দুন এক্সপ্রেস (ভায়া গ্র্যান্ড কর্ড)	৩০০৯	১৯-১৫	৩০১০	৭-০০
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	৩০১৩	১৩-১০	৩০১৪	১৫-০০
ছাড়ে : মঙ্গল ; পৌঁছায় : শুক্র				

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছায়
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস	৩০০৭	৯-৪৫	৩০০৮	১৮-১০
(ভায়া মেন লাইন)				
দিল্লি জনতা এক্সপ্রেস	৩০৩৯	২০-১৫	৩০৪০	৫-৪০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	৩০৪৯	১৩-১৫	৩০৫০	১৫-৩০
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	৩০১৯	২১-৪৫	৩০২০	১১-৫৫
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	৩০২১	১৬-০০	৩০২২	৫-০০
কামরূপ (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	৫৯৫৯	১৫-২৫	৫৯-৬০	৬-৩০
ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস	৩০১৭	৬-১৫	৩০১৮	২১-২৫
কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস	৩০২৯	১৭-১৫	৩০৩০	১০-৩০
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	৩০১৫	১৮-২০	৩০৩৬	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	৩২৩১	২১-০৫	৩২৩২	৭-৫৫
জামালপুর এক্সপ্রেস	৩০৭১	২১-৪০	৩০৭২	৫-১০
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	৩০১৫	৯-৫৫	৩০১৬	১৫-৪৫
গণদেবতা এক্সপ্রেস	৩০১৭	৬-০৫	৩০১৮	২১-৪৫
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১১৫৯	১৫-১৫	১১৬০	৬-৩০
ছাড়ে : মঙ্গল, বুধ, রবি ; পৌঁছায় : বুধ, শুক্র, রবি				
শিপ্রা (ইন্দোর) এক্সপ্রেস	৯৩০৬	১৫-১৫	৯৩০৫	৩-৩০
ছাড়ে : সোম, বৃহ, শনি ; পৌঁছায় : বৃহ, শনি সোম				
শক্তিপুঞ্জ (চোপান) এক্সপ্রেস	১৪৪৮	১৪-৩০	১৪৪৭	৪-৩০
চম্বল (আগ্রা ক্যান্টঃ) এক্সপ্রেস	১১৮১	১৫-১৫	১১৮২	৬-৩০
ছাড়ে : শুক্র ; পৌঁছায় : মঙ্গল				

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছায়
চেন্নাই মেল	৬০০৩	১৯-৩৫	৬০০৪	৭-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	২৮১০	২০-০৫	২৮০৯	৭-৪০
গীতাঞ্জলি (বম্বে) এক্সপ্রেস	২৮৬০	১২-৫৫	২৮৫৯	১৪-৫০
শতাব্দী (রৌরকেল্লা) এক্সপ্রেস	২০২১	৬-০০	২০২২	২১-০০
ছাড়ে ও পৌঁছায় : শনিবার বাদে প্রতিদিন				
হাওড়া কুরলা জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স	২১০২	২৩-০৫	২১০১	৪-৪৫
এ সি এক্সপ্রেস ছাড়ে ও পৌঁছায় : বুধ, বৃহ, রবি				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	৮০৩৪	২০-৫০	৮০৩৩	৫-০৫
কুরলা (এল টি টি) এক্সপ্রেস (ভায়া নাগপুর)	৮০৩০	১০-৪০	৮০২৯	১৫-২৫
করমণ্ডল (চেন্নাই) এক্সপ্রেস (ভায়া কটক)	২৮৪১	১৩-১৫	২৮৪২	১৩-৪৫
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	২৭০৩	৮-২৫	২৭০৪	১৯-৪০
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	৮১১৩	১৭-৩০	৮১১৪	১০-২৫
ইস্পাত এক্সপ্রেস	৮৩১১	৬-৫০	৮৩১২	২০-৪০
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	৮০০৫	২১-১৫	৮০০৬	৫-৩০
রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেস	৮৬১৫	২১-৩৫	৮৬১৬	৬-৪৫
পুরী এক্সপ্রেস (ভায়া কটক)	৮০০৭	২১-৫৫	৮০০৮	৬-১০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	৮৪০৯	১৮-০৫	৮৪১০	৮-৩৫
ধৌলি (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	২৮২১	৬-০৫	২৮২২	২১-৫৫
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	৭০৪৫	১০-১৫	৭০৪৬	১৫-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	৮০১৭	১৬-৪০	৮০১৮	১১-৩৫
তিরুপতি এক্সপ্রেস	৭৪৭৯	২৩-৩০	৭৪৮০	৪-০০
আজাদ হিন্দ (পুনে) ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	২১৩০	১৬-৫০	২১২৯	৩-৫০
ছাড়ে ও পৌঁছায় সোম, মঙ্গল, শুক্র				

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌছায়
ভুবনেশ্বর-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস	২৪২১	১৭-০০	২৪২১	১৬-৩০
(ভায়া হাওড়া) ছাড়ে ও পৌছায় : রবি, বুধ				
নিউ দিল্লি-ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেস	২৪২২	১১-০৫	২৪২২	১০-৪৫
(ভায়া হাওড়া) ছাড়ে ও পৌছায় : মঙ্গল, শনি				
গুয়াহাটি-হাওড়া-ত্রিবান্দ্রাম সেন্ট্রাল	৫৬২৮	৩-৫০	৫৬২৮	৩-৩০
এক্সপ্রেস ছাড়ে ও পৌছায় : বৃহস্পতি				
ত্রিবান্দ্রাম-হাওড়া- গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	৫৬২৭	১৪-০৫	৫৬২৭	১৩-৩০
ছাড়ে ও পৌছায় : মঙ্গল				
এর্নাকুলাম-গুয়াহাটি	৫২২৪	১৪-০৫	৫৬২৩	১৩-৩০
সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (ভায়া হাওড়া বিশাখাপত্তনম)				
ছাড়ে ও পৌছায় : বৃহস্পতি				
গুয়াহাটি-এর্নাকুলাম টার্মিনাস	৫৬-২৪	৩-৫০	৫৬২৪	৩-৩০
সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (ভায়া বিশাখাপত্তনম হাওড়া)				
ছাড়ে ও পৌছায় : শনি				
হাওড়া-ত্রিবান্দ্রাম দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	৬৩২৪	২২-২৫	৬৩২৩	১৩-৩০
ছাড়ে : মঙ্গল, রবি ; পৌছায় ; সোম, শনি				
গুয়াহাটি-বাঙ্গালোর সিটি দ্বি-সাপ্তাহিক	৫৬২৬	৩-৫০	৫৬২৬	৩-৩০
এক্সপ্রেস (ভায়া হাওড়া ও কটক) ছাড়ে ও পৌছায় : সোম, বুধ				
বাঙ্গালোর সিটি-গুয়াহাটি দ্বি-সাপ্তাহিক	৫৬২৫	১৪-০৫	৫৬২৫	১৩-৩০
এক্সপ্রেস (ভায়া হাওড়া ও কটক) ছাড়ে ও পৌছায় : শুক্র, রবি				
হাওড়া-তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক	৬৮০৩	১৫-১০	৬৮০৪	৪-১৫
এক্সপ্রেস ছাড়ে ও পৌছায় : বৃহ, রবি				
হাওড়া-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস	৬৩৫৫	১৫-১০	৬৩৫৬	৪-১৫
ছাড়ে ও পৌছায় : সোম				
হাওড়া-পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	৮০২৩	৬-০৫	৮০২৪	২২-০৫
হাওড়া-হাপা (গুজরাট) আরাধনা এক্সপ্রেস	২৯০৬	২৩-০৫	২৯০৫	৪-৪৫
ছাড়ে ও পৌছায় : শুক্র				
হাওড়া-নাগেরকয়েল এক্সপ্রেস	৬৩৫৮	২২-২৫	৬৩৫৭	১৭-০০
ছাড়ে : বুধ ও পৌছায় : মঙ্গল				
শালিমার-বাঁকুড়া আরণ্যক এক্সপ্রেস	৮০২৫	৮-৩৫	৮০২৬	১৮-১৫
রবিবার বাদে প্রতিদিন				
শালিমার-হলদিয়া ইন্টারসিটি	৮০১৯	১৭-১৫	৮০২০	৯-৫৫
আজাদ এক্সপ্রেস				

- পূর্ব রেলের কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান : ১৩৩১ ও ১৩৩২ (রেকর্ড করা তথ্য)
- রিজার্ভেশন অনুসন্ধান : ১৩৫
- শিয়ালদহ অনুসন্ধান : ৩৫০-৩৫৩৫ / ৩৭
- হাওড়া অনুসন্ধান : ৬৬০-২৫৮১ / ৩৫৪২ / ৭৪১২

দূরপাল্লার বাস

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন : শহিদ মিনার থেকে

রুট	ছাড়ার সময়	ভাড়া
কলকাতা-মায়াপুর	৬-০০, ৭-০০	৩৭ টাকা
কলকাতা-বাসন্তী	৬-০০, ৬-৩০, ৭-৩০	২৬ টাকা
কলকাতা-টাকি	৬৭-০০, ১০-১৫, ১৪-০০	২২ টাকা
কলকাতা-হাসনাবাদ	৬-৩০, ৭-৩০, ৮-৩০, ৯-৩০	২২ টাকা
	১০-০০, ১০-১৫, ১৩-০০,১৫-৩০	
কলকাতা-বসিরহাট	৬-০০, ৬-৩০, ৬-৪৫, ৭-০০, ৮-০০, ৮-৩০	১৯ টাকা
কলকাতা-রামপুরহাট	৭-০০	৮৬ টাকা
(ভায়া সাঁইথিয়া)		

দূরপাল্লার বাস

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন : শহিদ মিনার থেকে

রুট	ছাড়ার সময়	ভাড়া
কলকাতা-রামপুরহাট	৯-০০	৭৫ টাকা
(ভায়া নলহাটি)		
কলকাতা-বিষ্ণুপুর	৫-৩০, ৭-৩০, ৭-৪৫	৪০ টাকা
কলকাতা-পুরুলিয়া	৮-৩০	৭১ টাকা
কলকাতা-সাঁওতালডিহি	৬-৩০	৭৪ টাকা
কলকাতা-বালুরঘাট	৫-০০, ৬-০০, ২০-০০	১২০ টাকা
কলকাতা- ডোমকল	১৪-১৫, ১৫-১৫	৬২ টাকা
কলকাতা-ফারাক্কা	১০-৩০, ১২-০০	৮১ টাকা
কলকাতা-খাজুরিয়াঘাট	৮-১৫	৮৪ টাকা
কলকাতা-কালিয়াগঞ্জ	২১-৩০	১১৪ টাকা
কলকাতা-করিমপুর	১৫-০০	৫২ টাকা
কলকাতা-জিয়াগঞ্জ	১৩-০০	৬১ টাকা
কলকাতা-দীঘা	৬-১৫, ৬-৪৫, ৭-১৫, ৭-৪৫, ৮-৪৫, ৯-০০, ৯-৩০	৫০ টাকা
	১১-০০, ১৪-৪৫, ২১-১৫, ২১-৪৫, ২২-০০	৫৩ টাকা
কলকাতা-চন্দনেশ্বর	১২-০০, ১৩-০০, ১৩-৪৫	১৮৯ টাকা
(ভায়া দীঘা)		
কলকাতা-শঙ্করপুর	১০-৩০	১৯৭ টাকা
(ভায়া দীঘা)		
কলকাতা-কামারপুকুর	১৫-১৫	৯৯ টাকা
কলকাতা-জয়রামবাটী	৭-৩০, ১০-০০, ১০-৪৫, ১৫-৩০, ১৬-৪৫	২৯ টাকা
কলকাতা-খাতরা	১০-০০	৫৮ টাকা
কলকাতা-মুকুটমণিপুর	৭-০০, ৯-০০, ২১-০০	৬৬ টাকা
কলকাতা-ডায়মন্ডহারবার	১১-০০, ১৪-০০, ১৭-০০	১৩ টাকা
কলকাতা-কাকদ্বীপ	৬-১৫, ৭-৪৫, ৮-২০, ৮-৩০, ৮-৪৫, ৯-১৫	২৫ টাকা
	৯-৩০, ৯-৫০, ১০-০০, ১০-১৫, ১০-২০	
	১০-৩০, ১৭-১৫	
কলকাতা-সাগরদিঘি	১১-৪৫	৬৪ টাকা
কলকাতা-নামখানা	৬-০০, ৬-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-০০	২৯ টাকা
	৮-১৫, ৮-৩০, ৯-০০, ৯-১৫	
কলকাতা-ধামাখালি	৬-০০, ৬-১৫, ৬-৪০, ৭-০০, ৭-১৫, ৮-০০	২১ টাকা
কলকাতা-মালদা	৯-৩০, ২০-৩০, ২২-০০	৯১ টাকা
কলকাতা-বাঁকুড়া	৬-০০, ৬-৩০, ৯-৩০, ১৪-৩০	৫১ টাকা
কলকাতা-রঘুনাথগঞ্জ	১৩-৪৫	৬৯ টাকা
কলকাতা-রায়গঞ্জ	৬-৩০, ৭-৪৫, ১৯-৩০	১১২ টাকা
কলকাতা-রাজগীর	১৫-৩০	১৫১ টাকা
কলকাতা-পূর্ণিয়া	১৮-৩০	১৪৩ টাকা
কলকাতা-শিলিগুড়ি	৭-০০, ১৬-০০, ১৮-০০, ২০-০০ (এক্সপ্রেস)	১৬১ টাকা
	১৯-০০, ২০-০০ (রকেট)	২০৫ টাকা
গড়িয়া থেকে		
কলকাতা-দীঘা	৫-০০, ৬-০০, ৬-১৫	৫৩ টাকা
কলকাতা-বালুরঘাট	৪-১৫	১২৪ টাকা
কলকাতা-বহরমপুর	৫-২৫	৫৪ টাকা
কলকাতা-শিলিগুড়ি	৪-১৫ (এক্সপ্রেস)	১৬৪ টাকা
ডানলপ থেকে		
কলকাতা-দীঘা	৬-৩০, ৭-৩০	৪৯ টাকা
কলকাতা-জয়রামবাটী	৭-০০	২৫ টাকা

দূরপাল্লার বাস

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন : শহিদ মিনার থেকে

রুট	ছাড়ার সময়	ভাড়া
উল্টোডাঙা থেকে		
কলকাতা-দীঘা	৬-০০	৫০ টাকা
কলকাতা-বহরমপুর	৫-৩০	৫৩ টাকা
দমদম থেকে		
কলকাতা-দীঘা	৭-০০	৫১ টাকা
বাবুঘাট থেকে		
কলকাতা- হাজারিবাগ	১৪-৩০	১৪১ টাকা
হাওড়া থেকে		
কলকাতা-দীঘা	৫-০০, ৫-৩০, ৬-৫০	৪৯ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের উদ্যোগে : ট্যুরিজম সেন্টার থেকে

কলকাতা-দীঘা	প্রতিদিন ৭-০০	৫৫ টাকা
কলকাতা দর্শন	প্রতিদিন ৭-০০	১০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম : ধর্মতলা থেকে

কলকাতা- রামগঙ্গা	৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-০০, ১০-০০, ১০-৩০, ১১-০০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৬-০০, ১৭-০০, ১৭-৩০	৩৩.৫০ টাকা
কলকাতা-৮ নম্বর লট (গঙ্গাসাগর)	৭-১৫, ৮-১৫, ৯-১৫, ১০-১৫ ১৬-১৫, ১৭-১৫	২৭.৫০ টাকা
কলকাতা-দীঘা	৭-০০	৫৫ টাকা
কলকাতা-বকখালি	৭-০০	৩৯ টাকা
কলকাতা-গঙ্গাধরপুর (ভায়া কাকদ্বীপ)	১৪-১৫, ১৫-১৫	৩১.৫০ টাকা
কলকাতা-শিলিগুড়ি (এ সি)	১৯-০০	৪০০ টাকা
করুণাময়ী থেকে		
কলকাতা-ঢাকা	৭-০০ (রবিবার বাদে)	(যাতায়াত)১০০০ টাকা
করুণাময়ী-দীঘা	৬-০০	৫৮ টাকা

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম : শহিদ মিনার থেকে

কলকাতা-মালদা-রায়গঞ্জ	১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০ (রকেট)	২২৫ টাকা
ডালখোলা-কিষাণগঞ্জ-ইসলামপুর-শিলিগুড়ি	৬-০০, ১৭-০০ (এক্সপ্রেস)	১৯০ টাকা
কলকাতা-রানাঘাট-কৃষ্ণনগর-বেথুয়াডহরি-দেবগ্রাম-পলাশি-বেলডাঙা-বহরমপুর	৬-৪৫, ১২-৩০ (এক্সপ্রেস)	৬৫ টাকা
কলকাতা-মালদা-রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি	২০-০০ (রকেট)	২৩০ টাকা
কলকাতা-ফরাক্কা-মালদা-	২০-০০ (রকেট)	১৯০ টাকা
গঙ্গারামপুর-বালুরঘাট-হিলি	২১-০০ (এক্সপ্রেস)	১৫৪ টাকা
কলকাতা-মালদা-শিলিগুড়ি-	১৪-৩০ (এক্সপ্রেস)	২৪০ টাকা
জলপাইগুড়ি-কোচবিহার	২০-০০ (রকেট)	২৬০ টাকা
কলকাতা-মালবাজার	১৮-০০ (রকেট)	২৪০ টাকা
কলকাতা-ইসলামপুর	১৮-০০ (ডিলাক্স)	২০০ টাকা
কলকাতা-মাথাভাঙা	১৯-০০ (ডিলাক্স)	২৪৭ টাকা
কলকাতা-চাঁচোল	২১-০০ (এক্সপ্রেস)	১৩০ টাকা
কলকাতা-মালদা	২১-৩০ (রকেট)	১৪৫ টাকা
কলকাতা-রায়গঞ্জ	২১-৩০ (রকেট)	১৭০ টাকা
	২১-০০ (এক্সপ্রেস)	১৩২ টাকা

দূরপাল্লার বাস

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম : শহিদ মিনার থেকে

রুট	ছাড়ার সময়	ভাড়া
কলকাতা-কালিয়াগঞ্জ	২১-০০ (রকেট)	১৮০ টাকা
	২০-৩০ (এক্সপ্রেস)	১৩২ টাকা
কলকাতা-কুর্শিদা		
কলকাতা-বালুরঘাট	১৯-০০, ২০-০০ (এক্সপ্রেস)	১৪৩ টাকা
	২১-০০, ২১-৩০ (রকেট)	১৮০ টাকা

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম : শহিদ মিনার থেকে

কলকাতা-শিলিগুড়ি	৫-০০ (এক্সপ্রেস)	১৯০ টাকা
	১৫-০০, ১৭-০০, ১৯-৩০ (এক্সপ্রেস)	১৯১ টাকা
	২০-০০ (রকেট)	২০০ টাকা
কলকাতা- বালুরঘাট	৭-৩০	১৪৩ টাকা
	১৯-৩০	১৪৪ টাকা
কলকাতা-গাজোল	৫-৪৫, ৮-৩০	১১৬ টাকা
কলকাতা-গঙ্গারামপুর	৯-০০	১৫৯ টাকা
কলকাতা-রতুয়া	৬-৩০	১২৩ টাকা
কলকাতা-মালদা	৯-৩০	১০৮ টাকা
কলকাতা-বহরমপুর	৫-৩০	৬৪ টাকা
কলকাতা-ঝালদা	৫-৩০	৯৭ টাকা
কলকাতা-বান্দোয়ান	২২-০০	৯৭ টাকা
বেলঘরিয়া থেকে		
বেলঘরিয়া-দীঘা	৫-৩০, ৬-০০, ৭-০০	৬১ টাকা
খড়দহ-দীঘা	৬-০০	৬৪ টাকা
হাওড়া থেকে		
হাওড়া-দীঘা	৫-১০, ৭-৪৫	৫৭ টাকা
হাওড়া-গড়বেতা	১৮-০০	৫২ টাকা
হাওড়া-সারেঙ্গা	১৩-০০	৬০ টাকা

(বাসভাড়া ও সময়সূচি বদলাতে পারে)

বিমান

দমদম		ছাড়ে	দমদম		পৌঁছায়
উড়ান নং	সময়	দিন	উড়ান নং	সময়	দিন
বাগডোগরা					
আই সি-৭২১	১০-১০	১,৩,৫	আইসি-৭২২	১২-৩৫	১,৩,৫
৯ ডব্লু-৬১৭	১৪-৪০	১,২,৬	৯ ডব্লু-৬১৮	১৭-১০	১,২,৬

- এক থেকে সাত পর্যন্ত—এর অর্থ সোম থেকে রবিবার।
- আই সি : ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, ৯ ডব্লু : জেট এয়ারওয়েজ।
- বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন নিচের ফোন নম্বরে—ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স : (সিটি) ২৩৬-০৭৩০, ২৩৬-৩১৩৫, (চেক-ইন) ৫১১-৮৫৬৪, ৫১১-৯৬৩৩ জেট এয়ারওয়েজ : (সিটি) ২২৯-২২২৭।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ পরিচালিত যুব আবাসগুলির তালিকা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং রাজ্যের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ পরিচালিত নানা যুব আবাস রয়েছে। সেগুলির ঘরের সংখ্যা, দৈনিক ভাড়া, সংরক্ষণের নিয়মাবলী ইত্যাদি জানানো হল।

(১) রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালি, কলকাতা

(ক) ডরমিটরি—৬৩টি শয্যা। দৈনিক ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—২টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া—৬০ টাকা। (গ) অডিটোরিয়াম—১টি। ভাড়া সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো—৫০০ টাকা, বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮টা—১০০০ টাকা, সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা—১৫০০ টাকা।

(২) গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

(ক) ডরমিটরি—৫০টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৯টি ঘর। ভাড়া অছাত্র জনপ্রতি—৬০ টাকা।

(৩) দীঘা, মেদিনীপুর

(ক) ডরমিটরি—৮০টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১৫ টাকা। অছাত্র জনপ্রতি—৩০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৪টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—১০০ টাকা। (গ) চার শয্যা—১টি। ভাড়া—১৭৫ টাকা। (ঘ) ছয় শয্যা—১টি। ভাড়া—২৪০ টাকা। (ঙ) আট শয্যা—১টি। ভাড়া—৩০০ টাকা।

(৪) রামকিঙ্কর যুব আবাস, বাঁকুড়া

(ক) ডরমিটরি—২৬টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা। অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৬টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—৬০ টাকা।

(৫) মুকুটমণিপুর, বাঁকুড়া

ডরমিটরি—৩৩টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা।

(৬) বোলপুর, বীরভূম

(ক) ডরমিটরি—৩০টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (গ) দুই শয্যা— ২টি (বাতানুকূল)। ভাড়া ঘরপ্রতি—২৫০ টাকা। (গ) চারশয্যা—১টি। ভাড়া ১৭৫ টাকা।

(৭) শুশুনিয়া, বাঁকুড়া

(ক) ডরমিটরি—৩৮টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—১টি। ভাড়া—৬০ টাকা। (গ) তিন শয্যা—২টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—১০০ টাকা।

(৮) কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি

(ক) ডরমিটরি—৩৯টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি ২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—১টি। ভাড়া—৬০ টাকা। (গ) তিন শয্যা—১টি (স্পেশাল)। ভাড়া ১০০ টাকা।

(৯) লালবাগ, মুর্শিদাবাদ

ডরমিটরি—৫০টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৬টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—৬০ টাকা।

(১০) বক্রেশ্বর, বীরভূম

(ক) ডরমিটরি—৬৫টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) তিন শয্যা—৩টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—১০০ টাকা।

(১১) হাওড়া (ক্রীড়াঙ্গনে)

ডরমিটরি—২৪টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—৩০ টাকা।

(১২) নজরুল যুব আবাস, চুরুলিয়া

(ক) ডরমিটরি—৪২টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১৫ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—৩০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—২টি (সংলগ্ন স্নানাগার) ভাড়া ঘরপ্রতি—১০০ টাকা। (গ) স্যুট—১টি (বাথরুম ও রান্নাঘর সহ দুটি দুইশয্যা ঘর)। ভাড়া ১৮০ টাকা। (ঘ) মিটিং হল—১টি। ভাড়া—৩০০ টাকা।

(১৩) তেনজিং নোরগে যুব আবাস, দার্জিলিং

(ডব্লু বি এম এ এফ পরিচালিত)

(ক) ডরমিটরি—৪৪টি শয্যা। ভাড়া শয্যাপ্রতি—৪০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—২টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—১২০ টাকা। (গ) চার শয্যা—১টি। ভাড়া ২০০ টাকা। (ঘ) কনফারেন্স কক্ষ। ভাড়া ৬০০ টাকা।

(১৪) রাঁচি রোড, পুরুলিয়া

(ক) ডরমিটরি—৪২টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৪টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—৬০ টাকা।

(১৫) শিব্রাম ভবন, মালদা

(ক) ডরমিটরি—৪০টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) তিন শয্যা—১টি। ভাড়া ১০০ টাকা।

(১৬) পুরী, ওড়িশা

ডরমিটরি—২৭টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা।

(১৭) রাজগীর, বিহার

(ক) ডরমিটরি—১৪টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৫টি। ভাড়া ঘরপ্রতি—৬০ টাকা।

(১৮) ম্যাসাঞ্জোর, বিহার

(ক) ডরমিটরি—২৫টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১০ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—২টি (অতিরিক্ত দুই শয্যা সহ)। ভাড়া ঘরপ্রতি—৬০ টাকা।

(১৯) মাদ্রাজ যুব আবাস

(ক) ডরমিটরি—৬৯টি শয্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি—১৫ টাকা, অছাত্র জনপ্রতি—৩০ টাকা। (খ) দুই শয্যা—৮টি (কমন বাথ)। ভাড়া ঘরপ্রতি—১০০ টাকা। (গ) দুই শয্যা—১টি (পৃথক বাথ)। ভাড়া ঘরপ্রতি—১৩০ টাকা। (ঘ) তিন শয্যা—৫টি (কমন বাথ)। ভাড়া ঘরপ্রতি)১৩০ টাকা। (ঙ) তিন শয্যা—৩টি (সংলগ্ন স্নানাগার)। ভাড়া ঘরপ্রতি—১৭০ টাকা। (চ) চার শয্যা—৩টি (কমন বাথ)। ভাড়া ঘরপ্রতি—১৫০ টাকা। (ছ) চার শয্যা—৪টি (সংলগ্ন স্নানাগার)। ভাড়া ঘরপ্রতি—২০০ টাকা। (জ) তিন শয্যা—৩টি (বাতানুকূল)। ভাড়া ঘরপ্রতি—৩৫০ টাকা। (ঝ) চার শয্যা—২টি (ডিলাক্স, বাতানুকূল)। ভাড়া ঘরপ্রতি—৪৫০ টাকা।

সংরক্ষণের নিয়মাবলী

ওপরের যুব আবাসগুলি সংরক্ষণের জন্য সাধারণ সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়। তাতে কোথায় যাবেন, কতজন যাবেন, কবে যাবেন, কেন যাবেন, কতদিন থাকবেন, কী ধরনের ব্যবস্থা চাই (ডরমিটরি, দুই শয্যা, তিন শয্যা ঘর ....) ইত্যাদি তথ্য জানানো চাই। দরখাস্তের নিচে আবেদনকারীর পুরো নাম-ঠিকানা জানাতে হবে। সংস্থা বা সংগঠনের প্যাডেও আবেদন করা যায়। 'আগে এলে আগে পাবেন' এই ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। সরকারি ছুটির দিন বাদে যে কোনও কাজের দিন সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর তিনটে (দুপুর দেড়টা থেকে দুটো পর্যন্ত বিরতি) পর্যন্ত সংরক্ষণ কাউন্টার খোলা থাকে। পুজোর ছুটির আগে শেষ কাজের দিন ও মার্চ মাসের শেষ কাজের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য সংরক্ষণ বন্ধ থাকে।

একসঙ্গে দশজন পর্যন্ত যাঁরা যাবেন তাঁদের সংরক্ষণের দিনের ষাট দিন আগে এবং দশজনের বেশি দলগত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দিন থেকে পঁচাত্তর দিন আগে সংরক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ অর্থই জমা দিতে হবে।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ভ্রমণের বিবরণ ও ভ্রমণকারীর সম্পূর্ণ তালিকাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/বিভাগীয় প্রধান/অধ্যক্ষকে ওই প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন করতে হবে।

দুপুর বারোটা থেকে পরের দিন দুপুর বারোটা পর্যন্ত সময়কে একদিনের সংরক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। সাধারণত সর্বাধিক তিনদিন যুব আবাসে থাকার জন্য দেওয়া হয়। তবে মাদ্রাজ যুব আবাসে চিকিৎসার প্রয়োজনে সর্বাধিক পনেরো দিন থাকতে দেওয়া হতে পারে। সম্পূর্ণ সংরক্ষণ না হয়ে থাকলে স্থানীয় যুব আবাস কর্তৃপক্ষ তৎকাল-সংরক্ষণ (স্পট বুকিং) ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

সংরক্ষণের জন্য আবেদন করবেন এই ঠিকানায়

অধিকর্তা, যুব কল্যাণ অধিকার,
৩২/১, বি বা দী বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা—৭।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি ট্যুরিস্ট লজ

ট্যুরিস্ট লজ	বাতানুকূল দ্বি-শয্যার ঘর	সাধারণ দ্বি-শয্যার ঘর	ডরমিটরি / অন্যান্য সুবিধা	এক শয্যার ঘর	তিন শয্যার ঘর	ট্যুরিস্ট হাট
১। দার্জিলিং টুরিস্ট লজ ভানু সরণি, দার্জিলিং, দূরভাষ-(০৩৫৪) ৫৪৪১১/ ৫৪৪১২ / ৫৪৪১৩, ই-মেল : dortt @ dte. vsnl. net. in টেলিফ্যাক্স : ৫৪৪১২		১২০০ টাকা (১২টি ঘর) ১৬০০ টাকা (৩টি ঘর)				
২। মরগ্যান হাউস ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-কালিম্পং, জেলা-দার্জিলিং, পিনকোড-৭৩৪৩০১ দূরভাষ-(০৩৫৫২) ৫৫৩৮৪		২২০০ টাকা (১টি ঘর) ২৬০০ টাকা (ডিলাক্স, ১টি ঘর) ১৬০০ টাকা (৩টি ঘর) ১৪০০ টাকা (১টি ঘর)	৫০০ টাকা (১টি ঘর)			
৩। তাসি ডিং ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-কালিম্পং, জেলা-দার্জিলিং, পিনকোড-৭৩৪৩০১ দূরভাষ : (০৩৫৫২) ৫৫৯২৯		১৬০০ টাকা (সংলগ্ন শৌচালয়সহ ৩টি ঘর) ১৪০০ টাকা (সাধারণ শৌচালয়সহ ১টি ঘর)	৫০০ টাকা (১টি ঘর)			
৪। হিলটপ ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-কালিম্পং, জেলা-দার্জিলিং পিনকোড-৭৩৪৩০১ দূরভাষ-(০৩৫৫২) ৫৫৬৫৪		(৮২৫ টাকা (১টি ঘর)	২৭৫ টাকা শয্যাপ্রতি (১০ শয্যার ২টি ঘর)		১১০০ টাকা (৬টি ঘর)	
৫। কার্শিয়াং ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-কার্শিয়াং, জেলা-দার্জিলিং পিনকোড-৭৩৪২৮৩ দূরভাষ-(০৩৫৪) ৪৪৪০৯/৪৫৬০৮, টেলিফ্যাক্স : (০৩৫৪) ৪৪৪০৯		৬৫০ টাকা (৪টি ঘর) ৬০০ টাকা (১২টি ঘর)	পানশালা ও চটজলদি খাবারের ব্যবস্থা			
৬। মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিনকোড-৭৩৪৪০৩ দূরভাষ-(০৩৫৩)৪৩২৮৩০/৪৩০৯৮৬ টেলিফ্যাক্স : (০৩৫৩) ৪৩২৮৫৯ ই-মেল : maitl @ dte. vsnl. net. in	২০০০ টাকা (স্যুট) (১টি ঘর) ১০০০ টাকা (সুপার ডিলাক্স ২টি ঘর) ৮৫০ টাকা (৩টি ঘর) ৪৫০ টাকা (ডিলাক্স (৫টি ঘর) ৩৫০ টাকা (ডিলাক্স এক শয্যার ঘর)	৭৫০ টাকা (১৪টি ডিলাক্স ঘর) ৫০০ টাকা (১০টি সাধারণ ঘর)	বাতানুকূল পানশালা বাতানুকূল সম্মেলন কক্ষ			

টুরিস্ট লজ	বাতানুকূল দ্বি-শয্যার ঘর	সাধারণ দ্বি-শয্যার ঘর	ডরমিটরি / অন্যান্য সুবিধা	এক শয্যার ঘর	তিন শয্যার ঘর	ট্যুরিস্ট হাট
৭। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-মাদারিহাট, জেলা-জলপাইগুড়ি পিনকোড : ৭৩৫২২০, টেলিফ্যাক্স : (০৩৫৬৩) ৬২২৩০		১০০০ টাকা (১০টি ঘর)	৩০০ টাকা শয্যাপ্রতি (৫ শয্যার ২টি ঘর) ৩০০ টাকা শয্যাপ্রতি (৪ শয্যার ১টি ঘর)			৬৫০ টাকা (৬টি হাট)
৮। রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-মধুপুর, ভায়া রায়গঞ্জ জেলা-উত্তর-দিনাজপুর, পিনকোড-৭৩৩১৩৪ দূরভাষ-(০৩৫২৩)২৫২৮৫, ২৫৯১৫		৩৫০ টাকা (৮টি ঘর)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৪ শয্যার ১টি ঘর)			
৯। বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, পিনকোড-৭২২১২২ দূরভাষ-(০৩২৪৪) (৫২০১৩)	৫০০ টাকা (১টি ঘর ডিলাক্স) ৪৪০ টাকা (৪টি ঘর)	৩৩০ টাকা (১টি ঘর ডিলাক্স) ৬১০ টাকা (৪টি ঘর)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৪ শয্যার ১টি ঘর) পানশালা			
১০।মালদহ ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-মালদহ, জেলা-মালদহ, পিনকোড-৭৩২১০১ দূরভাষ-(০৩৫১২) ৬৬১২৩, ৬৬৯১১	৬৬০ টাকা (১টি ঘর ডিলাক্স) ৫০০ টাকা (৩টি ঘর)	৩৩০ টাকা (৪টি ঘর) ১৬৫ টাকা (৫টি ঘর সাধারণ শৌচালয় সহ)				
১১।বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিনকোড-৭৪২১৮১ দূরভাষ-(০৩৪৮২) ৫০৪৩৯	৫০০ টাকা (২টি ঘর ডিলাক্স) ৪৫০ টাকা (২টি ঘর)	৪০০ টাকা (২টি ঘর) ২৫০ টাকা (৫টি ঘর)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৪ শয্যার ২টি ঘর)			
১২।শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিনকোড-৭৩১২০৪ দূরভাষ-(০৩৪৬৩) ৫২৬৯৯, ৫২৩৯৮	৭৫০ টাকা (১২টি ছোট ঘর) ১০০০ টাকা (২টি ডিলাক্স ঘর) ৮৫০ টাকা (৩টি ঘর)	৪০০ টাকা (৮টি ঘর) ৩০০ টাকা (৯টি ঘর)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (১৩ শয্যার ১টি ঘর (ক্যাম্পখাট)		৪৫০ টাকা (৪টি ঘর)	
১৩।পথিক মোটেল, দুর্গাপুর দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান, পিন : ৭১৩২১৬ দূরভাষ-(০৩৪৩)৫৪৬৩৯৯/৫৪৫৭৬৮ টেলিফ্যাক্স : (০৩৪৩) ৫৪৫৭৬৮	৭৫০ টাকা (সুপার ডিলাক্স ২টি ঘর) ৬৫০ টাকা (১০টি ডিলাক্স ঘর)		পানশালা ও সম্মেলনকক্ষ			

টুরিস্ট লজ	বাতানুকূল দ্বি-শয্যার ঘর	সাধারণ দ্বি-শয্যার ঘর	ডরমিটরি / অন্যান্য সুবিধা	এক শয্যার ঘর	তিন শয্যার ঘর	ট্যুরিস্ট হাট
১৪। দীঘা ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-দীঘা, জেলা-মেদিনীপুর, পিনকোড-৭২১৪২৮ দূরভাষ-(০৩২২০) ৬৬২৫৫, ৬৬২৫৬	৬৬০ টাকা (২টি ডিলাক্স ঘর) ৫৫০ টাকা (২টি ঘর)	৫০০ টাকা (১টি ঘর) (একতলা) ৪৫০ টাকা (২টি ঘর) (তিনতলা) ৩৮৫ টাকা (দোতলার ২টি ঘর) ৩৩০ টাকা (একতলা ২টি ঘর) ২৫০ টাকা (তিনতলা ৮টি ঘর)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৫ শয্যার ১টি ঘর) পানশালা, সম্মেলনকক্ষ (অনুরোধসাপেক্ষে)		৪৪০ টাকা দোতলা ২টি ঘর ৩৮৫ টাকা একতলা ২টি ঘর	
১৫। সাগরিকা ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-ডায়মণ্ডহারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনঃ-৭৪৩৩৩১, দূরভাষ-(০৩১৭৪) ৯১৭৪-৫৫২৪৬/৫৫২৬২, টেলিফ্যাক্স : (০৩১৭৪)৯১৭৪-৫৫২৪৬	৭৭০ টাকা (১টি সুপার ডিলাক্স ঘর) ৬৫০ টাকা (২টি ঘর (ডিলাক্স) ৫৫০ টাকা (৪টি ঘর)	৩৮৫ টাকা (৬টি ঘর) ২৭৫ টাকা (৪টি ঘর) ১১০ টাকা (৬টি ঘর)	৩০ টাকা শয্যাপ্রতি (৪ শয্যাবিশিষ্ট ৪টি ঘর)			
১৬। মালঞ্চ ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-ব্যারাকপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১০১, দূরভাষ-(০৩৩) ৫৬০০০৫৮	৬৫০ টাকা (২টি ঘর)	৫০০ টাকা (৬টি ঘর) ৩০০ টাকা (২টি কটেজ)				
১৭। বকখালি ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-লক্ষ্মীপুর প্রবর্তক, ভায়া-নামখানা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৫০০ টাকা (২টি ঘর)	৩৫০ টাকা (সাধারণ শৌচালয়সহ ১০টি ঘর) ৩০০ টাকা (সংলগ্ন বাথরুমসহ ২ ঘরের কটেজ)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৮ শয্যাবিশিষ্ট ৩টি ঘর)			
১৮। রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-দক্ষিণ শিবপুর, গাদিয়াড়া, জেলা-হাওড়া, পিনঃ ৭১১৩১৪ দূরভাষ : (০৩২১৪)৯১১৪-৬৪২৮৬	৫০০ টাকা (২টি ঘর)	৩৩০ টাকা (৪টি ঘর) ৩০০ টাকা (৬টি ঘর) ৩০০ টাকা (৮টি ঘর)	২৫০ টাকা কটেজ (১টি)			
১৯। সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজ পোঃ-গোসাবা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৯, দূরভাষ : (০৩২১৯)৫২৫৬০		৫২৫ টাকা (৩০টি ঘর) (২০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি ঘর)	২০০ টাকা শয্যাপ্রতি (ক্যাম্পখাট)			
২০। উদয়াচল ট্যুরিস্ট লজ ডি জি ব্লক, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ দূরভাষ-(০৩৩) ৩৩৭-৮২৪৬	৮২৫ টাকা (৫টি ঘর)	৪৫০ টাকা (১০টি ঘর)	৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৪টি শয্যাবিশিষ্ট ৪টি ঘর) ৮০ টাকা শয্যাপ্রতি (৬টি শয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘর)		৫০০ টাকা (৩টি ঘর)	

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বন-আবাস

সংরক্ষণ মূল্য

বন বিশ্রামগৃহ বা প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র	আবাসন	সময় (টাকায়)	অসময় (টাকায়)	সংরক্ষণ ব্যবস্থা	যাতায়াত
১। লাভা প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র ও বনভূমি	দ্বিশয্যার লগ কেবিন (২)			পর্যটন বিভাগ প.ব.	কালিম্পং থেকে সড়কপথে
	কেবিন—১	৪৫০.০০	৩৫০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর	৩২ কি.মি. ও ডামডিম
	কেবিন—২	৪৫০.০০	৩৫০.০০	প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	থেকে ৪৫ কি.মি.
	১০ শয্যার ডরমিটরি (১)				
	সম্পূর্ণ	৬৫০.০০	৫৫০.০০		
	শয্যাপ্রতি	৮০.০০	৭০.০০		
	১০ শয্যার ডরমিটরি (২)	৬৫০.০০	৫৫০.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর)	
	সম্পূর্ণ	৮০.০০	৭০.০০	প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
	চারটি দ্বিশয্যার কুটির			সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ	
	ডুকপা—১	৩০০.০০	২৫০.০০	প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
	ডুকপা—২	৩০০.০০	২৫০.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর)	
	ডুকপা—৩	৩০০.০০	২৫০.০০	প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
	ডুকপা—৪	৩০০.০০	২৫০.০০	জেলাশাসক, কালিম্পং	
				(গোর্খা হিল কাউন্সিল)	
	তিনটি দ্বিশয্যার তাঁবু			সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর)	
	তাঁবু—১	২২৫.০০	১৭৫.০০	পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম	
	তাঁবু—২	২২৫.০০	১৭৫.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ,	
	তাঁবু—৩	২২৫.০০	১৭৫.০০	প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
	দ্বিশয্যার ঘর (২টি)				
	গোর্খা—১	৩০০.০০	২৫০.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ,	
	গোর্খা—২	৩০০.০০	২৫০.০০	প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
	৩টি দ্বিশয্যার অ্যালুমিনিয়াম তাঁবু				
	(ক) পাইন	২৫০.০০		পর্যটন বিভাগ	
	(খ) ফার	২৫০.০০		প.ব. সরকার	
	(গ) হেমলক	২৫০.০০.			

২।	লোলেগাঁও প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র ও বনভূমি	স্যুট (৪টি) বার্চ সাইপ্রাস	 ৩৫০.০০ ২৫০.০০	 ৩০০.০০ ২০০.০০	পর্যটন বিভাগ, প.ব. সরকার	
		সিলভার ওক পাইনস	৪০০.০০ ২৫০.০০	৩০০.০০ ২০০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
		দুটি দ্বিশয্যার তাঁবু তাঁবু—১ তাঁবু—২	 ২২৫.০০ ২২৫.০০	 ১৫০.০০ ১৫০.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ প.ব. বন উন্নয়ন নিগম ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
		২টি তিন শয্যার তাঁবু	২৭৫.০০	১৭৫.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর) প.ব. বন উন্নয়ন নিগম ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
		৩টি দ্বিশয্যার অ্যালুমিনিয়াম তাঁবু	২৫০.০০		পর্যটন বিভাগ প. ব.	
		৩টি তিন শয্যার ডরমিটরি	২২০.০০		জেলাশাসক, কালিম্পং (গোর্খা হিল কাউন্সিল)/	
		১ দ্বিশয্যার ডরমিটরি	১৫০.০০		ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
৩।	কালিম্পং শৈলাবাস	তিনটি দ্বিশয্যার স্যুট	৫০০.০০	৪০০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর) প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে ৫৬ কি.মি.
৪।	সামসিং বন বিশ্রামগৃহ		২৫০.০০	২০০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	চালসা থেকে সড়কপথে ২০ কি.মি.
৫।	সান্তালেখোলা আরণ্যক ক্যাম্প	দুটি দ্বিশয্যার ক্যাম্প দুটি দ্বিশয্যার কুটির	২২৫.০০ ৬০০.০০	১৭৫.০০ ৩৫০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	

৬।	তারখোলা আরণ্যক ক্যাম্প	৪টি দ্বিশয্যার তাঁবু	২২৫.০০		ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর) প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	কালিম্পং থেকে সড়কপথে ১ ঘণ্টা
৭।	রংপো	দুটি দ্বিশয্যার স্যুট	৩৫০.০০	৩০০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
৮।	জলঢাকা বন বিশ্রামগৃহ	দুটি দ্বিশয্যার স্যুট	৪০০.০০	৩৫০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. রন উন্নয়ন নিগম	চালসা থেকে সড়কপথে ৩৫ কি.মি.
৯।	রসিকবিল প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র	দুটি আটশয্যার ডরমিটরি দুটি দ্বিশয্যার কুটির ৪টি তাঁবু	৭৫.০০ (শয্যাপ্রতি) ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১৫০.০০	৫০.০০ (শয্যাপ্রতি) ৪০০.০০ ৪০০.০০ ১০০.০০	ওই প.ব. বন উন্নয়ন নিগম জেলাশাসক, বক্সা ডিভিশন (লগিং) ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার থেকে ৪৫ কি.মি.
১০।	হাতিবাড়ি অরণ্য চেতনা ও শিক্ষণ ক্যাম্প		১৫০.০০	১৫০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডি এফ ও মেদিনীপুর ডিভিশন	
১১।	সোনাঝুরি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র মুকুটমণিপুর	দুটি দ্বিশয্যার কুটির দুটি ছয়শয্যার ডরমিটরি দুটি ঐতিহ্যবাহী কুটির কুটির—১ (একটি ঘর) কুটির—২ (তিনটি ঘর)	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ (ঘরপ্রতি)	৩০০.০০ ৩০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	
১২।	মূর্তি প্রকৃতি ও পরিবেশ বীক্ষণ কেন্দ্র,	একটি দ্বিশয্যার স্যুট (একতলা) মূর্তি, জলপাইগুড়ি একটি দ্বিশয্যার স্যুট (জলঢাকা) (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত) একটি দ্বিশয্যার স্যুট (মূর্তি) (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত) দোতলার ডরমিটরি একটি চারঘরের ডরমিটরি	৬০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০	৫০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০	সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর) প.ব. বন উন্নয়ন নিগম ওই ম্যানেজিং ডিরেক্টর প.ব. বন উন্নয়ন নিগম ওই সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ (উত্তর) প.ব. বন উন্নয়ন নিগম	

১৩।	দুয়ারসিনি পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র	৩টি দ্বিশয্যার কুটির	৩০০.০০	১৭৫.০০	ডি এফ ও/কংসাবতী এস. পি. ডিভিশন-২	পুরুলিয়া/দুর্গাপুর থেকে বাসে বান্দোয়ান, বান্দোয়ান থেকে দুয়ারসিনি ১২ কি.মি.
১৪।	কাঁকড়াঝোড় পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র	তিনটি দ্বিশয্যার ঘর (একতলা)	৩০০.০০	১৭৫.০০	ডি এম ফরেস্ট কর্পোরেশন (দক্ষিণ) ডি এফ ও পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিশন	ঝাড়গ্রাম থেকে সড়কপথে ৬৫ কি.মি.
		চারটি দ্বিশয্যার ঘর (দোতলা)	৪০০.০০	২৫০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম	
১৫।	গড় পঞ্চকোট পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র	কুটির—১ ২টি দ্বিশয্যার ঘর	৪৫০.০০	৩০০.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম ও ডি এফ ও/কে এস সি—১	আসানসোল থেকে সড়ক পথে ৬০ কি.মি. ও পুরুলিয়া থেকে ৬৫ কি.মি.
।		কুটির—২ ৪টি দ্বিশয্যার ঘর	৩০০.০০	১৭৫.০০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম ও ডি এফ ও/কে এস সি—১	

বিভিন্ন আবাসনের অসময় বা অফ সিজন

কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, লেপচা জগত—১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর
ও
১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি

মংপং, রঙপো, জলঢাকা, সামসিং, সান্তালে খোলা—১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর

গরুবাথান, মাদারিহাট, রসিকবিল, মূর্তি—১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর

মুকুটমণিপুর—১ মে থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর

দুয়ারসিনি, কাঁকড়াঝোড়—১ মে থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর

গড়পঞ্চকোট—মে থেকে আগস্ট

বুকিং অফিসের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর

	বুকিং অফিসের নাম	ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর
১।	ম্যানেজিং ডিরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম	৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, সপ্তমতল, কলকাতা—৭০০ ০১৩	২৩৭-০০৬০/২৩৭-০০৬১
২।	বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ, কালিম্পং (সাধারণ ও বিশেষ) বিভাগ	ডাকঘর : কালিম্পং, জেলা : দার্জিলিং, পিন ৭৩৪৩০	এস টি ডি (০৩৫৫২) ৫৫৭৮০/৫৫৭৮৩
৩।	বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ, বন উন্নয়ন (দক্ষিণ) বিভাগ	২, ভেটেরিনারি হসপিটাল রোড, ডাকঘর : ইন্দা, খড়গপুর, জেলা : মেদিনীপুর, পিন ৭২১১০১	এস টি ডি (০৩২২২) ৫৫৪৪৮
৪।	বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ, বক্সা (লগিং) বিভাগ	ইটখোলা, ডাকঘর : আলিপুরদুয়ার, জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন ৭৩৪৪০১	এস টি ডি (০৩৫৬৪) ৫৫০০৪
৫।	বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ শ' মিলিং ডিভিশন	হাকিমপাড়া, ডাকঘর ও জেলা জলপাইগুড়ি পিন ৭৩৫১০১	এস টি ডি (০৩৫৬১) ২২৯৪৫
৬।	জেনারেল ম্যানেজার (উত্তর) পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম, শিলিগুড়ি	হাকিমপাড়া, ডাকঘর : শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং	এস টি ডি (০৩৫৩) ৪৩২৫৯৯
৭।	ডি এফ ও, পশ্চিম মেদিনীপুর বিভাগ	ডাকঘর : ঝাড়গ্রাম, জেলা : মেদিনীপুর	এস টি ডি (০৩২২১) ৫৫০১০
৮।	বিভাগীয় বন আধিকারিক মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগ—২	ডাকঘর : রাঘবপুর, জেলা : পুরুলিয়া	এস টি ডি (০৩২৫২) ২২৬০৪
৯।	বিভাগীয় বন আধিকারিক, কংসাবতী মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগ—১	ডাকঘর রাঘবপুর, জেলা পুরুলিয়া	এস টি ডি (০৩২৫২) ২২২৩১

হলিডে হোমের তালিকা

বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে সরকারি পর্যটন আবাস ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের হলিডে হোম। এঁদের কর্মী বা সদস্যরা ছাড়াও বাইরের ভ্রমণার্থীরা এইসব জায়গায় থাকার সুযোগ পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত এলাকার বেশ কিছু হলিডে হোমের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

কালিম্পং

অন্বেষা গেস্টহাউস,
২৫, নীলাচল, বিরাটী, কলকাতা-৫১,
ফোন ৫১২-০০৬৬
১২এ, এন এস রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৬৯৫৩,
৫/১, ক্লাইভ রো, ৫ম তল,
কলকাতা-১, ফোন ২৪৩-১২৪৪

গালুডি

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পশ্চিমবঙ্গ),
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
ফোন ২২০-৮৩৭৫, (এক্সটেনশন-১২৩)

গ্যাংটক

অন্বেষা গেস্টহাউস,
২৫, নীলাচল, বিরাটী, কলকাতা-৫১,
ফোন ২২-৬৯৫৩, ৫১২-০০৬৬/৩৭২৩

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন,
১৬, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৭৪৭১ (এক্স-৫৩০/৬১২)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কংগ্রেস,
১৬, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৩-০৩৯৩, ২৪৮-৭৪৭১
(এক্সটেনশন-৫০৪)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর এমপ্লয়িজ হলিডে হোম সাব-কমিটি,
ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪২-২৫০৫/৬৪৫০,
২২০-৩৬৭৭/১৭১০

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্ট্স অফিস,
৩বি, লালবাজার স্ট্রিট, (৩য় তল),
কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৬০৫৫

স্টোর্স রিক্রিয়েশন ক্লাব
চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস,
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭২,
ফোন ২৩৭-৪০৪৪/৪০৪৬
(এক্সটেনশন-২৪২, ২১৯)

সেন্টক্রশ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,
রেডক্রশ প্লেস শাখা, কলকাতা-১
ফোন ২৪৮-৯২৯১

ব্যাঙ্ক অব বরোদা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
২২১-৪৪৬৭, ২২০-৬০৭৬/৭৭/৭৮

রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি,
সল্টলেক সিটি, সেক্টর-২, করুণাময়ী,
কলকাতা-৯১, ফোন ৩৩৪-৭০১৩

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
দ্বারভাঙা বিল্ডিং, কলকাতা-৭২,
ফোন ২৪১-৪৬৪২

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৫, লিন্ডসে স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭,
ফোন ২১৭-২৩৪৭

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-০২১৩/১৮২৬/২৮২৩

ইউকো জোনাল ক্লাব, ইউকো ব্যাঙ্ক অপারেশন-৩,
মার্টিন বার্ন বিল্ডিং (৪র্থ তল), ১ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৮০৪৫, ৪৬৮২, ৬০৯১,
২১০-১১৩০

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন,
ক্যালকাটা মেইন ব্রাঞ্চ ইউনিট, ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-২২১৫/৬৯২৯

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-০৮৪১

আজকাল রিক্রিয়েশন ক্লাব,
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯,
ফোন ৩৫০-৯৮০৩ (এক্সটেনশন ৩৪৩, ৩২৮)

ইউ বি আই স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি (হাজরা রোড শাখা), হাজরা মোড়, কলকাতা-২৬,
ফোন ৪৭৫-৪৭৬৮

ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, পি-১৩, চৌরঙ্গি স্কোয়্যার,
কলকাতা-৬৯,
ফোন ২৪৮-২৩৬১-৬৭ (এক্সটেনশন-৬০১)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
৩৮, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৬৮৬৮/২৭০২

হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশন মার্কেটিং ডিভিশন রিক্রিয়েশন ক্লাব,
৪১, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭১,
ফোন ২২৬-১১৫১/১৪০৩

টি বোর্ড হলিডে হোম কমিটি,
১৪, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১
ফোন ২৩৫-১৪১১

পি ভি সি এল রিক্রিয়েশন ক্লাব,
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-২০২৪

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক,
১১, আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯,
ফোন : ২১০-৭৯১৯, ২৪৮-৯৪১৩

কিলবার্ন (এম অ্যান্ড এম) এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৪, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-২৩৯১ (এক্সটেনশন-৩২৬/৩২৮)

ইউ বি আই গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চ এমপ্লয়িজ হলিডে হোম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,
২৬ ও ২৬/৭, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯,
ফোন ৪৬৪-৩৪১৬/৩৩৯২

ক্যালকাটা টেলিফোনস রিক্রিয়েশন ক্লাব (সেন্ট্রাল ইউনিট),
১২০, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩,
ফোন ২৪৫-০৩৭৫/০৫০২

ইউকো ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, (৪র্থ তল) কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৮৮১২/১৫/১৭

ইউ বি আই (শ্রদ্ধানন্দ পার্ক শাখা) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
২৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯,
ফোন ৩৫০-৩৯৬৯

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস,
১৬এ, ব্র্যাবোর্ন রোড, দেনা ব্যাঙ্ক বিল্ডিং (থার্ড ফ্লোর) কলকাতা-১,
ফোন ২৩৫-১৭৭৮

ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৩৯৯৬

দি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২১-১৭১০, ২২০-৮৫৬৪

দি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড,
(৩য় ও ৪র্থ তল), কলকাতা-১,
ফোন ২২১-১৭১০, ২২০-৮৫৬৪

টাটা স্টিল স্পোর্টস ক্লাব,
৪৩, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭১,
ফোন ২৪৪-৮০৫৫/৮৩৭৪

ঘাটশিলা

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-০৮৪১

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
১০, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৭৬৫২

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস,
১৬এ, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৩৫-১৭৭৮

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস অফিস, ৩বি লালবাজার স্ট্রিট, (৩য় তল), কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৬০৫৫

চাঁদিপুর

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস,
১৬-এ, ব্র্যাবোর্ন রোড, দেনা ব্যাঙ্ক বিল্ডিং (থার্ড ফ্লোর), কলকাতা-১,
ফোন ২৩৫-১৭৭৮

দার্জিলিং

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন,
১৬, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১,
২য় তল, ইউনিয়ন অফিস,
ফোন ২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন-৬১২)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ,
১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ, প্লেস, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৬৮৬৮/৬৯, ২৭০১/০২

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি
(হাজরা রোড, লেক গার্ডেন্স ও পার্ক স্ট্রিট শাখা) হাজরা মোড়, কলকাতা-২৬,
ফোন ৪৭৫-৪৭৬৮/৪৭৩-০৪১৪/ ২২৯-৯৫১৬

কিলবার্ন (এম অ্যান্ড এম) এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৪, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৩-৫৩৯১ (এক্সটেনশন-৩৬০)

সেন্টক্রশ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রেডক্রশ প্লেস শাখা, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৯২৯১

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক,
১১, আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯,
ফোন ২১০-৭৯১৯, ২৪৮-৯৪১৩

ব্যাঙ্ক অব বরোদা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১,
ফোন ২২১-৪৪৬৭, ২২০-৬০৭৬/৭৭/৭৮

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৫, লিভসে স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭,
ফোন ২১৭-২৩৪৭

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৪, এন সি দত্ত সরণি, (ফিফ্‌থ ফ্লোর), কলকাতা-১, ফোন ২২০-০৮৪১

ইউকো জোনাল ক্লাব, ইউকো ব্যাঙ্ক অপারেশন-৩,
মার্টিন বার্ন বিল্ডিং (৪র্থ তল), ১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৮০৪৫, ৪৬৮২, ৬০৯১, ২১০-১১৩০

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস,
১৬এ, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৩৫-১৭৭৮

রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
ডি কে ব্লক, সেক্টর-২, সল্ট লেক সিটি, করুণাময়ী, কলকাতা-৯১,
ফোন ৩৩৪-৭০১৩

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর এমপ্লয়িজ হলিডে হোম সাব-কমিটি,
ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪২-২৫০৫/৬৪৫০, ২২০-৩৬৭৭/১৭১০

সাঁতরাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড কোনা রোড,
ষষ্ঠীতলা, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৭১১ ১০৪,
ফোন ৬৬৭-২১৭০

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,
৮, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন ২৪৮-৪৫৮৫

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব,
১৪, ইন্ডিয়া একচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৮৩৭৫ (এক্সটেনশন-১০৫)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
(গড়িয়াহাট শাখা) শ্রমিক কর্মচারী সমিতি,
২৬ ও ২৬/৭, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯,
ফোন ৪৬৪-৩৪১৬/৩৪০৮

গ্রিভস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
২৫, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪২-৪৩২১ (এক্সটেনান-১৩৯)

স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অভারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৫২/১এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলকাতা-১৯, ফোন ৪৭৪-১৩৯৯/১৩৯৬

আজকাল রিক্রিয়েশন ক্লাব,
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯,
ফোন ৩৫০-৯৮০৩ (এক্স ৩২৪, ৩৪৩)

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন,
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-২১৮১

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব,
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-১,
ফোন ৬৬০-৩২১১/১৩ (এক্সটেনশন ২৬৭)

টি বোর্ড হলিডে হোম কমিটি,
১৪, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৩৫-১৪১১

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস্ অফিস,
৩বি, লালবাজার স্ট্রিট (৩য় তল),
কলকাতা-১, ফোন ২৪৮-৬০৫৫

দি ই এল এম আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
১, তারাতলা রোড, কলকাতা-২৪,
ফোন ৪৬৯-৫৪৪৬/৬৬/৬৭

ইউকো ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৮৮১৭

ইউ বি আই (রয়েল এক্সচেঞ্জ শাখা)
১০, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৭৬৫২-৫৪

দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬,
ফোন ২৪৪-১০৩১/৩৪/৩৫,
২৪৫-০৬০২/০৪৯২

দীঘা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন,
১৬, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-১,
২য় তল, ইউনিয়ন অফিস,
ফোন ২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন-৬১২)

ক্যালকাটা টেলিফোনস রিক্রিয়েশন ক্লাব (সেন্ট্রাল ইউনিট),
১২০, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩,
ফোন ২৪৫-০৩৭৫/০৫০২

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কান্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি,
যাদবপুর, কলকাতা-৩২,
ফোন ৪৭৩-৪৯৭১

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্ট্স অফিস, ৩বি, লালবাজার স্ট্রিট (৩য় তল), কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৬০৫৫

দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬,
ফোন ২৪৪-১০৩১/৩৪/৩৫,
২৪৫-০৬০২/০৪৯২

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
ফোন ৪৭০-৩৭৬৯

সেন্টক্রশ রিক্রিয়েশন ক্লাব, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,
রেডক্রশ প্লেস শাখা, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৯২৯১

রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
ডি কে ব্লক, সেক্টর-২, সল্টলেক সিটি, করুণাময়ী, কলকাতা-৯১,
ফোন ৩৩৪-৭০১৩

ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব,
পি-১৩, চৌরঙ্গি স্কোয়্যার, কলকাতা-৬৯,
ফোন : ২৪৮-২৩৬১/৭১ (এক্সটেনশন-৬০১)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর এমপ্লয়িজ হলিডে হোম সাব-কমিটি,
ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪২-২৫০৫/৬৪৫০, ২২০-৩৬৭৭

ইউকো ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট (৪র্থ তল), কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৮৮১২/১৫/১৭

ইউ বি আই (রয়েল এক্সচেঞ্জ শাখা),
১০, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
ফোন ২২০-৭৬৫২-৫৪

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-০৮৪১

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন,
ক্যালকাটা মেইন ব্রাঞ্চ ইউনিট, ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-২২১৫/৬৯২৯

কানাড়া ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
২৫, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা-১৬,
ফোন.: ২৭-৫৩০৬/০৭

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব,
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোন ৬৬০-৩২১১/১২

বসুমতী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
১৬৬ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২,
ফোন ৩৫০-৯৪৬২

গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড,
৩৩, যশোহর রোড, দমদম, কলকাতা-২৮
ফোন ৫৫১-৪৭৭৩

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
৩৮, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৬৮৬৭/২৭০১

কানাড়া ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ২২০-১৯৬৬/২০১৫

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব,
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৮৩৭৫ (এক্সটেনশন-১০৫)

স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড,
৫২/১/এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯,
ফোন ৪৭৪-১৩৯৬/১৩৯৯

ইউ বি আই গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চ এমপ্লয়িজ হলিডে হোম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,
২৬ ও ২৬/৭, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯,
ফোন ৪৬৪-৩৪১৬/৩৩৯২

গ্রিভ্স রিক্রিয়েশন ক্লাব,
২৫, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪২-৪৩২১ (এক্সঃ-১৩৯)

সাঁতরাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
কোনা রোড, ষষ্ঠিতলা, সাঁতরাগাছি,
হাওড়া-৭১১ ১০৪
ফোন ৬৬৭-২১৭০

টাটা স্টিল স্পোর্টস ক্লাব,
৪৩, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭১,
ফোন ৩৪৪-৮০৫৫/৮৩৭৪

ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস মেকার (ইন্ডিয়া)
পি-৪৫/১, ননীগোপাল রায়চৌধুরী অ্যাভেনিউ, (সি আই টি স্কিম-৫২), এন্টালি, কলকাতা-১৪, ফোন ২৪৪-২০৫১, ২৪৯-২৭১৬

দেওঘর

বার্ড হিলজার্স এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,
৪, নেতাজি, সুভাষ রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন ২২০-৮৯৫২

কানাড়া ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
২, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন ২৪২-৭১০৫/৭১০৭/৪৫৭৯

ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব,
পি-১৩, চৌরঙ্গি স্কোয়্যার, কলকাতা-৬৯,
ফোন ২৪৮-২৩৬১/৭১ (এক্সটেনশন-৬০১)

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড,
৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন ২২০-০৮৪১

ব্যাঙ্ক অব বরোদা আই বি বি স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
৮, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১,
ফোন ২৪২-২৬৯৭/৯১

পেলিং

ইউকো জোনাল ক্লাব, ইউকো ব্যাঙ্ক অপারেশন,
৩, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, (৪র্থ তল),. ১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৮০৪৫, ৪৬৮২, ৬০৯১, ২১০-১১৩০

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব,
সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস অফিস, ৩বি, লালবাজার স্ট্রিট, (৩য় তল), কলকাতা-১,
ফোন ২৪৮-৬০৫৫

দি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৩য় ও ৪র্থ তল), কলকাতা-১,
ফোন ২২১-১৭১০

ইউকো ব্যাঙ্ক স্টাফ ক্লাব,
১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১, ফোন ২৪২-২৮৮৫, ২২০-৮৮১৫-১৭ (এক্সটেনশন-২৩) অথবা ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ, ফোন ২২০-৩৩৮৩/৮৬

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাসটি লিমিটেড
৪, এন সি দত্ত সরণি (৫ম তল), কলকাতা-১, ফোন ২২০-০৮৪১

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলকাতা-১,
ফোন ২২০-২১৮১

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া শ্রমিক কর্মচারী সমিতি,
২৬ ও ২৬/৭, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯,
ফোন ৪৬৪-৩৪১৬/৩৪০৮

ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব,
পি-১৩, চৌরঙ্গী স্কোয়্যার, কলকাতা-৬৯,
ফোন ২৪৮-২৩৬১/৭১ (এক্সটেনশন-৬০১)

ইউকো ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব;
১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট (৪র্থতল) কলকাতা-১, ফোন ২২০-৮৮১২/১৫/১৭

বকখালি

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন,
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলতাতা-১
ফোন ২২০-২১৮১

শান্তিনিকেতন

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩,
ফোন ২২৮-০৮৩৭

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯
ফোন ৩৫০-৩৯৬৯

অ্যান্ড্রু ইয়ুলস কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
৮, ক্লাইভ রো, কলকাতা-১৩,
ফোন ২৪২-৮২১০ (এক্স-২১২)

শিমুলতলা

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ অ্যাশিওরেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
৬, লায়ন্স রেঞ্জ (দ্বিতল), কলকাতা-১,
ফোন ২২০-৯৬৪১/৪৩

স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ব্যাঙ্ক অব বরোদা,
ইউ সি রোড ব্রাঞ্চ, পি-৬০, বি কে পাল অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫
ফোন ৫৩০-৬৩২০, ৫৪৩-১০৪৫

হলদিয়া

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড, শ্রমিক কল্যাণ ভবন
পি-৩, সি আই টি, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৫৪, ফোন ৩৩৪-৭৬২৩, ৭৬৬৪

বি: দ্র: *কোনও কোনও ক্ষেত্রে টেলিফোন নম্বর বদল হয়ে থাকতে পারে।*

ভারত সরকারের আঞ্চলিক পর্যটন কার্যালয়ের অনুমোদিত ট্যুর অপারেটরদের তালিকা

১। **ডায়মন্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস,**
৩০, যদুনাথ দে রোড, কলকাতা-১২।

২। **কুমারন ট্রাভেলস,**
১২৫, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭৩।

৩। **ভারত তীর্থ দর্শন,**
৩৪, স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-১।

৪। **ডি জে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস,**
৪/২, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯।

৫। **ওঙ্কার ট্রাভেলস,**
৯১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৬।

৬। **সোনা ইন্টারন্যাশনাল,**
১৭, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-১২।

৭। **হিমালয়ান হলিডেজ,**
৩০৯,বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২।

৮। **তিরুপতি স্পেশ্যাল,**
১-বি, গোকুল বড়াল স্ট্রিট, কলকাতা-১২।

৯। **ইউ-পিক ট্রাভেলস,**
২, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩।

১০। **ক্ল্যাসিক ট্রাভেলস,**
স্টিফেন হাউস, রুম নং ২ ও ৩, দোতলা, বি বা দী বাগ, কলকাতা-১।

১১। **ট্রাভেল ইন্ডিয়া,**
১৪-ই, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলকাতা-৩৩।

১২। **চারসন ট্যুরস,**
৬, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩।

১৩। **কুণ্ডু স্পেশ্যাল,**
১, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭২।

১৪। **সোমানি ট্রাভেলস,**
২২, রবীন্দ্র সরণি, দোতলা, ব্লক—এন এস ৩০, কলকাতা-৭৩।

১৫। **ট্রাভেল মের্কাস,**
৩৪-এ শরৎ বসু রোড, কলকাতা-২০।

১৬। **রামকৃষ্ণ ট্রাভেলস,**
৩৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, দোতলা, কলকাতা-৬৯।

১৭। **সেন্টার পয়েন্ট ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস,**
২০, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

১৮। **ডেল্টা ট্রাভেলস,**
৭/১, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭১।

১৯। **মহারাজা ট্রাভেলস,**
৯, কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা-১।

২০। **সান ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস,**
১০-ডি, মিডলটন রোড, কলকাতা-৭১।

২১। **ট্যুরিস্ট সেন্টার,**
১১৫-ই, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩।

২২। **বিবেকানন্দ ট্রাভেলস,**
৯, লালবাজার স্ট্রিট, চারতলা, ব্লক-সি, কলকাতা-১।

২৩। **ট্রেড ট্রাভেলস,**
১২৬-এ, লেনিন সরণি, তেতলা, কলকাতা-১৩।

২৪। **ট্যুর-এন-ট্যুর,**
৩, গোপীমোহন দত্ত লেন (বাগবাজার বাটার কাছে), কলকাতা-৩।

২৫। **কিটস ট্রাভেলস,**
৬০/১৪৮, হরিপদ দত্ত লেন, গল্ফ গার্ডেনস, কলকাতা-৩৩।

২৬। **ট্রাভেলস এক্সপ্রেস ক্লাব,**
২০, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

২৭। **বন ভয়েজ হাউস অব ট্যুরিজম,**
৮৯-এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-১৭।

২৮। **ফোর সিজনস ট্রাভেলস,**
মার্টিন বার্ন হাউস, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১।

২৯। **হিন্দুস্থান ট্রাভেলস,**
সংস্কৃতি বিল্ডিং, দোতলা, ১৮৩/২, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩।

৩০। **মৌ ট্রাভেলস,**
১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১।

৩১। **ইউনিক ট্রাভেলস,**
এইচ এ/৮৯, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, কলকাতা-৯১।

৩২। **কুণ্ডু তীর্থ স্পেশ্যাল,**
৩৭, স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-১।

৩৩। **সোনু ইন্টারন্যাশনাল,**
২, ছকু খানসামা লেন, কলকাতা-৯।

৩৪। **ট্রাভেল ব্যুরো,**
৫০/১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৪।

৩৫। **লিভিংস্টোন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস,**
টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন, শপ নং-১৬, কলকাতা-৩৩।

ভারত সরকারের আঞ্চলিক পর্যটন কার্যালয়ের অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্টদের তালিকা

১। **ক্যারাভান ট্রাভেলস,**
২-এ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

২। **জিয়ান্যানি ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস,**
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ,
কলকাতা-১৩।

৩। **ইন্ডিয়ান এয়ার ট্রাভেলস,**
২৮, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলকাতা-১২।

৪। **মিনি প্যান ট্রাভেলস,**
৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলকাতা-১৭।

৫। **মার্শাল ইন্টারন্যাশনাল,**
২৫-বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

৬। **পাসপুর ট্রাভেলস,**
৪২-এ, শেক্সপিয়র সরণি,
কলকাতা-৭১।

৭। **স্পিডওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড,**
৩ চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭২।

৮। **টাইম ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড,**
১৩, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৭।

৯। **ট্রাভেলগ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড,**
৩-বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

১০। **গ্লোব ফোরেক্স অ্যান্ড ট্যুরস লিমিটেড,**
১১, হো-চি-মিন সরণি,
কলকাতা-৭১।

১১। **লায়নেল এডওয়ার্ডস লিমিটেড,**
২১, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট,
কলকাতা-১

১২। **ওরিয়েন্টাল ট্রাভেল উইংস,**
৯/১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭১।

১৩। **সিনক্লেয়ার হোটেলস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট,**
৫৬-এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট,
কলকাতা-১৬।

১৪। **সাউথউইন্ড ট্রাভেলস,**
৩৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলকাতা-১২।

১৫। **ট্রেড উইংস,**
জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা-৭১।

১৬। **আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল ডিভিশন,**
২১, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট,
কলকাতা-১।

১৭। **ওয়ারেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড,**
৩১, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা-৭১।

১৮। **এভারেস্ট ট্রাভেল সার্ভিস,**
৪, গভর্নমেন্ট প্লেস (নর্থ),
কলকাতা-১।

১৯। **ইন্দো কালচার ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড,**
১৮-এ বি সি, জওহরলাল নেহরু রোড, দোতলা, ফিরপোস মার্কেট,
কলকাতা-১৩।

২০। **ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস,**
২; চার্চ লেন, কলকাতা-১।

২১। **বেনসিমান ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল এজেন্টস,**
১৮, আর সরণি, কলকাতা-১।

২২। **অশোক ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস,**
৩-জি, এভারেস্ট বিল্ডিং, ৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা-৭১।

২৩। **জুয়েল-এন-লোটাস ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড,**
জি-৭, সার্কুলার সেন্টার,
২২২, এ জে সি বসু রোড,
কলকাতা-১৭।

২৪। **ইস্টার্ন ট্রাভেলস,**
২৬, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-১৭।

২৫। **মার্কারি ট্রাভেলস,**
৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা-৭১।

২৬। **সিটা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস,**
২৭/বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

২৭। **ট্রাভেল হাউস,**
৭৫-সি, পার্ক স্ট্রিট, সাত তলা,
কলকাতা-১৬।

২৮। **মনোর ট্রাভেলস,**
নামডাং হাউস, ২৭, শেক্সপিয়র সরণি,
কলকাতা-৭১।

২৯। **টমাস কুক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড,**
চিত্রকূট বিল্ডিং, তিন তলা, ২৩০-এ,
এ জে সি বসু রোড, কলকাতা-২০।

৩০। **পিয়ারলেস ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড,**
৬-এ, এ জে সি বসু রোড,
কলকাতা-১৭।







মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কাঠগোলা বাগান